# কবীরা গুণাহ্

# ও

# তাওবা

ডাঃ মোঃ সেলিম রেজা
এমবিবিএস, এম ফিল
সহকারী অধ্যাপক
শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল

# কবীরা গুণাহ্‌ ও তাওবা

## কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ

সম্পাদনায়ঃ ডাঃ মোঃ সেলিম রেজা
এম.বি.বি.এস, এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক, প্যাথলজি বিভাগ
শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।

সহযোগিতায়ঃ ডাঃ মোঃ ফয়জুল বাশার
এম.বি.বি.এস, এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক, প্যাথলজি বিভাগ
শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল

www.waytojannah.com

**কবীরা গুণাহ্ ও তাওবা**

কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ।

**ডাঃ মোঃ সেলিম রেজা**

**০১৭১৫-০১৮৫৯১**

**প্রকাশনায়ঃ** আমরা ক'জন

শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল

**প্রথম প্রকাশঃ  মে, ২০১৫ ইং**

**যাদের কাছে কৃতজ্ঞঃ**

- মিসেস হাচিনা রেজা।
- ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক, প্যাথলজি।
- মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।
- মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, এম,এল,এস,এস।
- ডাঃ মাসুম আহম্মদ, সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন
- ডাঃ জহুরুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারী
- ডাঃ মাকসুমুল হক, উপ-অধ্যক্ষ
- ডাঃ এম,টি জাহাঙ্গীর, সহকারী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়লজী
- ডাঃ ইকবালুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়লজী
- ডাঃ শফিকুল হক খান, সহকারী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়লজী
- ডাঃ আবরার আহম্মদ, অধ্যাপক, ইএনটি।

**মুদ্রণেঃ জননী প্রিটিং প্রেস, কালী বাড়ী রোড, বরিশাল।**

www.waytojannah.com

# মুখবন্ধ

**“তোমরা যদি বড় বড় গুণাহ হতে বেঁচে থাক তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবো।”**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-৩১

মহান আল্লাহ্ এ ঘোষণাকে সামনে রেখে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সকলকেই কবীরা গুণাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় রত থাকা উচিত। তাহলেই আল্লাহর রহমত এবং নাজাত প্রাপ্তির আশা করা যায়। তার জন্য সর্বপ্রথমে যেটা প্রয়োজন তা হলো কবীরা গুণাহসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। তবে একজন মুমিনের পক্ষে নিজে শুধু নেক আমল করাই যথেষ্ট নয়, মানুষকে সৎপথে আহবান করাও তার উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব। আমাদের সমাজের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের পর্যাপ্ত ধর্মীয় জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। কবীরা গুণাহ সম্পর্কে তাদের ধারনা খুবই অস্পষ্ট। তাই তাদের পক্ষে কবীরা গুণাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের উচিত নিজেকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার সাথে সাথে সাধারণ মানুষদেরকেও সেদিকে আহবান করা। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা ‘কবীরা গুণাহ’ শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছি।

জাতি হিসেবে আমরা শংকর জাতি। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের সমাজে ইসলামের মধ্যে বহু অনৈসলামিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ধর্মকে আমরা অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি, যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব। তাই প্রকৃত ইসলামের চেতনা আমাদের মধ্যে অনেকটাই অনুপস্থিত। আমরা শুধু পূর্ব-পুরুষদের আচার-আচরণের মধ্যেই ধর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে শিখেছি। আমাদের সমাজের অনেক আলেমগণের অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তারাও কোরআন ও হাদীসকে পাশ কাটিয়ে কিছু প্রচলিত পুস্তকের উপর নির্ভর করেই কোনভাবে চালিয়ে নিচ্ছেন ধর্মীয় চর্চা। সেক্ষেত্রে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে, ফলে কবীরা গুণাহের মত কঠিন অপরাধগুলো সংঘটিত হয়ে চলেছে। তবে আশার কথা, বর্তমানে আমাদের সমাজেও আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু সচেতন ইসলামী পন্ডিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে যারা সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন।

আমরা গভীর আন্তরিকতা নিয়ে এবং অত্যন্ত সততার সাথে এ রচনাটি সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থে আমরা মানব জীবনের পদস্খলন, চরম অবক্ষয় তথা দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তিযোগ্য জঘণ্য পাপসমূহ উল্লেখ পুর্বক এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং যাবতীয় আলোচনার উপর কোরআন ও হাদীসের দলিল উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করেছি। সেই সাথে আমাদের সমাজে

মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত কবীরা গুণাহের বাস্তব দিকটিও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং তা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসেবে তাওবা সম্পর্কিত আলোচনাটিও উপস্থাপনের প্রয়াস নিয়েছি। এ রচনার মধ্যে আমরা কোরআনের কয়েকটি তফসীর গ্রন্থ যেমন, তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, তফসীর ইবনে কাসীর, তফসীর ফি-যিলালীল কোরআন এবং সহীহ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, তিরমিযী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফের সাহায্য গ্রহন করেছি। এ ছাড়াও ইমাম আয্যাহাবী (রহঃ) প্রনীত 'কবীরা গুণাহ ও গীবত' গ্রন্থটি এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের সহায়তা নিয়ে এ রচনাটি সম্পাদনা করেছি। এ রচনার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সহৃদয় পাঠকদের কাছে কোন বিষয় দূরূহ বা অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলে বা কোন ভুল-ত্রুটি পরলক্ষিত হলে সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল। এ গ্রন্থটি পাঠ করে কোন পাঠক যদি উপকৃত হন এবং কবীরা গুণাহ্ মুক্ত আমল দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভে সমর্থ হন, তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

আমরা এ রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে পেরে মহান আল্লাহ্ রাববুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি মার্জনা করেন এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল ও মঞ্জুর করেন। সবশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট করুণা ভিক্ষা করছি যেন এ বইটিকে তিনি আমাদের পরকালের নাযাতের ওসিলা বানিয়ে নেন, আমিন!

বিনীত-

সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক

www.waytojannah.com

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **প্রথম অধ্যায়** | |
| শিরোণাম (কবীরা গুণাহ্) | ৮ |
| শির্ক | ১২ |
| মানুষ হত্যা করা | ২২ |
| যাদু করা | ৩০ |
| ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করা | ৩৫ |
| রমযানের রোযা না রাখা | ৫১ |
| যাকাত আদায় না করা | ৬৫ |
| সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা | ৮৪ |
| মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া | ৯০ |
| আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা | ১০১ |
| প্রতিবেশীর ক্ষতি করা | ১০৫ |
| ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা | ১০৯ |
| যিনা বা ব্যাভিচার | ১১৪ |
| সডোমি বা সমকামিতা | ১২১ |
| পবিত্রা নারীদের অপবাদ দেয়া | ১২৬ |
| সুদের লেনদেন করা | ১২৯ |
| শরাব বা মদ্য পান করা | ১৪৪ |
| জুয়া খেলা এবং লটারী করা | ১৫০ |
| হারাম ভক্ষণ করা | ১৫৫ |
| মিথ্যা কসম করা | ১৭৪ |
| মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা | ১৭৮ |
| কথায় কথায় মিথ্যা বলা | ১৮২ |
| অহংকার করা বা দম্ভ করা | ১৯০ |
| চুরি করা | ২০০ |
| ডাকাতি করা | ২০৩ |
| জুলুম বা অত্যাচার করা | ২০৫ |
| আত্মহত্যা করা | ২১১ |
| ঘুষের লেনদেন করা | ২১৬ |


www.waytojannah.com

| | |
|---|---|
| গীবত করা | ২২৩ |
| চোগলখুরী | ২৩১ |
| প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি ভঙ্গ করা | ২৩৪ |
| প্রতারণা, শঠতা বা প্রবঞ্চণা করা | ২৩৯ |
| ওজন বা পরিমাপে কম দেয়া | ২৫২ |
| আমানতের খেয়ানত করা বা বিশ্বাস ভঙ্গ করা | ২৫৫ |
| পরের ধন আত্মসাৎ করা | ২৬১ |
| মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরী করা | ২৬৬ |
| মুসলমানদের কষ্ট দেয়া | ২৬৯ |
| দায়ুসী বা পরিবারের স্ত্রীলোকদের বেলাল্যাপনা সমর্থন করা | ২৭৩ |
| উপকার করে খোঁটা দেয়া | ২৭৫ |
| অসিয়তের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতিসাধন করা | ২৭৯ |
| তকদীরকে অস্বীকার করা | ২৮৩ |
| আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে নিরাশ হওয়া | ২৯১ |
| আল্লাহর শাস্তিকে উপেক্ষা করা | ২৯৬ |
| আল্লাহর বিধান পরিপন্থী বিচার বা শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা | ৩০১ |
| আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করা অথবা হাদীস জাল করা | ৩০৪ |
| জ্যোতিষী বা গণকে বিশ্বাস করা | ৩০৮ |
| মিথ্যা পিতৃত্ব দাবী করা | ৩১০ |
| রিয়া | ৩১২ |
| প্রস্রাবের পর অপবিত্রতা থেকে পরিচ্ছন্ন না হওয়া | ৩১৮ |
| বিলাপ করা | ৩২০ |
| শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর জুলুম অত্যাচার | ৩২৩ |
| চাঁদাবাজি করা | ৩২৬ |
| পুরুষ ও নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা গ্রহণ | ৩২৯ |
| পুরুষের স্বর্ণ ও সিল্ক ব্যবহার করা | ৩৩১ |
| প্রাণীর প্রতিকৃতি অংকন করা ও ছবি টানানো | ৩৩৩ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| তাওবা | ৩৩৬ |


www.waytojannah.com

## প্রথম অধ্যায়
## কবীরা গুণাহ্
## (Greater Sin)

মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। মনুষ্য বসতির উপযোগী করে আল্লাহ এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে যাবতীয় বস্ত সৃষ্টি করেছেন পরিমিতভাবে। তিনি মানুষকে দিয়েছেন জীবন ধারণের সকল উপকরণ এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, গাছ-পালা, জীব-জন্তু সহ অন্যান্য সকল সৃষ্টিকে। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব, তাই তার জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করাও জরুরী। সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা ও সার্বিক কল্যাণের জন্য সুন্দর একটি বিধান আবশ্যক। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। তাই তিনি ইসলামকে মানুষের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র আল-কোরআনকে বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন। তিনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন মানুষের জন্য সকল পথ নির্দেশনা। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতির পার্থক্যকারী এ কোরআনে বর্ণিত আছে মানুষের জন্য সকল বিধান। প্রতিটি বিষয়ের সীমা নির্ধারণ করে আল্লাহ তা'আলা সৎ কাজের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্যায় বা অসৎ কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং সেই সাথে তাঁর আজ্ঞানুবর্তিতার জন্য পুরস্কার এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তির বিধান রেখেছেন। আল্লাহ মানুষকে তার জীবন পরিচালনার সকল পথ এবং আচার-আচরণের জন্য দিয়েছেন পূর্ণ স্বাধীনতা। মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পথ বেছে নিতে পারে এবং এর মধ্যেই আল্লাহ পরীক্ষা করে নেন, মানুষের মধ্যে কে কর্মে উত্তম এবং সরল পথের অনুসারী। সরল পথ অনুসরণ করে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য ও অনুগ্রহ বা রহমত অর্জন করে চিরস্থায়ী জান্নাত হাসিল করতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করে বক্র পথে পা বাড়িয়ে মানুষ সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে যায় এবং গুণাহে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃত গুণাহের জন্য ধৃত করবেন। গুণাহের কারণে মানুষ আল্লাহর লা'নত প্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু ইহকালের সুখ-সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মুক্তি অর্জনই একজন মানুষের ব্রত হওয়া উচিত। জাহান্নামের এ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে তাই গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। মানুষ যেহেতু বুদ্ধি ও বিবেকের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়, সেহেতু বিবেককে সজাগ রাখা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। আবার বিবেককে সজাগ ও সচল করার জন্য জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হলে এবং সঠিক জ্ঞানের অভাব থাকলে বিবেক মরে যায় এবং মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয়ে নানাবিধ অপরাধ বা গুণাহের সাথে জড়িয়ে পড়ে। কবীরা গুণাহ্ এমন পর্যায়ের গুণাহ যা সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি নিশ্চিত হয়ে যায়। তাই এ শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য কবীরা গুণাহ্ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদির উপর সঠিক জ্ঞান

www.waytojannah.com

আহরণ করা আবশ্যক। নিম্নে কোরআন ও হাদিসের আলোকে গুণাহের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হল:

### গুণাহ্ কি?

গুণাহের অর্থ পাপ বা অপরাধ। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করাই হল গুণাহ্। Websters Encyclopedic Dictionary অনুসারে যে কোন ধরনের স্বেচ্ছাকৃত আচার-আচরণ দ্বারা ধর্মীয় এবং নৈতিক নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করাই হল গুণাহ্। ইসলামের পরিভাষায় ধর্মীয় রীতি-নীতির পরিপন্থী সকল প্রকার আচার-আচরণই গুণাহ্। গুণাহ মানেই আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধকে তুচ্ছ মনে করা, তা প্রত্যাখ্যান করা এবং তাঁর দেয়া সীমা অতিক্রম করা। ইসলামী শরিয়তে গুণাহ্ দু'প্রকার: কবীরা গুণাহ্ এবং সগীরা গুণাহ্।

### কবীরা গুণাহ্ কি?

'কবীর' থেকে উদভূত কবীরা শব্দের অর্থ বড় এবং 'গুণাহ্' শব্দের অর্থ পাপ বা অপরাধ। কবীরা গুণাহের শাব্দিক অর্থ বড় পাপ বা মহাপাপ। শরিয়াতের পরিভাষায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে সকল কাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং যে সকল কাজের জন্য নির্দিষ্ট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে অথবা আল্লাহর ক্রোধের ঘোষণা রয়েছে, তাকে কবীরা গুণাহ বলা হয়।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি, "যে পাপের উপর জাহান্নামের, আল্লাহর ক্রোধের, অভিসম্পাতের এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের হুমকি রয়েছে সেটাই কবীরা গুণাহ" - ইবনে কাসীর।

প্রখ্যাত মনিষী হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, যে সকল গুণাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা দোযখ, লা'নত, আযাব ইত্যাদি দ্বারা ভীতি প্রদর্শণ করেছেন, সেগুলো কবীরা গুণাহ।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুণাহ বলতে সে সকল কাজকে বোঝান হয়, যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যপারে কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

কোরআন ও হাদিসের বর্ণনা ও পূর্ববর্তী ওলামাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কবীরা গুণাহ বলা হয় ঐ সকল বড় বড় পাপকর্ম সমূহকে যেগুলোতে নিম্নোক্ত কোন একটি বিষয় পাওয়া যাবে:

- যে সকল গুণাহের ব্যপারে ইসলামী শরীয়তে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।
- যে সকল গুণাহের ব্যপারে দুনিয়াতে নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।
- যে সকল কাজে আল্লাহ তা'আলা রাগ করেন।

- যে সকল কাজে আল্লাহ তা'আলা ও নবী (সঃ) লা'নত দেন।
- যে কাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে এমনটি করবে সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়।
- যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
- যে কাজে দ্বীন নেই, ঈমান নেই - এমন বলা হয়েছে।
- যে ব্যাপারে বলা হয়েছে এটি মুনাফিকের আলামত বা মুনাফিকের কাজ।
- অথবা যে কাজকে আল্লাহ তা'আলার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবীরা গুণাহের গুরুত্ব এবং এর পরিণাম:

কবীরা গুণাহ্ একজন ব্যক্তির জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে এবং সেই সাথে তার পরিবার, সমাজ তথা দেশের জন্য এটা মহা অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কবীরা গুণাহ্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত কারণে কবীরা গুণাহ অত্যন্ত ভয়াবহ:

১. কবীরা গুণাহ্ আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি বয়ে আনে।

২. কবীরা গুণাহর জন্য পার্থিব শাস্তির বিধান রয়েছে।

৩. কবীরা গুণাহ মানুষের অন্তর কলুষিত করে ফেলে। একটি কবীরা গুণাহ আর একটি গুণাহ্ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার পরেরটি, এভাবে ব্যাক্তি গুণাহের জালে জড়িয়ে যায় এবং ভাল কাজের স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। অবশেষে পাপের পঙ্কিল সাগরে নিমজ্জিত হয় এবং আল্লাহর লা'নত প্রাপ্তদের দলে অন্তরভুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নাম খরিদ করে লয়।

৪. কবীরা গুণাহ বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

৫. কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যাক্তির সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে।

৬. কবীরা গুণাহ থেকে বেঁচে থাকলে অন্যান্য সগীরা বা ছোট গুণাহ্ সমূহ আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিবেন।

৭. কবীরা গুণাহ খাঁটি তাওবা ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

কবীরা গুণাহ থেকে বেঁচে থাকাটা প্রত্যেকের জন্যই খুব জরুরী। কেননা প্রত্যেকটি কবীরা গুণাহই আল্লাহ তা'আলার হক বিনষ্ট করে থাকে এবং ব্যক্তির জন্য তা বয়ে আনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি । আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা পাওয়া এবং পরকালীন কল্যানের জন্য মহাপাপগুলি থেকে হয় দূরে থাকতে হবে অন্যথায় যদি কখনও কোনভাবে এ পাপ সংঘটিত হয় তাহলে তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করতে হবে। কবীরা গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে জরুরী যে, এ গুণাহ কোন ইবাদত দ্বারা মাফ হয়না বরং এর জন্য তাওবা করা

আবশ্যক। কবীরা গুণাহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে বান্দার সগীরা গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বলেন,

**"তোমরা যদি সে সমস্ত বড় বড় গুণাহ হতে বিরত হও যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের (ছোটখাট) অপরাধ ক্ষমা করবো এবং তোমাদেরকে গন্তব্যস্থলে প্রবেশ করাবো।**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪),আয়াত-৩১

সুতরাং আখেরাতের কল্যাণ লাভ এবং জান্নাতে দাখিল হওয়ার জন্য কবীরা গুণাহসমূহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর কোন বিকল্প নেই। অন্যথায় পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

**কবীরা গুণাহের সংখ্যা:**

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কবীরা গুণাহের পূর্ণ সংখ্যার বর্ণনা এক সাথে উল্লেখ নেই। তবে কোরআন ও হাদিসে যে সকল গুণাহকে কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ওলামায়ে কেরাম এর সংখ্যা ৭০টি বা তারও অধিক বলে মন্তব্য করেছেন। আবার তাদের কেউ কেউ এর সংখ্যা ১০০টি বা তারও অধিক বলে উল্লেখ করেছেন। এ সকল কবীরা গুণাহের মধ্যে কোনটি আবার কোনটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুতর । এখানে আমরা বর্তমান সমাজে পরিদৃষ্ট হয় এমন গুরুত্বপুর্ণ কিছু কবীরা গুণাহ্ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

## শির্ক / আল্লাহর সাথে শরীক করা

## (Polytheism / To Associate Partners with Allah)

আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। এক আল্লাহ ছাড়া একাধিক উপাস্য নির্ধারণ করা তাওহিদী আকিদার পরিপন্থী এবং শির্ক। ইসলামে বহুঈশ্বরবাদ অযৌক্তিক এবং একান্ত পরিত্যাজ্য বা অগ্রহণীয় বিষয় হিসাবে বিবেচিত। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে নিজেই শির্ককে খণ্ডন করেছেন এভাবে,

**"যদি আল্লাহ ছাড়া আসমানে ও যমীনে বহু ইলাহ্ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, তারা যা বলে তা হতে আর্শের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।"**

আল কোরআন, সুরা আম্বিয়া(২১), আয়াত-২২

ইসলামে শির্ক একটি জঘন্য এবং অমার্জনীয় অপরাধ। অবশ্যই বিচার দিবসে আল্লাহ শির্কের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

**"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।"**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-৪৮

মানুষের পার্থিব জীবন এবং আখিরাতের সাফল্যের মূল চাবি-কাঠি হচ্ছে ঈমান ও শির্ক বর্জিত আমল। তাই আমাদের প্রত্যেককেই শির্ক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টায় ব্রত থাকা উচিত। অন্তরে আল্লাহভীতি এবং শির্ক সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকলে এ কাজটি সহজ হবে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা আল্লাহভীতি মানুষকে প্রেরণা যোগায় আর জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। শির্ক সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকতে পারে এবং এ অজ্ঞতার কারণেই আমাদের বিশ্বাসে বা আচরণে শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং শির্ক মুক্ত থাকার জন্য প্রথমতঃ আমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি জাগরিত করতে হবে এবং সেই সাথে শির্ক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই আসুন আমরা শির্ক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার চেষ্টা করি।

### শির্ক কি?

'শির্ক' একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- অংশীদারিত্ব, শরীক করা, সংমিশ্রন, সমান করা, ভাগাভাগি, তুলনা করা, সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি। তবে শরী'য়তের পরিভাষায় শির্কের দু'টি অর্থ রয়েছে। যথা:

(এক) সাধারণ অর্থ: সাধারণ অর্থে শির্ক হলো গায়রুল্লাহকে আল্লাহর কোন বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ করা- অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা কিংবা এসবে অন্য কারো অংশ আছে বলে মনে করা। যেমন, কোন সৃষ্টির প্রতি এমন ধারণা পোষণ করা যে, তিনি সন্তান দিতে পারেন, রুজী ও আহার দিতে পারেন, মানুষের ভাল-মন্দ বা কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারেন বা জীবন ও মরণের ফয়সালা ইত্যাদি করতে পারেন- এ সবই শির্ক।

(দুই) বিশেষ অর্থ: বিশেষ অর্থে শির্ক হলো আল্লাহর পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করা- অর্থাৎ যে কোন প্রকার ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা অথবা ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। যেমন, মাজারে সিজদা করা, আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত করা, কারো নামে জন্তু জবাই করা বা অন্য কারো কাছে দোয়া করা ইত্যাদি শির্ক। ইবাদতের মধ্যে দিয়েই মূলত অধিকাংশ শির্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। তাই অনেক মনীষীর কথায় শির্ক শব্দটি দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে ইবাদতের বাইরেও অনেকভাবে শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তারকার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় অথবা কাউকে আল্লাহর পুত্র বা কন্যা মানা কিংবা জগৎ সৃষ্টিতে ও এর পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনে আল্লাহর সহায়ক বা সাহায্যকারী রয়েছে- এ জাতীয় সকল বিশ্বাস ইবাদত বহির্ভুত শির্ক। তাই শির্কের সম্পূরক অর্থ প্রকাশ করার জন্য উপরোক্ত দু'টি অর্থই গ্রহণযোগ্য।

**শির্কের সংজ্ঞা:** শরিয়তের পরিভাষায় শির্ক হচ্ছে আল্লাহর রুবুবিয়্যাত অথবা তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলী অথবা তাঁর ইবাদতে অংশীদার বা সমকক্ষ নির্ধারণ করা। সংক্ষেপে বলা যায়, রব ও ইলাহ (উপাস্য) হিসাবে আল্লাহর সহিত আর কাউকে শরীক সাব্যস্ত করার নামই শির্ক।

আবার এভাবেও বলা যায়, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্ত্বা বা বস্তুর ইবাদত করা অথবা কোন কিছুতে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করার নাম শির্ক (Worship of anyone other than Singular Allah or establishment of Partners placed beside Allah)।

বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে, **"শির্ক হচ্ছে, এমন সব বিশ্বাস, কথা, কাজ, আচরণ ও অভ্যাস যার দ্বারা বাহ্যিকভাবে অথবা অন্তর্নিহিত অর্থে মহান আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বে অন্যকারো অংশীদারিত্ব বা সমকক্ষতা প্রতীয়মান হয়।"**

তাওহিদী আকিদায় আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সার্বভৌমত্বের কোন শরীক নাই। সুতরাং এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব, তাঁর মহান সত্তা ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের কোন শরীক নেই। এজন্য সকল ইবাদত প্রাপ্যতার মালিকও তিনি। শির্ক শব্দটি তাওহীদ শব্দের সম্পূর্ণ বিপরীত। শির্কের সংজ্ঞাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্বে, তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতায়, তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে এবং তাঁর ইবাদতে কোনোভাবে অন্য কারো অংশীদারিত্ব বা সমকক্ষতা আছে বলে প্রতীয়মান হলে শির্ক সংঘটিত হবে।

## শির্ক কত প্রকার?

অপরাধের মাত্রা এবং পরিণতির উপর ভিত্তি করে শির্ককে ভাগ করা যায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম) শির্ককে প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন:

(ক) শির্ক এ আকবর (Major Shirk) বা বড় শির্ক

(খ) শির্ক এ আসগর (Minor Shirk) বা ছোট শির্ক

### বড় শির্ক (Major Shirk)

বিশ্বাস জাতীয় বিষয়াদি ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক বা সমান করাই হচ্ছে মূলত শিরকে আকবার বা বড় শির্ক। মানুষের মাঝে উপাসনা কেন্দ্রিক শির্ক সর্বাধিক সংঘটিত হয় বলে অনেকে এটাকে শুধু উপাসনার সাথেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন কেউ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: "আল্লাহর উপাসনাসমূহের কোন উপাসনা গায়রুল্লাহের উদ্দেশ্যে করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।" তবে শির্কে আকবার শুধুমাত্র উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা আল্লাহর রুবুবিয়্যাত এবং তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও হতে পারে। বস্তুতঃ তাওহীদ বিরোধী ধ্যান-ধারণা এবং সকল আচার-আচরণই বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। তাই অনেকে এ শির্কের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে- **শির্কে অকবার বলা হয় একমাত্র আল্লাহর হককে আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে নিবেদন করা। অর্থাৎ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের কোন অংশ অথবা তাঁর উলুহিয়্যাতের কোন অংশ অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর কোন অংশকে তিনি ব্যতীত কাউকে নিবেদন করা বড় শির্ক।**

আল্লাহ তা'আলার জাত এবং গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, সেখানে অন্য কোন সত্তা যেমন নবী, রাসূল, ফেরেশতা, জিন-পরী, পীর, অলী, দরবেশ প্রমূখ অথবা কোন সৃষ্টবস্তু যেমন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা, পাথর, গাছ-পালা, আগুন ইত্যাদিকে আল্লাহ্ তা'আলার এ সব বৈশিষ্ট্যেসমূহের কোন না কোন বৈশিষ্টের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে বিশ্বাস করা হলে এবং এদের উদ্দেশ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা উপাসনামূলক কোন কর্ম করা হলে শির্কে আকবর বা বড় শির্ক সংঘটিত হয়।

এ জাতীয় শিরক কখনো হয় প্রকাশ্যে যেমন, দেব-দেবী ও মূর্তি পূজকদের শির্ক, কবর-মাজার, মৃত ও গায়েবী ব্যক্তি পূজকদের শির্ক ইত্যাদি।

এ শির্ক কখনো হয় অপ্রকাশ্যে, যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য প্রভূদের উপর ভরসা করা অথবা আল্লাহর ন্যায় তাদেরকে ভয় করা কিংবা আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় কোন মখলুককে মহব্বত করা ইত্যাদি।

এ জাতীয় শির্ক কখনো হয় আকিদাগত। যেমন, বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর সাথে কোনো সত্তা আছে যে সৃষ্টি করে অথবা জীবিত করে কিংবা মৃত্যু দেয় অথবা মালিকানার হকদার অথবা এ জগতের কর্তৃত্বের অধিকারী কিংবা তারকার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় অথবা কোন সত্তা আছেন যিনি আল্লাহর সাথে গায়েব জানেন অথবা এরূপ বিশ্বাস করা যে, অমুক সত্তা বা ব্যক্তি আল্লাহর ন্যায় নিঃশর্ত আনুগত্যের হকদার, ফলে সে কোন বস্তু হালাল ও হারাম করার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছার অনুগত্য করে, যদিও তা রাসূলের আনিত দ্বীনের বিপরীত হয়- এ সবই শির্ক।

এ জাতীয় শির্ক কখনো হয় কথা-বার্তা ও উপাসনায়, যেমন আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নিকট দোয়া করা অথবা সাহায্য চাওয়া কিংবা আশ্রয় প্রার্থনা করা, হোক সে নবী অথবা অলী অথবা ফেরেশতা অথবা জ্বিন কিংবা অন্য কোন মখলুক। গায়রুল্লাহকে সিজদা করা, গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সওম পালন করা, গায়রুল্লাহর নামে মানত করা কিংবা জন্তু জবাই করা, গায়রুল্লাহর নামের যিকির করা, নিঃশর্তভাবে গায়রুল্লাহর আনুগত্য করা, ভালবাসা কিংবা ভরসা করা ও ভয় করা- এ সবই উপাসনা বা ইবাদতের মাধ্যমে সংঘটিত বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এসব বড় শির্ক মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়।

**বড় শির্কের ভয়াবহতা এবং শির্ককারীর পরিণতি:**

মানুষের মাধ্যমে যত ধরনের গুণাহের কাজ হতে পারে এ সবের মধ্যে শির্কে আকবর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণাহ। বড় শির্ক নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের শামিল। তাই এটা গুরুতর পাপ এবং এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

**"কেহ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।"**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত-৭২

মানুষ যাতে এ ধরনের শির্ক থেকে সতর্ক হয়, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি এই বলে সতর্ক বাণী দিয়েছেন:

**"তুমি যদি শির্ক কর, তবে তোমার যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"**

আল কোরআন, সুরা যুমার(৩৯), আয়াত-৬৫

উলিস্নখিত আয়াতদৃষ্টে বড় শির্কের অপরাধ যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা অতি সহজেই অনুমেয়। শর'ই দৃষ্টিতে বড় শির্ক এত বড় পাপ যে, কার্যত একজন মানুষ বড় শির্কে লিপ্ত থাকলে:

- সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।
- তার অতীত ও বর্তমানের সকল নেক আমল বাতিল হয়ে যায়।
- তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।
- খাঁটি তাওবা ছাড়া এ গুণাহ মাফ হয় না।

বড় শির্কের শাখা সমূহ:

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ এবং সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির প্রধানতঃ তিনটি মৌলিক ধারা আছে- রুবুবিয়্যাত, আসমা ওয়াস্ সিফাত ও ইবাদত। এ তিনটি ধারার যে কোনটিতে শির্ক সংঘটিত হতে পারে। কাজেই বড় শির্ক প্রধানতঃ তিন প্রকার:

১। রুবুবিয়্যাত বা কর্তৃত্বের শির্ক।

(Shirk in the area of Lordship)

২। আসমা ওয়াস্ সিফাত বা পবিত্র নামাবলী ও গুণাবলীর শির্ক।

(Shirk in the area of Divine Names and Attributes)

৩। উলূহিয়্যাত বা ইবাদতের শির্ক।

(Shirk in the area of Ebadah or Worship)।

মানুষের বিশ্বাসে ও আচার-আচরণে এবং ইবাদতের মাধ্যমে যে সকল উপায়ে বড় শির্ক সংঘটিত হতে পারে সংক্ষিপ্তাকারে তার একটি বিবরণ দেয়া হল:

১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিক দাতা ও ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করার শির্ক।
২. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে আহবান করার শির্ক।
৩. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট ফরিয়াদ করার শির্ক।
৪. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করার শির্ক।
৫. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট আশা ও বাসনার শির্ক।
৬. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট সাহায্য প্রার্থণার শির্ক।
৭. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য রুকু , সিজদা ও বিনম্রভাবে দাঁড়ানোর শির্ক।

৮. একমাত্র আল্লাহর ঘর কা’বা শরীফ ছাড়া অন্যকোন ঘর বা মাজার ত্বাওয়াফ করার শির্ক।

৯. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট কোন কিছু মানত করার শির্ক।

১০. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য পশু জবাই করার শির্ক।

১১. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারোর একচ্ছত্র আনুগত্য করার শির্ক।

১২. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কাউকে এককভাবে ভালোবাসার শির্ক।

১৩. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কাউকে এককভাবে ভয় করার শির্ক।

১৪. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারো উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা ও তাওয়াক্কুলের শির্ক।

১৫. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্যকেউ কাউকে হিদায়েত দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

১৬. আল্লাহ তা’আলার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কারোর জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করতে পারে এমন মনে করার শির্ক

১৭. কবর ও মাজার পূজার শির্ক।

১৮. আল্লাহ তা’আলা নিজ সত্তা সহ সর্বস্থানে বিরাজমান এমন মনে করার শির্ক।

১৯. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়াও বিশ্ব পরিচালনার জন্য অন্য কারো হাত রয়েছে এমন মনে করার শির্ক ।

২০. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কাউকে জীবন বিধান রচনা করতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

২১. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কেউ কাউকে ধনী বা গরীব বানাতে পারে এমন মনে করার শির্ক

২২. কিয়ামতের দিন কেউ কাউকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে এমন মনে করার শির্ক।

২৩. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কোন গাউস, কুতুব দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছু দেখে ও শুনে এবং দুনিয়া পরিচালনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে এমন মনে করার শির্ক।

২৪. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে এমন মনে করার শির্ক।

২৫. একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্যকেউ কারো অন্তরের কথা বলে দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

২৬. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ কাউকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করাতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

২৭. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ কাউকে সন্তান-সন্ততি দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

২৮. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ কাউকে সুস্থতা দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

২৯. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমন মানে করার শির্ক।

৩০. একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয় এমন মনে করার শির্ক।

৩১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ কাউকে জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

৩২. একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ রিযিক দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

## ছোট শির্ক (Minor Shirk)

শির্কে আকবর নয় এমন যে সব কর্মকে শরীয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগর বা ছোট শির্ক। একজন মানুষ তাওহীদবাদী হওয়া সত্বেও তার আমলের মাধ্যমে যখন এর ব্যতিক্রম কিছু পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও কাজে-কর্মের মাধ্যমে যখন কোন কিছুকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তখন সেটা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। 'শির্ক কি ও কেন?' গ্রন্থের প্রণেতা ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলীর মতে ছোট শির্কের সংজ্ঞা হলোঃ

**"এমন সব কথা বা কাজ যদ্বারা বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপক্ষে কর্তা ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়- সেটাই ছোট শির্ক।"**

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ছোট শির্ক অনেকটা মানুষের শির্কী উদ্দেশ্য বহির্ভূত কর্ম, যা প্রকারান্তে শির্ক সংঘটিত করে। তবে শির্কে আসগর কখনও কর্তা ব্যাক্তির মানসিক অবস্থা, উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাসের স্তরের উপর ভিত্তি করে শির্কে আকবরেও রূপান্তরিত হতে পারে। আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করা হয় এমন কোন কথা ও কাজ যখন কর্তা ব্যক্তির বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে করা না হয়, তখন সেটা শিরকে আসগর বা ছোট শির্ক হিসেবে বিবেচিত হবে; কিন্তু ঐ একই কর্মটির সাথে যখন কর্তা ব্যক্তির বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য এ দু'য়ের সমন্বয় সাধিত হয় তখন সেটা শির্কে আকবর বা বড় শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তা'বীজের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে ছোট শিরকের অন্তর্গত কিন্তু তা প্রদানকারী ও

ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বড় শির্কেও রূপান্তরিত হতে পারে। যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীতই তা'বীজ মানুষের উপর নিজ থেকেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তখন সেটা হবে বড় শির্ক। আর যদি সে মনে করে যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা'বীজ কাজ করে থাকে তখন সেটা হবে ছোট শির্ক। এভাবে জ্যোতিষী বা গণকের কাছে আনাগোনা করা এবং এদের কথায় বিশ্বাস করা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কখনও কখনও তা বড় শির্ক হিসেবেও গণ্য হতে পারে যখন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে এদের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং তাদেরকে নিজে থেকেই ইলমে গায়েবের হকদার বলে মনে করে। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রকার ছোট শির্কও কর্তার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বড় শির্কে রূপান্তরিত হতে পারে।

**ছোট শির্কের ভয়াবহতা এবং শির্ককারীর পরিণতি:**

ছোট শির্ক হচ্ছে বড় শির্কের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। ছোট শির্ক সাধারণ কবীরা গুণাহের অন্তর্গত। শরিয়তের দৃষ্টিতে ছোট শির্ক এমন পর্যায়ের অপরাধ যে, কার্যত একজন মানুষ এ গুণাহে লিপ্ত থাকলে-

- **সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না।**
- **তার অপরাধ সাধারণ কবীরা গুণাহের অন্তর্ভূক্ত।**
- **তার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারে; এ অপরাধের জন্য আল্লাহ চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন।**
- **তার সংশ্লিষ্ট নেক আমলটি বরবাদ হয়ে যায়।**

আপাতঃদৃষ্টিতে ছোট শির্ককে লঘু অপরাধ বলে মনে হলেও এর বাস্তবতাকে খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। কেননা এটি একটি কবীরা গুণাহ এবং তা একজন মানুষের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা না করলে এর জন্য তাকে আখিরাতে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। আবার যখন কোন ব্যক্তি অব্যাহতভাবে ছোট শির্কে লিপ্ত থাকে তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে তার নেক আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যেতে পারে এবং তা তার জন্য বয়ে আনতে পারে প্রভুত অকল্যাণ এবং আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই ছোট শির্কের অপরাধকে লঘু মনে করে নির্বিকারে এবং অব্যহতভাবে এ গুণাহের সাথে লিপ্ত থাকার অবকাশ রয়েছে বলে ভাববার কোন সুযোগ নেই। পাপ করলেও শাস্তি ভোগ করতে হবেনা- এমনটি নিশ্চিত হয়ে পাপের কাজ চালিয়ে যাওয়া কোনো সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। বস্তুতঃ এ ভাবনায় বিভোর হয়ে যারা পাপের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা নিতান্তই ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে। পরকালীন কল্যাণের জন্য ছোট শির্ক সহ অন্যান্য সকল গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা তাই সকলেরই ব্রত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

### ছোট শির্কের শাখা সমূহ:

ছোট শির্কের অনেকগুলি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে 'রিয়া' হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছোট শির্ক। মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে,

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম) বলেছেন,

**"তোমাদের উপর আমার যে জন্য ভয় হয়, তা হচ্ছে ছোট শির্ক"**

সাহাবাগণ জিজ্ঞাস করলেন,

**"হে আল্লাহর রাসুল, ছোট শির্ক কি?"**

তিনি উত্তরে বললেন,

**"রিয়া'। প্রতিফল দিবসে আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিদান দেবেন, সেদিন তিনি তাদেরকে বলবেন, পৃথিবীতে যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা নেক আমল করতে, তাদের কাছে যাও। দেখ প্রতিদান পাও কিনা।"**

হাদীস, মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

রিয়া ছাড়াও মানুষের আচার আচরণে আরো অনেক প্রকারের ছোট শির্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। যার একটি বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল:

১. ভাগ্য গণনার শির্ক

২. জৌতিষীর শির্ক

৩. যাদুর শির্ক

৪. তাবিজ কবচের শির্ক

৫. অশুভ লক্ষণের শির্ক

৬. কুফরী কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের শির্ক

৭. বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য বালা, সুতা, রিং ইত্যাদি পরার শির্ক

৮. শরিয়ত অসমর্থিত ব্যক্তি বা বস্তু কর্তৃক বরকত গ্রহণের শির্ক

৯. শরিয়ত অসম্মত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ওসীলা ধরার শির্ক

১০. আল্লাহ ও তুমি না চাইলে কাজটা হতো না এমন বলার শির্ক

১১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কসম করার শির্ক

১২. যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার শির্ক

১৩. আল্লাহ তা'আলার নি'য়ামত অস্বীকার করার শির্ক

১৪. "যদি এমন করতাম তাহলে এমন হতো না" বলার শির্ক।

বি:দ্র: শির্ক এর উপর বিস্তারিত আলোচনা দেখুন আমাদের 'শির্ক' গ্রন্থে।

## মানুষ হত্যা করা
## (Committing Murder)

ইচ্ছাকৃত অন্যায় হত্যা একটি কবীরা গুনাহ্। কোন মুমিনের উচিত নয় যে, সে তার কোন মুমিন ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। আল্লাহ কর্তৃক এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে বর্ণিত কিছু বৈধ হত্যার হুকুম ব্যাতিরেকে সকল প্রকার হত্যাকাণ্ডই অন্যায় হত্যার আওতাধীন। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার জন্য পরকালে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে সুরা নিসায়:

**"আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম- তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।"**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত- ৯৩

সুরা নিসার এই আয়াতটিতে কোন মুমিনকে হত্যার দায়ে জাহান্নাম সহ মোট পাঁচ প্রকারের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। স্বেচ্ছাকৃত অন্যায় হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর জন্য পরকালে যে সকল শাস্তি প্রদান করার ঘোষণা করা হয়েছে তা হল:

- **জাহান্নামের অগ্নির শাস্তি**
- **জাহান্নামে স্থায়ী বসবাস**
- **আল্লাহর ক্রোধ**
- **আল্লাহর লা'নত এবং**
- **কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি।**

সকল হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোন না কোন কারণ নিহিত থাকতে পারে। সাধারণতঃ আমাদের সমাজে সংঘটিত অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে কারণগুলি পরিলক্ষিত হয় তন্মধ্যে ব্যাক্তিগত এবং পারিবারিক শত্রুতা ও দ্বন্দ-কলহ, অর্থ-সম্পত্তির লোভ-লালসা, প্রণয় সম্পর্কিত রেষারেষি, ব্যাবসায়িক দ্বন্দ, রাজনৈতিক কোন্দল, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ইত্যাদি কারণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল কারণে সংঘটিত প্রায় সকল হত্যাকাণ্ডই পরিকল্পিত এবং অবৈধ হত্যা। তবে হত্যার পিছনে অন্তর্নিহিত কারণ যাই থাক না কেন, সকল প্রকার অবৈধ হত্যাই কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত এবং এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের কঠিন আযাব।

**অবৈধ হত্যার পদ্ধতি:** অবৈধ হত্যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হতে পারে। যেমন:

- ধারালো অস্ত্রের আঘাতে

- আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে
- ফাঁস লাগিয়ে বা গলা টিপে
- তীরের আঘাতে
- লাঠি বা ভারী বস্ত দ্বারা আঘাত করে
- পাহার  বা কোনো উচু স্থান থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে
- পরিকল্পিতভাবে গাড়ী চাপা দিয়ে
- পানিতে ডুবিয়ে
- বিষ প্রয়োগে
- আগুনে পুড়িয়ে ইত্যাদি পদ্ধতিতে হত্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তবে হত্যা যে প্রক্রিয়ায়ই হোক না কেন, সেটা বড় কথা নয়, হত্যাকারীর মোটিভই হচ্ছে বিচার্য বিষয় এবং এর উপর নির্ভর করে অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে থাকে। সকল প্রকার স্বেচ্ছাকৃত, পরিকল্পিত এবং অবৈধ হত্যাকাণ্ড কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত এবং এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে পরকালীন কঠিন আযাব যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে সন্তান হত্যার মত একটি জঘণ্য হত্যাকাণ্ড নির্বিকারে এবং অবাধে চলে আসছে আমাদের সমাজে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সকল দেশেও বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির নামে এ অপরাধটিই চলে আসছে ব্যাপকভাবে, কখনও প্রকাশ্যে আবার কখনওবা সংগোপণে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এ বিষয়টি যেন আমরা দেখেও দেখছি না এবং এর প্রতি তেমনটি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না বা এ সম্পর্কে কোন উদ্বেগও যেন আমাদের নেই। আবার অনেকেই হয়ত কোন না কোনভাবে এ অপরাধের সাথে জড়িয়ে রয়েছেন না জেনে অথবা অবহেলার কারণে। তবে সন্তান হত্যাও যে অবৈধ হত্যার মধ্যে শামিল এবং কবীরা গুণাহ্, সে সম্পর্কে কারো মনে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের কোন অবকাশ থাকার কথা নয়, কারণ বিষয়টি সুস্পষ্ট শর'ই দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ পর্যায়ে সন্তান হত্যার অবৈধতা এবং গুণাহ্ সম্পর্কিত কোরআন ও হাদিসের কিছু দলীল পেশ করা হল। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করোনা, তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।**

আল-কোরআন, সুরা বনী-ইসরাঈল(১৭), আয়াত- ৩১

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সন্তান হত্যার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। অজ্ঞতার যুগে মানুষ কন্যা সন্তানদের হত্যা করত, এমনকি এদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া তাদের একটি প্রথায় পরিণত হয়েছিল। কারণ কন্যা সন্তানগণ তাদের অর্থ-সম্পদের অংশীদার হবে এটা তাদের পছন্দ ছিলনা। তাদের এ নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল করা হয়েছে। এখানে সন্তান হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে তাদের এ আচরণকে মহাপাপ হিসেবে

আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সন্তান হত্যা করা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দান করা হয়েছে। যদিও একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে এ নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে তবুও এ নির্দেশনাটি সাধারণভাবে সকল যুগের সকল সমাজের সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, অজ্ঞতার সে যুগের মূর্খতা ও বর্বরতার পুনরাবৃত্তি বর্তমানকালেও আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি। আমাদের সমাজে সন্তান হত্যার অপরাধ যেন দিনে দিনে বেড়েই চলছে। আজকের দিনে গর্ভপাতের মাধ্যমেই মূলতঃ সন্তান হত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তিতে আল্ট্রাসনোর মাধ্যমে গর্ভের সন্তান কন্যা জেনে গর্ভপাত করানো হচ্ছে; আবার পরিবার পরিকল্পনার নামে এম, আর পদ্ধতিতে গর্ভের ভ্রূণ বিনষ্ট করার মাধ্যমে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে অগনিত প্রাণ অঙ্কুরেই নাশ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বলতে গেলে এম,আর-এর নামে গর্ভপাত এখন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্ততঃ এ সমাজে গর্ভপাতকে এক হিসেবে হালাল করে নেয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এসকল পদ্ধতিতে গর্ভপাতের মাধ্যমে সন্তান নষ্ট করা সন্তান হত্যা নয় কি? বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে এর উত্তরটি হ্যাঁ সূচক। তবে হত্যার প্রক্রিয়া যা-ই হোকনা কেন স্বেচ্ছাকৃত সন্তান হত্যা একটি জঘন্য অপরাধ। এ বিষয়ে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম,

> **"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কি?"**

তিনি বললেন,

> **"আল্লাহর জন্য প্রতিযোগী নির্ধারণ করা (শির্ক করা) অথচ তিনি তোমাকে পয়দা করেছেন।"**

আমি বললাম,

> **"ইহাতো অবশ্যই বড় পাপ। ইহার পর কি?"**

তিনি বললেন,

> **"নিজ সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করে ফেলা যে, সে তোমার আহারে ভাগী হবে।"**

আমি জিজ্ঞেস করলাম,

> **"তারপর কি?"**

তিনি বললেন,

> **"তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।"**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং- ১৫৯

**ভুলবশতঃ বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিধান:**

ভুল করা মানুষের সহজাত অভ্যাস। তাই অসাবধানতার জন্য অথবা ভুলবশতঃ যে কারো মাধ্যমে মানুষ হত্যার মত ঘটনাও সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভ্রম হত্যার অপরাধের মাত্রা আর

স্বেচ্ছাকৃত বা পরিকল্পিত অন্যায় হত্যার অপরাধের মাত্রা এক হতে পারে না। তাই শরিয়তে ভ্রম হত্যার শাস্তির পরিমানও অনেকটা লাঘব করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত কোরআনের সুস্পষ্ট বিধানটি বর্ণিত রয়েছে সুরা নিসায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

**“কোন মুমিনের উচিত নয় যে ভ্রম ব্যতীত কোন মুমিনকে হত্যা করে। যে কেউ ভ্রম বশতঃ কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে সে জনৈক মুমিন দাসকে মুক্ত করে দিবে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে রক্তপণ সমার্পন করবে। তবে তারা যদি ক্ষমা করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। অনন্তর যদি সে তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও মুমিন হয়, তবে জনৈক মুমিন দাসকে মুক্তি দান করবে। এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার স্বজনদেরকে রক্তপণ অর্পণ করবে এবং জনৈক দাসকে মুক্ত করবে; কিন্তু যদি সে সঙ্গতিহীন হয় তবে আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত- ৯২

এ আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে এটা কোন মুসলমানের উচিত নয় যে সে অন্য মুসলমানকে বিনা কারনে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। কিন্তু কারো দ্বারা ভ্রমবশতঃ হত্যা হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা। ভ্রমবশতঃ হত্যা বলতে সম্পূর্ন অনিচ্ছাকৃত বা ধারণার ভুল হওয়ার কারণে সংঘটিত হত্যাকে বুঝায়। এসব হত্যা সাধারনত অসাবধানতার কারণে এবং মনের অজান্তেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, অসাবধানতার কারণে আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি বের হয়ে বা গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কারো মৃত্যু ঘটতে পারে অথবা চালকের অসাবধানতায় পথচারীর বা যাত্রীদের প্রাণ নাশ হতে পারে। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালাই সবচেয়ে বেশি ভাল জানেন। মানুষের ভুল হওয়াটা অবাস্তব বা অসম্ভব কিছু নয়। তাই হত্যার গুণাহ্ লঘু বিবেচনা করা হয়েছে এবং মূলতঃ অসবধানতার গুণাহ্ প্রযোজ্য হয়েছে। তাই এখানে শাস্তি হিসেবে দাস মুক্তি এবং দিয়তের (রক্তপণ) হুকুম দেয়া হয়েছে; অনন্তর দাস মুক্তির অসমর্থ্যতা থাকলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, আলোচ্য হত্যার জন্য কোন প্রকার পরকালীন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়নি।

**যে সকল ক্ষেত্রে হত্যা বৈধ/ হত্যার বৈধতার বিধান:**

একজন মুসলমানকে হত্যা করা বিশেষ কিছু অবস্থায় জায়েয বা বৈধ। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে একটি সহীহ্ হাদিসে আবুবকর ইবনে আবী শায়বাহ (রহ:) আবদুল্লাহ (রা:) এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

**“এমন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নহে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা’বুদ নেই এবং আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে; কিন্তু তিন কাজের যে কোন একটি করলে তা বৈধ হয়; যেমন ১। বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে, ২। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, ৩।দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করলে বা মুরতাদ হয়ে গেলে।”**

হাদিস, সহীহ্ মুসলিম শরীফ, নং-৪২৩০

এ হাদিস থেকে জানা গেল যে শরিয়তে তিন ধরনের অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার কৃত আপরাধের জন্য হত্যা করার বৈধতা প্রদান করা হয়েছে; সে তিন ব্যক্তি হচ্ছে:

- বিবাহিত ব্যভিচারী,
- অন্যায় হত্যাকারী এবং
- ধর্মত্যাগী মুরতাদ।

কিন্তু এ তিনটি কাজের যে কোনটি কারো দ্বারা সংঘটিত হলে প্রজাদের মধ্যে কারো পক্ষে তাকে হত্যা করার অধিকার নেই, বরং সেটা হচ্ছে ইমাম বা কাজী অথবা প্রতিনিধি বা শাসন কর্তৃপক্ষের অধিকার (তফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড চার, পৃষ্ঠা-৫১০)।

উপরোক্ত তিনটি কারণ ছাড়াও আরো কিছু অপরাধ সংঘটনের শাস্তি হিসেবেও বৈধ হত্যার বিধান রয়েছে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য এ বিধানটি অত্যন্ত উপযোগী। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে পরকালীন আযাব সহ পার্থিব শাস্তির হুকুম সম্বলিত একটি আয়াত বিবৃত রয়েছে।

**“যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বিতারিত করা হবে এবং এটাতো ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি।”**

আল-কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত- ৩৩

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অর্থ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া না বুঝিয়ে অন্তর্নিহিত অর্থে তাঁদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করাকেই বুঝায়। এ বিষয়ে প্রায় সকল তাফসীরবিদগণ ঐক্যমত পোষণ করেন। দ্বিতীয়ত “ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে” বলতে ডাকাতি, লুন্ঠন, ছিনতাই, শ্লীলতাহানী, সন্ত্রাস ইত্যাদি থেকে শুরু করে হত্যা ও রক্তপাত পর্যন্ত নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সকল অপরাধই এর আয়ত্ত্বাধীন। যে সকল কাজে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং রাষ্ট্রে

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা সকলই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা বিদ্রোহের শামিল। আর রাষ্ট্র যখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন এ সংগ্রাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই বিবেচিত হয়। সারকথা এই যে, উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে ডাকাত, লুটেরা বা সন্ত্রাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা সংঘবদ্ধভাবে আক্রমন চালিয়ে জননিরাপত্তা ব্যাহত করে এবং হত্যা, লুন্ঠন, রাহাজানি সহ অন্যন্য প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। এরপর তাদের এসকল অপরাধের শাস্তিও এ আয়াতের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখানে চার ধরনের শাস্তির উল্লেখ রয়েছে- তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিকের হাত ও পা কেটে দেয়া হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটা হল পার্থিব শাস্তি যা কার্যকর করা হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে। উপরন্তু আখিরাতে তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন আযাব।

এতক্ষন আমরা শুধু মুমিন বা মুসলমানকে হত্যার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এখন আমরা জেনে নিব অমুসলিমদের হত্যার ব্যাপারে বিধান কি? আল্লাহর যমীনে একজন মুসলমান যেমন তাঁর দেয়া নেয়ামত ভোগ করে থাকে তেমনি একজন অমুসলিমও এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়না। নাগরিক অধিকার থেকে অমুসলিমদের বঞ্চিত করার অধিকার বা হক যেমন কার নেই তেমনি একজন অমুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার অধিকারও কারও নেই। এ সম্পর্কিত সহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য; আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে (অন্যায়ভাবে) সে বেহেশতের খুশবু হতেও বঞ্চিত থাকবে।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-২৫৮৮

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা জানা গেল যে, অনুগত অমুসলিম নাগরিককেও অকারণে হত্যা করা মহাপাপ, যদিও সে কাফির হয়। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রে অনুগত নাগরিক অমুসলিম হলেও সে তার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার ব্যাপারে একজন মুসলমান নাগরিকের সমান হকদার। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার প্রাপ্যতার দাবীদার। হত্যার মাধ্যমে এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবেনা। কাজেই বোঝা গেল যে, অন্যায়ভাবে কোন অমুসলিম নাগরিককেও হত্যা করার কোন বৈধতা নেই।

**হত্যাকারীর শাস্তির বিধান:** ইচ্ছাকৃত অবৈধ হত্যাকারীর শাস্তি হচ্ছে কিসাস অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা অথবা দিয়াত বা রক্তপণ অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদ। তবে এ ব্যপারে হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের রাজী থাকতে হবে এবং আপোস-মিমাংসার মাধ্যমে নির্ধারিত সম্পদ দিতে হবে। হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা হত্যাকারীকে একেবারে ক্ষমাও করে দিতে পারে। এ হচ্ছে অন্যায় হত্যার পার্থিব শাস্তির বিধান। মহান আল্লাহ্ বলেন,

**“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যা নির্ধারণ করা হল। স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। তবে কাউকে যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করে দেয়া হয় তথা মৃতের ওয়ারিশরা কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ করতে রাজী হয় তবে ওয়ারিশরা যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে তা আদায়ের ব্যপারে তাগাদা দেয় এবং হত্যাকারী যেন তা সদ্ভাবে আদায় করে। এ হচ্ছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে লঘু সংবিধান এবং তোমাদের উপর তাঁর একান্ত করুনা।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-১৭৮

কিসাস সত্যিকারার্থে কোন মানবাধিকার লংঘন নয়। বরং তাতে এমন অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে যা একমাত্র বুদ্ধিমান লোকরাই উদ্ঘাটন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা কিসাসের উপকার সম্পর্কে বলেন,

**“হে জ্ঞানী লোকেরা ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের বাস্তব জীবন লুকায়িত আছে। এতে করে হয়তবা তোমরা আল্লাহভীরু হবে।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-১৭৯

বস্তুতঃ কোন হত্যাকারীর উপর কিসাসের বিধান প্রয়োগ করা হলে অন্যেরা এ ভয়ে আর কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। এর ফলে সমাজে অন্যায় হত্যার সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং তখন অনেকগুলো তাজা জীবন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এটাই কিসাসের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা।

**অন্যায় হত্যাকারীর পরিণতি:**

অন্যায় হত্যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আলোচনার শুরুতেই কোরআনের সুরা নিসার ৯৩ আয়াতে উল্লেখিত হত্যাকারীর পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যায় হত্যাকারীর পরকালে কোন মুক্তি নেই, কল্যাণও নেই; আছে চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা এবং জান্নাত তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। সকল অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পার্থিব শাস্তি থেকে পার পেয়ে গেলেও আখিরাতে কেহই আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারবে না। পরকালে আল্লাহ অন্যায় হত্যাকারীকে অত্যন্ত কঠিনভাবে পাঁকড়াও করবেন এবং জাহান্নামের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন।

দুনিয়ার সমস্ত মানুষেরই নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার যদি কেউ নষ্ট করে তাহলে সে সকলের শান্তি বিঘ্নিত করল। তাই যে ব্যক্তি কাউকে বিনা দোষে বা বিনা কারণে কাউকে হত্যা করল সে তো শুধু এ ব্যক্তিকেই হত্যা করেনি, সে যেন দুনিয়ার সমস্ত লোককেই হত্যা করল। এ বিষয়টি পরিষ্কার বিবৃত হয়েছে পবিত্র কোরআনে। বলা হয়েছে,

**“যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময় অথবা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ধ্বংসাত্মক কার্য ও ফাসাদ সৃষ্টির হেতু ছাড়া অন্যায়ভাবে হত্যা করল, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করল।”**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত-৩২

রোজ কিয়ামতে সকল অপরাধীকে বিচারের জন্য মহান আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে বিচারের কাঠগড়ায় আসামী হয়ে। সেখানে সর্ব প্রথমে খুনের বিচার করা হবে। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**“রোজ কিয়ামতে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।”**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং-৪২৩৬

অন্যায় হত্যার জন্য আল্লাহ তা’আলা জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। বিচারের দিনে আল্লাহ এরূপ হত্যাকারীকে জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করার নির্দেশ দিবেন, চাই সে হত্যার সাথে যত মানুষই জড়িত থাকনা কেন। বিষয়টি সহীহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“আসমান ও যমীনের সমস্ত বাসিন্দা একজন মুমিনের খুনে অংশীদার থাকলেও আল্লাহ তাদের সবাইকে উপুর করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।”**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-১৩৩৮

পরিশেষে বলা যায় যে, দোযখের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং কল্যাণময় আখিরাত হাসিলের জন্য সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এজন্য সকল প্রকার অন্যায় হত্যা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেকের জন্যই বাঞ্ছণীয়।

## যাদু করা

## (Performing Sorcery)

যাদু শব্দটি আরবী 'সিহর' শব্দের বাংলা অনুবাদ। 'সিহর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন সূক্ষ্ম ও অদ্ভুদ কর্মকাণ্ড যার কারণ গোপণীয় ও অজানা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতিক্রিয়া, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া-যেমন জ্বীন-পরী, দানব বা শয়তানের প্রতিক্রিয়া অথবা সম্মোহনী শক্তির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুর অদৃশ্য প্রতিক্রিয়াও হতে পারে- যেমন ড্রাগস ও কেমিক্যালস, চুম্বক ইত্যাদি।

**যাদুর পারিভাষিক সংজ্ঞা:** প্রকৃতপক্ষে যাদুর বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বোধ্য কৌশলগত ব্যাপার এবং এর সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করাও কষ্টসাধ্য। সাধারণ পরিভাষায় যাদু বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যাতে জ্বিন ও শয়তানের কারসাজি, কুফরী বাক্যের প্রভাব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অদৃশ্য প্রভাব, মেসম্যারিজমে কল্পনাশক্তির প্রভাব প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান থাকতে পারে। যাদু হচ্ছে এমন কিছু গিরা-গ্রন্থি, মন্ত্র এবং বাণী বা লিখিত জিনিস যার মধ্যে কুফরী, শির্ক এবং পাপাচার অবলম্বন করতঃ জ্বিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নিয়ে করা হয়। আবার কিছু আছে যা ম্যাজিক দ্বারা ভেলকিবাজরা হাতছাফাই ও চতুরতা দ্বারা মানুষকে নজরবন্দী করে থাকে। ইহা মনের ধারণা ও ধোঁকাবজি যা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের বিপরীত। এক কথায় বলা যায়, প্রকৃতির কিছু অপ্রকাশিত বা অলৌকিক দুষ্ট শক্তিকে কাজে খাটানোর ব্যবহারিক বিদ্যার নাম যাদু। আবার এভাবেও বলা যায়, দুর্বোধ্য বা অলক্ষিত প্রভাবের মাধ্যমে আকাঙ্খিত ফলাফল লাভের কৌশলের নাম যাদু।

**যাদুর প্রকারভেদ:**

পদ্ধতিগতভাবে যাদু বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে,

**প্রথম** প্রকার যাদু হচ্ছে তারকা পূজকদের, যেখানে মানুষের ভাল-মন্দের বিষয় তারকাদের কারণে হয়ে থাকে- এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে কতগুলো নির্দিষ্ট শব্দ পাঠ করতঃ ওদের পূজা করা হয়ে থাকে। এ প্রকারের যাদু মূলত শয়তানের কারসাজির মাধ্যমেই ঘটানো হয়ে থাকে।

**দ্বিতীয়** প্রকার যাদু হচ্ছে, ধারনাশক্তির উপর বিশ্বাসী লোকদের যাদু। প্রকৃতির উপর ধারনা প্রসূত একটা প্রভাব মানুষের মধ্যে কাজ করে এক প্রকার শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে। এ শক্তির বলে কেউ কেউ অলৌকিক কাজ করেও দেখাতে পারে। আবার কখনও কখনও মানুষ এ শক্তি দ্বারা বাতিল ও শরিয়ত পরিপন্থী কাজ করে থাকে এবং দ্বীন হতে বহু দূরে সরে পড়ে।

**তৃতীয়** প্রকার যাদু হচ্ছে, জ্বীন ও ভূত প্রভৃতি আত্মাসমূহের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করা। কতগুলো লোক এসব পার্থিব আত্মার মাধ্যমে কতগুলো শব্দ ও কার্যের দ্বারা সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে। একে মোহমন্ত্র ও প্রেতাত্মার যাদুও বলা হয়।

**চতুর্থ** প্রকার যাদু হচ্ছে ধারণা বদলে দেয়া, নজর-বন্দী করা এবং প্রতারিত করা- যার ফলে প্রকৃতির নিয়মের উল্টো কিছু দেখা যায়।

**পঞ্চম** প্রকার যাদু হচ্ছে, কয়েকটি জিনিসের সংমিশ্রণে একটি জিনিস তৈরী করা এবং এর দ্বারা আশ্চর্যজনক কাজ নেওয়া।

**ষষ্ঠ** প্রকার যাদু হচ্ছে, কতগুলো কেমিকেলস বা ঔষধের গোপন কোন কারসাজি জেনে নিয়ে ওটা কাজে লাগানো।

**সপ্তম** প্রকার যাদু হচ্ছে, কারও উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে কাঙ্খিত কাজটি তার দ্বারা করিয়ে নেয়া।

**অষ্টম** প্রকার যাদু হচ্ছে, চুগলী করা। সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কারো অন্তরে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং গোপনীয় চতুরতা দ্বারা তাকে বশীভূত করা।

**নবম** প্রকারের যাদু করা হয় বিভিন্ন বস্তু যেমন, কাপড়, সুতা, চুল ইত্যাদির মাধ্যমে। শয়তানের নাম নিয়ে এসব বস্তুতে ফুঁক দিয়ে শয়তানী কারসাজির মাধ্যমে যাদু করা হয়।

আবার শির্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে ওলামাগণ যাদুকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১. **শির্কী যাদু:** ইহা শয়তানের মাধ্যমে করা হয়। যাদুকররা শয়তানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানি ও এবাদত ইত্যাদি করে থাকে, যা শিরক।

২. **যুলুম ও সীমালংঘণকর যাদু:** ইহা হাতসাফাই, তেলেসমাতি, খেলাধুলা দ্বারা দ্রুত নড়াচড়া, প্রতারণা এবং কেমিকেলস বা ভেষজদ্রব্য ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তবের বিপরীত প্রকাশ করে থাকে। এসব ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা।

**ইসলামের দৃষ্টিতে যাদু:**

কোরআন ও হাদিসের পরিভাষায় যাদু বলতে এমন সব অদ্ভুত কর্ম-কাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে যেখানে কুফর, শির্ক এবং পাপাচার অবলম্বনের মাধ্যমে জ্বীন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে ওদের সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং এই দুষ্ট শক্তির প্রভাবকে কাজে খাটিয়ে বিভিন্ন অপকর্ম করা হয়। শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হতে পারে। যেমন, অপবিত্র মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করা; এমন সব মন্ত্র পাঠ করা হয় যাতে কুফর বা কুফর ও শির্কের মন্ত্রাবলীর সংমিশ্রণ থাকে। আবার কখনও গ্রহ ও নক্ষত্রের আরাধনা করা হয়- এতেও শয়তান সন্তুষ্ট হয়। এ ছাড়াও নিজে অপবিত্র থাকা, আল্লাহর নাফরমানী করা বা বিভিন্ন অপবিত্র জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমেও শয়তানকে খুশী করা হয়ে থাকে। এভাবে যে কোন পন্থায় শয়তানী অপশক্তিকে খুশী করার মাধ্যমে যাদু করা হলে, সেটা হারাম এবং কবীরা গুণাহ্ হিসেবে স্বীকৃত।

**যাদুর হাকিকত:**

আমাদের জীবনযাত্রায় আমরা কেউ না কেউ, কোন না কোন সময় যাদু প্রয়োগের বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে থাকি- এ বিষয়টি অনস্বীকার্য। যাদুর মাধ্যমে জ্বীন বা প্রেতাত্মাদের সাহায্য নিয়ে চিকিৎসা করা অথবা অন্যের ক্ষতি সাধন করা ইত্যাদি বিষয়গুলি এখনও সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। অতি প্রাচীন আমল থেকেই যাদুর চর্চা প্রচলিত রয়েছে। যাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারা পয়গাম্বরগণও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। যাদুর কারণে মুসা (আঃ)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, এ বিষয় কোরআনেই উল্লেখ রয়েছে। আবার সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপরও যাদু করা হয়েছিল এবং সে যাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং যাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল (তফসীর মা’আরেফুল-কোরআন, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-৩০৮)। সুতরাং যাদুর কুপ্রভাব যে সত্য তা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। যাদুর দ্বারা যাদুকৃত ব্যক্তি বা জিনিসের ক্ষতি সাধান করাই যাদুকরদের মূল উদ্দেশ্য হয়। যাদুর দ্বারা যাদুকৃত ব্যক্তির অন্তরে, বিবেকে ও ইচ্ছার মধ্যে প্রভাব পড়ে। এর ফলে কোন জিনিস থেকে ফিরে যায় আথবা কোন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাদুর কু-প্রভাব কাজে লাগিয়ে মানুষ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর মত অপকর্মগুলি করা শুরু করে দিল। এগুলি জাহিলিয়াতের যুগে করা হত। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে,

**“অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে।”**

আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-১০২

বর্তমান জামানায়ও যাদুর চর্চা অব্যহত রয়েছে এবং এর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যাদু, মন্ত্র-তন্ত্র, কুফরী কালাম বা তাবিজ-কবচের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বশীকরণ বা বিচ্ছেদ, বউ-শাশুরীর মধ্যে মনোমালিন্য তৈরী করা অথবা কাউকে পাগল বানানো বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা করা ইত্যাদি অবৈধ বা হারাম কাজগুলি এ সমাজেরই বাস্তবতা। এ ছাড়াও যাদু দ্বারা হত্যা, অসুখ-বিসুখ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি সহ নানা ধরনের হারাম কাজ করা হয়।

**যাদুর অবৈধতা এবং যাদুর শর’ই বিধান:**

শর’ই দৃষ্টিতে যাদু শুধু কবীরা গুণাহই নয়; বরং তা শিরক এবং কুফরও বটে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন,

**“তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সোলায়মান কুফরী করেনি, কুফরী করেছে সে সব অভিশপ্ত শয়তান, যারা মানুষকে যাদু বিদ্যা**

**শিক্ষা দিয়েছে।”**

আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-১০২

তবে সাধারণ পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার যাদুই কুফর নয়; বরং যে সকল যাদুতে ঈমানের বিপরীত কথা-বার্তা, মন্ত্র-তন্ত্র ও কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়, তাই কুফর। কোরআন ও হাদিসে যাকে যাদু বলা হয়েছে, তা বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়। শয়তানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কিছু শির্ক ও কুফরী বাক্য বলা হলে বা পন্থা অবলম্বন করলে, তা হবে প্রকৃত বিশ্বাসগত কুফর। আর এসব থেকে বেঁচে থেকে অপরাপর গুণাহ বা পাপাচার অবলম্বন করা হলে, তা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত হবে না। জ্বীন ও ভূত-প্রেত জাতীয় অপশক্তির সাহায্যে পরিচালিত হয় এসব যাদু। সুতরাং যে সকল যাদুতে শয়তানকে সন্তুষ্ট করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তা সবই অবৈধ প্রকারের যাদু হিসেবে বিবেচিত এবং কোরআন ও হাদিস দ্বারা এ সকল যাদুকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে যে সকল প্রকারের যাদু অবৈধ এবং হারাম তা নিম্নরূপ:

- যে কোন যাদুর মধ্যে কুফর ও শির্ক অবলম্বন করা হলে তা হারাম।
- জায়েয জিনিসের ব্যবহার এবং কুফর ও শির্ক বর্জিত যাদুও যদি মানুষের ক্ষতি সাধনের জন্য করা হয়, তবে সেটাও গুণাহের মধ্যে শামিল।
- কোরআন ও হাদিসের বাক্যাবলীর সাহায্যে হলেও যদি তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে তা জায়েয নয়।
- তা’বীয-কবচে জ্বীন ও শয়তানের সাহায্য নেওয়া হলে তাও যাদুর মতই হারাম। -(মা’আরেফুল কোরআন প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৯)

শর’ই বিশেষজ্ঞ আলেমগণ, যারা যাদু শিক্ষা করে ও ওটার উপর আমল করে তাদেরকে কাফির বলেছেন। অনুরূপভাবে যাদু শিক্ষা করা, যাদু শিক্ষা দেওয়া এবং তার অবলম্বন করা, যাদু বিশ্বাস করা ইত্যাদিও হারাম এবং এদের সবাইকে সমঅপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’আলা যাদু অবলম্বনকারীদের কঠোর ভাষায় শাসিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে,

**“যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। তারা যা ক্রয় করে নিয়েছে তা সত্যিই নিকৃষ্ট যদি তারা জানত।”**

আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-১০২

কোরআনের এ আয়াতটি যাদুর অবৈধতা ও কবীরা গুণাহ্ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল। বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত রয়েছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“ধ্বংসাত্মক সাতটি কাজ হতে তোমরা বেঁচে থাক।”**

জিজ্ঞাসা করা হল,

**“ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে কাজগুলি কি?”**

তিনি বললেন,

**“আল্লাহর সাথে অংশীদার করা, যাদু করা, অবৈধ হত্যা করা, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, সরলা মুমিন মহিলার প্রতি দুর্ণাম আরোপ করা।”**

হাদিস, সহীহ মুসলীম শরীফ, নং-১৬৮

যাদু অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি গুণাহের কাজ। আর যাদুকর এবং যাদু অবলম্বনকারীদের পরকালে কোন অংশ নেই অর্থাৎ তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল থাকবে এবং তারা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। হযরত আবু মুসা আশআরি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**“তিন প্রকার লোক বেহেশতে যাবে না। ১. সদা মদপানকারী ২. আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ৩. যাদুটোনার প্রতি আস্থা স্থাপনকারী।”**

হাদিস, মেশকাত শরীফ, নং-৩৪৮৯

সুতরাং যাদুর এ অকল্যাণ থেকে দূরে থাকা সকলের জন্যই বাঞ্ছণীয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, শয়তান কখনই জয়ী হতে পারে না। যাদু একটি শয়তানী কাজ। তাই শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ নয়; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, এবং এটাই সরলপথ ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই আসুন যাদুর সাথে কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা থাকলে তা পরিহার করে এর গুণাহ থেকে পরিত্রাণ লাভে সচেষ্ট হই এবং কল্যাণের পথে নিজেকে নিয়োজিত রাখি।

www.waytojannah.com

## ইচ্ছাকৃত ফরয সালাত পরিত্যাগ করা
## (Omitting Salah Intentionally)

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সালাত বা নামায হল এর দ্বিতীয় স্তম্ভ। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা’বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেওয়া (৪) হজ্জ আদায় করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।”**

হাদিস, সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৭

সালাত তাই মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত ইবাদত। সালাত হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন। একজন মুমিন যখন সালাতে দণ্ডায়মান হয়, আল্লাহ্ তখন তা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সিজদার সময় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“সিজদাকালীন সময়ে বান্দা আল্লাহ্ তা’আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। তোমরা এ সময়ে অধিক দোয়া পড়বে।”**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং- ৮৭৫

সালাতের মাধ্যমে মানুষ যখন এত বড় নি’য়ামত প্রাপ্ত হয়, তখন প্রত্যেক মুমিনেরই সালাতের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছণীয়।

**সালাতের শর’ই বিধান:**

সালাত একটি ফরয ইবাদত। ফরযের বাইরেও সালাত হতে পারে সুন্নাত ও নফল সালাত। তবে সংগত কারণেই আমরা এ আলোচনা ফরয সালাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর উপর কোরআনী নির্দেশনার মাধ্যমে সালতের হুকুম বলবৎ করা হয়েছে । পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন,

**"তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-১১০

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করার জন্য সরাসরি এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছেন। সে হিসেবে সালাত আদায় করা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের উপর ফরয বা অবশ্যকর্তব্য। কোরআনের আর একটি আয়াতের মাধ্যমেও সালাত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনুরূপ নির্দেশনা এসেছে। আল্লাহ বলেন,

**"আর তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-৪৩

এ আয়াতে সালাত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জামাতে সালাত আদায় করার প্রতি তাকীদ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

প্রত্যেক প্রাপ্তঃবয়স্ক নর ও নারীর উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত সালাতের বিধান পর্যালোচনা করে শর'ই বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তবে চুড়ান্তভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ঘোষণা এসেছে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে। মে'রাজের রাত্রে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে তার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার নির্দেশনা প্রাপ্ত হন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,

**"মি'রাজ রজনীতে নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়েছিল, পরে তা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত ধার্য করা হয়।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং- ২১৩

কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের নির্বাহী আদেশ পাওয়া গেলেও সালাত আদায় পদ্ধতি এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য নির্ধারিত সময়সূচী সম্পর্কে কোরআন থেকে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়না। এ বিষয়টি শরিয়ত প্রণেতা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নতের উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল রয়েছে। সকলকেই তাঁর সুন্নতের অনুসরণেই সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের সঠিক সময়সীমা নির্ধারণ করে সালাত আদায় পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্তের সালাত সঠিক সময়ে আদায় করা

প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সালাতের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে সে সময়ের মধ্যেই সালাত আদায় করা জরুরী। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীদের উপর নির্ধারিত সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে।"**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত- ১০৩

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী ফরয আদায় হওয়ার জন্য প্রতি ওয়াক্তের সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উক্ত সালাত আদায় করা চাই। যে কোন সময়ে সালাত পড়ে নিলেই হয়ে যাবে, এরূপ ধারনা পোষণ করা থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে। শরিয়তের কোন ওযর ব্যতীত নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে ঐ ওয়াক্তের সালাত পড়া হলে আল্লাহর কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। সালাত গ্রহণযোগ্যতার জন্য সালাত আদায় পদ্ধতিও সঠিক হওয়াটা অত্যাবশ্যক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করেছেন, আমাদেরকেও ঠিক সেই পদ্ধতির অনুসরণে সালাত আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কারো মনগড়া নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণের কোন সুযোগ নেই। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাটি পাওয়া যায় বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"তোমরা যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ সেভাবে সালাত আদায় করো।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৬০৩

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে যেভাবে সালাত আদায় করেছেন, তিনি উম্মতদেরকেও তাঁর অনুসরণে সেভাবে সালাত আদায় করার প্রতি যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সকলেরই কর্তব্য হল সালাত সহ সকল ইবাদতে সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

সালাত কোন স্বল্পকালীন বা অনিয়মিত ইবাদত নয়, বরং সালাত চিরস্থায়ী এবং নির্ধারিত ও নিয়মিত ইবাদত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সালাত কায়েম রেখেছেন, তাই আমাদেরকেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সালাত আদায়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। কোন বিশেষ সময়ে বা কিছুদিনের জন্য সালাত আদায় করাই যথেষ্ট নয়, বরং সারাজীবন নিয়মিতভাবে সালাত কায়েম রাখা একজন মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

**সালাত প্রতিষ্ঠা করা:**

পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় বারংবার সালাত প্রতিষ্ঠা করা বা কায়েম করার তাকীদ দেয়া হয়েছে। কোথাও এমনভাবে বলা হয়নি যে, সালাত পড়। সালাত পড়া এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করা,

এ দু'য়ের মধ্যে বিস্তর অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। কায়েম শব্দটি ব্যাপক অর্থপ্রকাশক একটি শব্দ। এ শব্দটি দিয়ে সালাত পড়া সহ সালাতের আনুসঙ্গিক সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে সালাত কায়েম করা যে ব্যাপক অর্থ বহন করে, তা নিম্নরূপ-

-  নিয়মিতভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি সালাত আদায় করা এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সালাতের উপর অবিচল থাকা।
-  কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণে এবং আন্তরিকতা, বিনয়, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা ও গভীর মনঃসংযোগের সাথে সালাত আদায় করা
-  রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহর অনুসরণে সালাত আদায় করা।
-  সালাতের প্রতিটি রোকন, যেমন দণ্ডায়মান হওয়া, তাকবির দেওয়া, রুকু করা, সিজদা করা ইত্যাদি প্রতিটি কাজই যথাযথ এবং সঠিকভাবে পালন করা।
-  বিশুদ্ধভাবে ক্বিরাত পাঠ করা।
-  জামাতের সাথে সালাত আদায় করা।
-  নিজে সালাত আদায় করার সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদেরকে সালাতের তাকীদ দেওয়া ও অন্য সকলকেও সালাতের প্রতি আহবান করা এবং সমাজে সালাতকে চালু রাখা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও সালাতের আলোকে নিজের জীবন পরিচালনা করাও সালাত কায়েম করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সালাতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটা চাই নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। কেননা সালাতের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে সরলপথ দেখানো এবং অশ্লীল এবং পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। একজন প্রকৃত সালাত আদায়কারী যখন আল্লাহর স্মরণে সালাত আদায় করে থাকে তখন সে যাবতীয় নির্লজ্জ ও মন্দ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে, এটাই সালাতের মূলমন্ত্র।

আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন, "নামাযে তিনটি জিনিস রয়েছে। এ তিনটি জিনিস না থাকলে নামায হবে না। প্রথম হলো ইখলাস বা আন্তরিকতা, দ্বিতীয় হলো আল্লাহর ভয় এবং তৃতীয় হলো আল্লাহর জিকির। ইখলাস দ্বারা মানুষ সৎ হয়ে যায়। আল্লাহর ভয়ের কারণে মানুষ পাপকার্জ পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহর জিকির অর্থাৎ কোরআন মানুষকে ভাল ও মন্দ বলে দেয় এবং আদেশও করে আবার নিষেধও করে" (তফসীর ইবনে কাসীর, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮৫)। যার সালাতে এ বিষয়গুলি অনুপস্থিত থাকে, তার সালাত অসম্পূর্ণ এবং অর্থহীন। এ সম্পর্কে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যার সালাত তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেনা, তার সালাত নেই (অর্থাৎ আল্লাহর**

**দরবারে তার সালাত কবুল হয় না)”।**

তফসীর ইবনে কাসীর, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮৪

**সালাতের হক:**

সালাতের হক কি? এবং তা কিভাবে আদায় করতে হয়? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা থাকা দরকার। আবার যেনতেন প্রকারে দায়সাড়া গোছের সালাত পড়লেই কি সে হক আদায় হয়ে যাবে? এর উত্তর হলো: না, তাতে সালাতের হক আদায় হবে না। সালাত শুধু পড়ার বিষয় নয়; বরং এর গুরুত্ব অনুধাবন করে সে অনুযায়ী পরিপূর্ণ আদব এবং আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করাই মূখ্য বিষয়। সালাতের হক হচ্ছে সঠিক সময়ে এবং সঠিক নিয়মে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। বান্দা সালাত আদায় করবে তার নিজের কল্যাণের জন্য। এটা এমন বিষয় নয় যে, যেন তেন ভাবে মন্ত্র পড়ার ন্যায় তড়িঘড়ি করে আল্লাহর দরবারে কয়েকটি রুকু ও সিজদা দিলেই সব কিছু করা হয়ে গেল। সালাত শুধু পড়লেই হবে না। সালাতের পূর্ণ হক আদায় করে সালাত পড়তে হবে। অন্যথায় দায়সাড়া সালাতের কোন মূল্যই পাওয়া যাবেনা আল্লাহর কাছে। সালাত কবুল হওয়ার জন্য সালাতের হক আদায় করা জরুরী। সালাতের হক আদায় না করে সালাত পড়া হলে আল্লাহর কাছে সে সালাতের কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকেনা। সালাতের হক বলতে যা বোঝায় এবং তা যেভাবে আদায় করতে হয় সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ:

- পাক-পবিত্রতা হাসিল করে পরিপূর্ণ অযু সহকারে সালাতে হাজির হওয়া।
- বিনয়ের সাথে এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সালাতে দণ্ডায়মান হওয়া।
- প্রতি ওয়াক্তের সালাত নির্ধারিত সময়ে এবং জামাতের সাথে ফরয সালাতগুলি আদায় করা।
- খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায় করা।
- তড়ি-ঘড়ি না করে ধীরে-সুস্থে সালাতের রোকনগুলি সঠিকভাবে আদায় করা। যেমন পরিপূর্ণভাবে রুকু করা, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সঠিকভাবে সেজদা করা, দুই সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ।
- নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত তরিকায় সালাত আদায় করা।

সালাতের হক আদায় না করে সালাত পড়লে যে তা আদায় হবে না এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে। তিনি বলেন,

**“রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ল। সে নবীজির কাছে এসে সালাম দিল। তিনি বললেন, তোমার প্রতিও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি।**

সে ফিরে গেল এবং নামায পড়ল, তারপর সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে সালাম দিল। তিনি বললেন, তোমার প্রতিও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায পড়। কেননা তুমি নামযই পড়নি। তৃতীয়বারে সে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে সঠিকভাবে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে, তখন পরিপূর্ণ ওযু করে নিবে। তারপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। এরপর কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ মনে হয় সেখান থেকে ক্বিরাত পাঠ করবে। তারপর ধীর স্থিরভাবে রুকু করবে। অতপর রুকু থেকে সোজা স্থিরভাবে দাড়িয়ে যাবে। তারপর তুমি ধীর স্থিরতার সাথে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসবে। এভাবে তুমি তোমার নামাযের রোকনগুলি আদায় করবে।”

হাদিস, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ১০৬০

প্রত্যেকেরই উচিত সালাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করে যথাযথভাবে সালাত আদায় করা। সালাত কবুল হওয়ার জন্য সালাতের হক আদায় করা পূর্বশর্ত। একটি লোক সাড়া জীবন ধরে সালাত আদায় করল কিন্তু সে সালাতের যথাযথ হক আদায় করল না, এমতবস্থায় তার সালাত কি করে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

**যাদের উপর থেকে সালাতের হুকুম রহিত করা হয়েছে:**

শর’ই বিধান মোতাবেক কতিপয় ব্যক্তির উপর থেকে সালাতের হুকুম তুলে নেয়া হয়েছে। যাদেরকে সালাত আদায়ের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে, এদের মধ্যে রয়েছে:

- **নাবালক শিশু**
- **বেঁহুশ ব্যক্তি**
- **পাগল ব্যক্তি**
- **হায়েস ও নেফাসকালীন নারী।**

উপরোক্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে না এবং এর কোন কাযাও করতে হবে না। এ সময়কালীন সালাতের জন্য কাউকে পাঁকড়াও করা হবে না এবং এর জন্য কোন জবাবদিহিতাও নেই। এ অবস্থার বাহিরেও কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি বা সালাত ভুলে যাওয়া ব্যক্তির উপরে সালাতের হুকুম কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঘুম থেকে উঠে বা ভুলে যাওয়া সালাতের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই ঐ ওয়াক্তের সালাত আদায় করে নিতে হবে, এটাই এর বিধান। এ সম্পর্কে হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সালাতের কথা ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

**"নিদ্রার বেলায় কোন গুণাহ্ নেই। গুণাহ্ হল জাগ্রত অবস্থায়। তোমাদের যদি কেউ সালাত আদায় করতে ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, তবে যে সময়ে মনে পড়বে তা আদায় করে নেবে।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং- ১৭৭

**সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:**

সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সালাত তো হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি এবং সমস্ত আমল হতে এটা উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন। সালাত হচ্ছে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং বান্দার জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সর্বোত্তম সিঁড়ি। তাই মুমিনের জন্য সালাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোরআন কারীমে সালাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সালাতের হুকুম-আহকামের বর্ণনা রয়েছে। কোথাও রয়েছে সালাত কায়েম করার হুকুম, কোথাও রয়েছে সালাতে যত্নবান থাকার কথা এবং কোথাও রয়েছে সালাতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকারীদের শাস্তির বর্ণনা। সালাতের উপর কায়েম থাকা তাই প্রত্যেক বান্দার জন্য জরুরী। পরকালীন মুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। পরকালে সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসেব নেয়া হবে। এ সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

**"আমি নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-**কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসেব নেয়া হবে সালাতের। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয় তবে সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত এবং সফলকাম, আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয় তবে সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং- ৪১৩

সুতরাং সালাতের হিসেব মিলাতে হলে আমাদেরকে জীবনের সর্বাবস্থায় সালাত কায়েম রাখার প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে। অন্যথায় রোজ কিয়ামতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

**সালাতের ফজিলত এবং উপকারীতা:**

সালাত আদায়ের বহু উপকারীতা ও ফজিলত রয়েছে। সালাত মুমিনের জন্য বয়ে আনে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যান আর দূর করে দেয় সকল অকল্যাণ। সালাতের কল্যানকর ও উপকারীতার দিকগুলি নিম্নরূপ:

- আত্মিক
- শারীরিক
- সামাজিক ও
- পারলৌকিক ইত্যাদি।

সালাতের আত্মিক উপকারীতার মধ্যে রয়েছে বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর সম্পর্ক স্থাপন। বান্দার সালাত আল্লাহর সাথে মি'রাজ সমতুল্য। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবথেকে বেশী নিকটবর্তী হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যদি আল্লাহর চরম আনুগত্যের ধ্যান সহ সালাত আদায় করা হয় তবে এ সালাতে অবশ্যই মুসল্লীর আত্মিক উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হবে। সালাতের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে সরলপথ দেখানো এবং অশ্লীল এবং পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। সালাত মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত করে। একজন প্রকৃত সালাত আদায়কারী যখন আল্লাহর স্মরণে সালাত আদায় করে থাকে তখন সে যাবতীয় নির্লজ্জ ও মন্দ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে, এটাই সালাতের মূলমন্ত্র। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

**"নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ।"**

আল কোরআন, সুরা আনকাবূত(২৯), আয়াত- ৪৫

সালাতের মধ্যে যে জীবন দর্শন রয়েছে, তা উপলব্ধি করে সেভাবে সালাত আদায় করতে সক্ষম হলে একজন মানুষের জীবন থেকে সকল অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ বিদূরীত হতে পারে। সুতরাং সালাত শুধু পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় নয়, বরং সালাতের ব্যাপকতা উপলব্ধি করা এবং সে অনুযায়ী আমল করাই সারকথা। তড়িঘড়ি করে দায়সাড়াভাবে সালাত আদায় করার মধ্যে কোন সফলতা নেই। বরং সালাতের অনুবর্তী হয়ে এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল রীতিনীতি পালন সহকারে সালাত আদায় করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা। যে ব্যক্তি এভাবে সালাত আদায় করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তওফিক প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সালাত পড়া সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকেনা, তখন বুঝতে হবে যে, তার সালাতের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান এবং সে সালাত কায়েম করার প্রকৃত হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭১)।

সালাতের শারীরিক উপকারীতা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে গিয়ে দৈনিক পাঁচবার ওযু করতে হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। সালাতে উঠ-বস করা একটি শারীরিক ব্যায়ামও বটে। জামাতে সালাত পড়তে হলে মসজিদে হেঁটে যেতে হয়, সেটাও শরীরের জন্য খুব উপকারী।

সালাতের সামাজিক উপকারীতা হলো, সালাত আদায় মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যবোধ শিক্ষা দেয়। নিয়মিত সালাত আদায়কারী কখনো কর্তব্যে অবহেলা এবং অনিয়ম প্রদর্শন করতে পারে না। জামা'আতের সালাত মানুষকে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও শৃংখলাবোধ শিক্ষা দেয়। জামাতে একসাথে কাতারবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সারি কিছু সময়ের জন্য হলেও আমাদেরকে

www.waytojannah.com

ভুলিয়ে দেয় ধনী-দরিদ্র, ফকির-মিসকীন, আর বড়-ছোটর ব্যবধান। কি চমৎকার মানবতাবোধ! এটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারাটাই সালাতের শিক্ষা।

সালাতের পারলৌকিক উপকারীতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সালাত আল্লাহর মহব্বত ও আনুগত্য প্রকাশের অন্যতম পন্থা এবং সালাতের মাধ্যমে যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাই সালাত হচ্ছে আল্লহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় বা ওসীলা।

সালাত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার দাসত্ব বা গোলামী ও মহব্বতের চুরান্ত বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত গায়রুল্লাহর ইবাদত এবং গায়রুল্লাহর গোলামীর শৃংখল হতে মানুষকে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইবাদত এবং দাসত্বে নিয়োজিত করা সালাতের অন্যতম লক্ষ্য। একজন মুসলমান যখন সালাতের পূর্ণ হাকিকত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যদি নিছক প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে এবং যদি নামাযের মর্মবাণী হৃদয়ে অনুরণিত হয় তাহলে একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সালাত মুসল্লীর জীবনে আমুল পরিবর্তন এনে দেবে। সালাতের বাহিরে কোলাহলপূর্ণ জীবনেও সে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে সক্ষম হবে সালাতের রঙে। সালাতই নিয়ন্ত্রণ করবে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি পদক্ষেপ। অবশেষে এই সালাতই তার জন্য বয়ে আনবে সুখময় জান্নাত।

**সালাত পরিত্যাগ করা কুফরী:**

সালাত পরিত্যাগ করা অর্থ সালাত ছেড়ে দেওয়া বা সালাত নষ্ট করা। সালাত নষ্টকারীদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীগণ। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।"**

আল কোরআন, সুরা মারইয়াম(১৯), আয়াত- ৫৯

এ আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অভাব হবে তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন সালাতের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না, ফলে তখন সালাত নষ্টকারীদের দল বৃদ্ধি পাবে। তারা নানা কুকর্ম ও পাপাচারে লিপ্ত থাকবে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে কাফির, মুনাফিক এবং মুমিন, এই তিনটি দলের মধ্যে থেকেই সালাত নষ্টকারী হয়ে থাকবে।

সালাত অস্বীকারকারী হিসেবে যারা সালাত পরিত্যাগ করে, তারাতো সরাসরি কাফির। আর কাফিরদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই, তারা জাহান্নামের অগ্নির শাস্তি ভোগ করবে এবং চিরকাল সেথায় অবস্থান করবে।
মুনাফিকদের অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ। তারা মূলত অবিশ্বাসী এবং সালাত পরিত্যাগকারী কিন্তু কখনও কখনও মুমিন সাজার ভান করে এবং লোক দেখানো সালাত আদায় করে থাকে। বস্তুতঃ এরাও কাফিরদেরই দলভুক্ত। মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

**“নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।”**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত- ১৪২

উল্লেখিত আয়াতে মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। মুনাফিকগণ নিজেদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন। তবে লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবী প্রমাণ করার জন্য তারা সালাত পড়ে থাকে। বস্তুতঃ সালাত যে ফরয এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয় এবং আল্লাহর স্মরণেও তারা সালাত আদায় করে না। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখেনা এবং আসল সালাতেরও খেয়াল রাখে না, লোক দেখানোর জায়গা হলে নামায পড়ে নেয়, নতুবা ছেঁড়ে দেয়। সালাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই মুনাফিকের লক্ষণ। এ সব মুনাফিকের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

মুসলিমদের মাঝেও অনেকে শরিয়তের সকল বিষয়ের উপর আস্থা স্থাপন করা সত্ত্বেও তাদের সালাতকে নষ্ট করে থাকে বিভিন্নভাবে। বিশিষ্ট ওলামাদের মতে মুমিনের বেলায় সালাত নষ্ট করা বলতে যা বুঝায় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

- সালাতের অপরিহার্যতা স্বীকার করা সত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা।
- সালাতে গড়িমসি করা বা অবহেলা করা এবং সালাত নিয়মিত আদায় না করা অর্থাৎ মন চাইলে সালাত পড়লাম আর মন না চাইলে পড়লাম না। এভাবে দিনের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বদলে কিছু ওয়াক্তের সালাত আদায় করা আর কিছু আদায় না করা অথবা কিছুদিন সালাত পড়া আর কিছুদিন না পড়া।
- সালাত সম্পর্কে উদাসীন থাকা অর্থাৎ সালাতের ওয়াক্তমত আদায় না করা কিংবা সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে দায়সাড়াভাবে সালাত আদায় করা।
- সালাতের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা। সালাতের সব রোকনগুলি সঠিকভাবে আদায় করা অর্থাৎ ঠিকমত রুকু করা, রুকু থেকে উঠে দাড়ানো, ঠিকমত

সিজদা করা এবং দুই সিজদার মধ্যে ঠিকমত বসা কিংবা শুদ্ধভাবে ক্বিরাত পাঠ করা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান না হওয়া।

-  সালাতে ইখলাস না থাকা অর্থাৎ সালাত আন্তরিকতার সাথে আল্লহর সন্তুষ্টির জন্য আদায় না করা।
-  রিয়া বা লোকপ্রদর্শণীমূলক সালাত আদায় করা।
-  জামাতের সাথে সালাত আদায় না করা।

এখান থেকে বোঝা গেল যে, সালাত সম্পর্কে উদাসীন থাকা, সালাত আদায়ে গড়িমসি করা এবং নিয়মিত সালাত আদায় না করা কিংবা আদৌ সালাত না পড়া ইত্যাদি সকল বিষয়ই সালাত নষ্ট করা বা সালাত ছেড়ে দেয়ার শামিল। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে সময় চলে যাওয়ার পরে সালাত পড়া এবং সালাতের আদব লঙ্ঘণ করে সালাতের রোকনসমূহের মধ্যে কোনোটিতে ত্রুটি করা- সালাত নষ্ট করার শামিল। সালাতের রোকনসমূহের মধ্যে রুকু ও সিজদা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি রোকন। যে ব্যক্তি সালাতের রুকু-সিজদায় তড়িঘড়ি করে, ফলে রুকুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসেনা, তার সালাত অসম্পূর্ণ এবং সে তার সালাতকে নষ্ট করে দেয়। এ সম্পর্কে তিরমিযীতে হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বাচনিক থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"ঐ ব্যক্তির নামায হয়না, যে ব্যক্তি রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থানে সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না।"**

তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫

আবার অনেকের ধারনায় 'সালাত নষ্ট করা' বলতে জামাতে শরীক না হয়ে নিজ গৃহে একাকী সালাত আদায়কে বোঝান হয়েছে। জামাতে সালাত আদায় করার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক মুমিনেরই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করা জরুরী। সালাতের জন্য জামাতে শরীক হওয়ার জন্য শরিয়তে কঠোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং জামাত পরিত্যাগকারীদের প্রতিও কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। এপর্যায়ে জামাতে সালাত আদায় করা জরুরী হওয়া সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস উপস্থাপন করা হলোঃ
হযরত কুতায়বা ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদিস। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"যে ব্যক্তি মুয়াযি্যনের আযান শুনে বিনা ওজরে মসজিদে হাজির হয়ে নামায আদায় করে না, তার অন্যত্র আদায়কৃত নামায আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না।"**

হাদিস, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৫৫১

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

**“যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিনজন ব্যক্তিও অবস্থান করে অথচ তারা জামাতের সাথে নামায কায়েম করে না, তাদের ওপর তখন শয়তান সওয়ার হয়ে যায়। অতএব জামাতের সাথে নামায কায়েম করা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা দলছুট বকরীকেই নেঁকড়ে বাঘে খেয়ে থাকে।”**

হাদিস, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৫৪৭

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে,

এক অন্ধ ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন,

**“ইয়া রাসূলুল্লাহ্** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**! আমি অন্ধ, তদুপরি আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মত কোন লোক নেই, এ অবস্থায় আমি কি ঘরে সালাত (ফরয সালাত) আদায় করতে পারি?”**

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন,

**“তুমি কি আযান শুনতে পাও?”**

লোকটি উত্তর দিল,

**“হ্যাঁ”**

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন,

**“তবে তুমি জামাতে উপস্থিত হবে।”**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ১৩৬১

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**“আমার ইচ্ছে হয় আমি যুবকদিগকে আমার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিতে লোকদের নামায পড়িয়ে দিতে আদেশ দান করি। অতঃপর যারা জামাতে শরীক না হয়ে ঘরে বসে থাকে, তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলি।”**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ১৩৬০

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে এটা অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে জামাতের সাথে সালাত আদায় করার প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তুতঃ শর’ই ওযর ব্যতীত জামাত পরিত্যাগ করার কোন বিধান নেই এবং ফরয সালাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য

জামাতের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু সমাজের বাস্তবতায় দেখা যায়, আজ লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আজকাল জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন অনেক লোকও দেখা যায়, যারা সালাতের জন্য কদাচিৎ মসজিদমুখী হন। এমনকি তারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায় করা থেকেও বিরত থাকছেন। তারা বস্তুতঃ নিজেদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন রয়েছেন এবং সালাতকে নষ্ট করে চলছেন নির্বিকারে।

এভাবে মুসলিমদের মধ্যে যারা সালাত থেকে গাফিল রয়েছেন এবং সালাতকে নষ্ট করছেন বিভিন্নভাবে তাদের অবস্থাও যে প্রকারান্তে ঐ অবিশ্বাসী কাফির এবং মুনাফিকদের অনুরূপ তা বলাই বাহুল্য। বাহ্যিকভাবে কাফির এবং মুমিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয় সালাতের মাধ্যমে। যে সালাত পরিত্যাগ করল সে তো আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করল এবং সেটা প্রকারান্তে সালাত অস্বীকারের শামিল। শরিয়তে সালাত পরিত্যাগ করাকে কুফরী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। বোরাইদা বিন হোসাইব (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

**"আমাদের ও তাদের (মুনাফিক/কাফির) মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযের। অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো সে কুফরী করলো।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২৬২২

অন্য একটি হাদিসে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

**"মানুষ এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল নামায ছেড়ে দেয়া।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ১৫০

পাঠকবৃন্দ! কি ভয়াবহ কথা! বিনা কারণে সালাত ত্যাগ করা বা ছেড়ে দেওয়া কিংবা সালাত আদায়ে গাফেলতি করা হলে মুসলিম হওয়া সত্বেও কুফরীর বদনাম গায়ে মেখে নিয়ে পরকালে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। কোন কোন ইমামের মতে সালাত ত্যাগ করা এমনই কুফরী কাজ যা সালাত ত্যাগকারীকে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। তাই আপনি যদি এ দলে শামিল থেকে থাকেন তাহলে সময় নষ্ট না করে এ ভয়াবহ অবস্থা এবং এর শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আজই নিজেকে শুধরে নিন এবং সালাতের প্রতি যত্নশীল হউন।

**সালাত পরিত্যাগকারীর প্রতি শরিয়তের বিধান:**

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগ করা বা সালাতকে নষ্ট করা কুফরী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সালাত পরিত্যাগকারীর প্রতি শরিয়তের যে বিধান রয়েছে উপযুক্ত দলীল সহ নিম্নে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

১ম: বেনামাযির কোন মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ হারাম। বেনামাযী অবস্থায় যদি তার আখত বা বিবাহ সম্পাদন করা হয়, তাহলেও তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই বিবাহের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হবে না। বিবাহ বন্ধন সম্পাদন হওয়ার পর যদি সে সালাত ত্যাগ করে তাহলেও তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মুমিন পুরুষের জন্যও কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা জায়েয নয়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন,

**"মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। তোমরা (মুমিনগণ) কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা তাদের যা মোহর দিয়েছো তা তাদের থেকে চেয়ে নাও এবং কাফিররা মোমেন নারীদের যে মোহর দিয়েছে তাও ফেরত চেয়ে নেবে। এটাই আল্লাহর বিধান।"**

আল কোরআন, সুরা মুমতাহিনা(৬০), আয়াত- ১০

২য়: বেনামাযীর মক্কা ও তার হারামের এলাকায় প্রবেশ নিষেধ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন,

**"হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকট না আসে।"**

আল কোরআন, সুরা তাওবা(৯), আয়াত- ২৮

৩য়: সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তির যদি নিকট আত্মীয় মারা যায়, তাহলে সে সম্পত্তির কোন মিরাস পাবে না। যেমন: কোন ব্যক্তি এমন সন্তান রেখে মারা গেল যে সালাত আদায় করে না, তাহলে সে বেনামাযী সন্তান পিতার কোন কিছুর ওয়ারিস হবে না। আবার কোন মুমিন নিকট আত্মীয়ও সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হাদিস বর্ণিত রয়েছে বুখারী শরীফে। উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৬৩০৮

৪র্থ: সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তি মারা গেলে তার উপর জানাযার সালাত পড়া যাবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা যাবে না। তার পরিবার পরিজনের তার জন্য রহমত ও মাগফেরাতের দোআ বৈধ নয়। কিয়ামতের দিন কাফেরদের নেতা ও প্রধানদের সাথে তার হাশর-নাশর হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"নবী ও মুমিনদের জন্য এটা জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করে। যদিও তারা ঘনিষ্ট আত্মীয়ই হোকনা কেন, যখন এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।"**

আল কোরআন, সুরা তাওবা(৯), আয়াত- ১১৩

প্রিয় পাঠক! এবার নিজেই চিন্তা করে দেখুন আপনার কি অবস্থা! এখনও সময় আছে, আপনি যদি সালাত ত্যাগকারী হন তাহলে তাওবা করে অতি শীঘ্রই সঠিক পথে চলে আসুন এবং সালাত আদায়কারীদের দলভুক্ত হয়ে পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় ব্রত হউন।

**সালাত ছেড়ে দেওয়ার পরিণাম :**

ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করা বা সালাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা কবীরা গুনাহ্। ভোগ লালসায় মত্ত হয়ে যারা সালাতের ব্যপারে উদাসীন থাকে এবং সময় মত সালাত আদায় না করে তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"অতএব 'ওয়েল' নামক জাহান্নামের দুর্ভোগ সে সব নামাযীদের যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে।"**

আল কোরআন, সুরা মাউন(১০৭), আয়াত- ৪,৫,৬

সালাত পরিত্যাগকারী মহা পাপের মধ্যে নিবিষ্ট রয়েছেন এবং তাদের জন্য যে পরকালে নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের অগ্নির কঠিন শাস্তি সে কথা পরিস্কার। জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"(জান্নাতীরা অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে) কোন কারণে তোমরা জাহান্নামে নীত হয়েছ? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের দলে শামিল ছিলাম না।"**

আল কোরআন, সুরা মুদ্দাসসীর(৭৪), আয়াত- ৪২-৪৩

এখান থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সালাত আদায় না করা জাহান্নামের শাস্তির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তবে এ গুণাহ থেকে তাওবা করা হলে আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্ষমাশীল পাওয়ার আশা করা যায়। একবার ভেবে দেখুনতো আপনার বয়স আর কত বাকী আছে। তা কি কয়েক বছর, না মাস, না কয়েক ঘন্টা? এ বিষয়ের সঠিক জ্ঞান রয়েছে আল্লাহর কাছে। হতে পারে তাওবা করার আর সময়ই মিলল না এর মধ্যেই পরপারের ডাক এসে গেল। সুতরাং পরকালীন কল্যাণার্জন এবং জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে অতি সত্তর অতীতের সালাত পরিত্যাগ করার কঠিন গুণাহ্ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন সালাত পরিত্যাগ না করে, সালাত প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি মনস্থির করে সে অনুযায়ী নেক আমল করে যেতে হবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী ও ক্ষমাশীল। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

## বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা
## (Breaking the Fast of Ramadhan)

রোযা শব্দটি এসেছে আরবী ‘সাওম’ শব্দ থেকে যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে-সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে একাধারে পানাহার এবং যৌনাচার থেকে বিরত থাকাকে ‘সাওম’ বা রোযা বলা হয়। আল্লাহর নির্দেশ পালনের স্বার্থে খাঁটি নিয়তে উপবাস থাকলেই তা রোযা হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে বিরত থাকার পরেও রোযার নিয়ত না থাকলে তা রোযা হবে না। আবার রোযার নিয়ত করা হলেও উল্লেখিত সময়ের মধ্যে যদি পানাহার করা হয় বা যৌনাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ হচ্ছে রোযা। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা’বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেওয়া (৪) হজ্জ আদায় করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।”**

হাদিস, সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৭

**রোযা বা সাওমের বিধান:**

সাওম বা রোযা একটি ফরয ইবাদত। প্রত্যেক প্রাপ্তঃবয়স্ক ঈমানদার ব্যক্তির জন্য রোযাব্রত পালন করা অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

**“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-১৮৩

উল্লেখিত আয়াতটি সাধারণভাবে সকল মুমিনদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। রোযা ফরয করার সাথে সাথে এর অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, রোযা মুমিনদের জন্য পরহেযগারী অর্জনে সহায়ক হবে। কিন্তু এখানে রোযার জন্য দিন-ক্ষণ বা সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। পরবর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ তা’আলা বিস্তারিতভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে রোযার বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

**“রমযান মাস, যার মধ্যে নাযিল করা হয়েছে কোরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-১৮৫, ১৮৭

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে রোযা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং এর মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হয়েছে অনেকগুলি দিক নির্দেশনা।

**প্রথমতঃ** রোযাব্রত পালনের জন্য রমযান মাসকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পুরো রমযান মাসই রোযা পালন করতে হবে।

**দ্বিতীয়তঃ** রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটা শর্ত। এ মাসটি পাবার মর্ম হল, রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া যাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে; অর্থাৎ মুসলমান, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি এবং সজ্ঞান ও মুকীম অবস্থায় এ মাসে বর্তমান থাকা। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার উপর ধারাবাহিকভাবে গোটা মাসের রোযা পালন করা ফরয। তবে আংশিক বা পূর্ণ মাসটিই যার এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, তার রোযা রাখার সামর্থ্য থাকেনা- যেমন কাফির, নাবালেগ, উম্মাদ প্রভৃতি, তখন সে লোক এই নির্দেশের আওতাভূক্ত হয়না (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৯)।

**তৃতীয়তঃ** সফরকালীন অবস্থা, রোগ-শোক কিংবা নারীদের হায়েস-নেফাসকালীন অবস্থাও রোযা রাখার যোগ্যতার ক্ষেত্রে রমযান মাসে বর্তমান বলে গণ্য হবে এবং তাদের উপরও আয়াতে বর্ণিত হুকুম বর্তাবে। তাদের উপর থেকে রোযার ফরয হুকুম একেবারে তুলে নেওয়া হয়নি বরং ওযরের প্রেক্ষিতে তাদের জন্য কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে মাত্র। নির্দিষ্ট ঐ সময়কালীন রোযাগুলির জন্য তাদেরকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু ওযর শেষ হলেই তাদেরকে হিসেব করে সে সকল রোযা কাযা আদায় করে নিতে হবে। এভাবে হায়েস-নেফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যদি রমযানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে ওঠে কিংবা কোন মুসাফির (সফরকালীন ব্যক্তি) যদি মুকিম হয়ে যায়, তবে এর পরবর্তী রোযাগুলি তাকে সঠিকভাবে পালন করে যেতে হবে এবং বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার জন্য জরুরী হবে- যা পরবর্তী সময়ে আদায় করে নিলে চলবে।

**চতুর্থতঃ** রমযানের রাতে খানা-পিনা, স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি হালাল করে দেয়া হয়েছে।

**পঞ্চমতঃ** প্রতিটি রোযার সঠিক সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। সুবহে-সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় রোযার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুবহে-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সেহরী করার

অনুমতি রয়েছে এবং সূর্যাস্তের পরে ইফতারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়ে পানাহার করা হলে বা যৌনকর্মে লিপ্ত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। মোটকথা এ আয়াতের নির্যাস থেকে সিয়াম পালন সম্পর্কে মূলত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিধান পাওয়া যায়। এক. রমযানের রোযা ফরয হওয়ার শর্ত; দুই. রোযা পালন করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত।

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে:

- মুসলমান হওয়া
- বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া
- আকিল বা সজ্ঞানে থাকা

রমযানের রোযা নির্ধারিত সময়ে বা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব হওয়ার শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সুস্থ থাকা বা রোগমুক্ত থাকা
- মুকীম থাকা অর্থাৎ শরীয়তের বিধানমতে সফরে না থাকা
- হায়িস ও নিফাস অবস্থায় না থাকা।

যাদের উপর রোযা ফরয নয় অর্থাৎ যাদের উপর থেকে রোযার ফরয বিধান তুলে নেয়া হয়েছে এবং এর কাযাও আদায় করতে হবে না, তারা হচ্ছে:

- কাফের বা অমুসলিম
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা
- পাগল ব্যক্তি; তবে পাগলামী ভাল হয়ে গেলে রোজা পালন করতে হবে।
- অতিশয় বৃদ্ধ যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না।

**রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ:**

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ প্রধানত দু'ধরনেরঃ ১. যে সব কারণে শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব হয়। ২. যে সব কারেণে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

**১। যে সব কারণে শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব হয়:** এর মধ্যে রয়েছে ঐ সকল কারণ যার জন্য রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় বটে তবে পরবর্তীতে প্রতিটি রোযার জন্য একটি করে রোযা কাযা পালন করতে হয়। রোযাভঙ্গের এ প্রকারের কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- জোরপূর্বক কেউ কিছু খাইয়ে দিলে।
- সাবধানতা সত্ত্বেও বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ কিছু খেয়ে ফেললে।
- মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে বা মলদ্বার দিয়ে ঔষধ ঢুকালে।

- অনিচ্ছাকৃত বমি মুখ ভরে হলে পূনঃ তা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পেটে ঢুকানো হয় অথবা যদি ইচ্ছাকৃত বমি করা হয়।
- দাঁতের ভিতরে আটকে থাকা খাবার খেয়ে ফেললে তা যদি বুট পরিমান বা তার চেয়ে বেশী হয়।
- গোসল বা ওজুর সময়ে গলার ভিতরে পানি চলে গেলে।
- কানের ভিতর তেলের ফোঁটা ঢাললে।
- কামভাবের সাথে স্ত্রী বা অন্যকোন মহিলাকে চুম্বন অথবা স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে।
- সুবহে সাদিক না হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাসের উপর কেউ সাহরী খেল অথচ তখন সুবহ সাদিক হয়ে গেছে, অথবা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাসের উপর ইফতার করল কিন্তু আসলে তখন সূর্য অস্ত যায়নি, এ অবস্থায় ঐ লোকের উপর কাযা ওয়জিব হবে।

**২। যে সব কারেণে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়:** যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রোযা ভঙ্গের জন্য কাফফারা দিতে হয় তা হচ্ছে স্বেচ্ছায় রমযানের রোযা ভঙ্গ করা বা রোযা আদায় না করা। এখানে রোযা ভঙ্গের বিষয়টি ব্যাক্তির সম্পূর্ণ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এ বিবেচনায় রোযাভঙ্গের  কারণগুলি নিম্নরূপ:

- রোযাদার ব্যাক্তি ইচ্ছাপূর্বক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলে বা ধুমপান করলে রোযা ভঙ্গ হয় এবং এর জন্য কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়।
- যদি কেউ রোযা অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক ঔষধ গ্রহণ করে তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে এবং তার ওপর কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়।
- যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রীসহবাস করে তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে। একইভাবে হস্তমৌথুন বা অন্য যে কোন প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত করা হলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং তার ওপর কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়।
- সুর্য অস্ত হয় নাই জেনেও ইফতার করে ফেললে তার উপর কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

**রোযার কাফফারা, কাযা ও ফিদিয়া:**

রোযা ভঙ্গের বিধানের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি বিষয় হচ্ছে রোযার কাফফারা, কাযা ও ফিদিয়া। **কাফফারা** বলতে বোঝায় প্রায়শ্চিত্ত করা বা ক্ষতিপূরণ করা। রমযানের রোযা ইচ্ছপূর্বক ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়। রমযানের রোযা ভঙ্গের কাফফারা হলো একাধারে দু'মাস রোযা রাখা। কেউ যদি রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে তবে এক রমযানের জন্য কাফফারা একটি অর্থাৎ একাধারে ষাটটি রোযা। কেউ যদি কাফফারা আদায়ের পূর্বে আর একটি রোযা ভঙ্গ করে তবুও তার উপর একটি মাত্র কাফফারা ওয়াজিব। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কাফফারার রোযা

একটানা পরপর আদায় করতে হবে। কোন কারণে দু'একটি রোযা ছুটে গেলে পুনরায় নতুন করে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। কেউ রোযা রাখতে অক্ষম হলে ষাটজন মিসকীনকে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পেট ভরে খাবার দিবে অথবা ষাটজন ফকিরকে সাদাকায়ে ফিতর দিয়ে দিবে। **কাযা** বলতে বুঝায় ভেঙ্গে ফেলা একটি ফরয রোজার পরিবর্তে পরবর্তী কোন সময়ে একটি রোযা পালন করা। শর'ই ওযরের কারণে যদি কেউ রমযানের রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য হয়, তাহলে তার ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হয়। **ফিদিয়া** অর্থ বিনিময়। রোযা রাখা দুঃসাধ্য হলে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে দরিদ্রকে অন্ন বা অর্থ দান করার নাম ফিদিয়া। শরীয়ত মোতাবেক ওযরের কারণে রোযা রাখতে সামর্থহীন ব্যক্তির ফিদিয়া প্রদান করা জায়েয রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি রোযার জন্য একটি করে ফিদিয়া দিতে হবে। প্রতিটি রোযার ফিদিয়া হলো একটি সাদাকাতুল ফিতর বা এর সমমূল্যের অর্থ গরীব বা মিসকীনকে দান করা অথবা একজন ফকির বা গরীবকে দু'বেলা পেট পুরে খাওয়ানো। যে সকল শর'ই ওযরের কারণে ফিদিয়া দেওয়া জায়েয রয়েছে তা নিম্নরূপ

- **অসুস্থতা:** গুরুতর অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যার সুস্থতার সম্ভাবনা নেই অথবা রোযা রাখলে যদি জীবন হানির আশংকা থাকে, তাহলে তারা ফিদিয়া আদায় করবে।
- **বার্ধক্য জনিত অবস্থা:** অতিশয় বৃদ্ধ এবং বার্ধক্যের কারণে দুর্বল ব্যক্তি যাদের পক্ষে রোযা আদায় করার সামর্থ্য নেই তারা ফিদিয়া দিয়ে দিবে।

**যে সকল কারণে রোযা ভঙ্গ করার বিধান রয়েছে:**

ইসলামে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের ন্যায় রোযার ক্ষেত্রেও কিছু অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি শরীয়ত সম্মত বৈধ কোন কারণে রমযান মাসের রোযা রাখতে সক্ষম না হন তবে তার জন্য শর্ত সাপেক্ষে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। শর্তানুসারে তাকে রমযানের পরে সুবিধামত সময়ে ভাংতি রোযাগুলির কাযা আদায় করে দিতে হবে। যে অবস্থায় এ সুযোগ গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে তা নিম্নরূপ:

- সফরকালীন সময়। মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখার কষ্ট না হলে এ অবস্থায়ও রোযা রাখা উত্তম।
- অসুস্থতার সময় যদি শারীরিক গুরুতর ক্ষতি বা মৃত্যুর আশংকা থাকে।
- হায়েজ-নেফাসকালীন সময়।
- গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালীন সময় যদি রোযার কারণে গর্ভবতীর নিজের অথবা গর্ভের ক্ষতি এবং দুগ্ধপানকারী মহিলা নিজের ও সন্তানের জীবনের ক্ষতির আশংকা করে।

**যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়না:**

এমন অনেক কারণ রয়েছে যেখানে আপাতঃ দৃষ্টিতে রোযা ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে হলেও আদতে শরীয়তের বিধান অনুসারে তা রোযা ভঙ্গের কারণ হিসেবে বিবেচিত নয়। এ কারণগুলি নিম্নরূপ:

www.waytojannah.com

- রোযার কথা ভুলে গিয়ে রোযাদার ব্যাক্তি যদি পানাহার করে বা সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- দাঁতের ফাকে বুটের চেয়ে ছোট কিছু থাকলে তা গিলে ফেললেও রোযা ভঙ্গ হয় না।
- মুখের থুথু গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- মশা-মাছি ইত্যাদি গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- ধুলোবালি এবং ধোঁয়া গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- চোখে ঔষধের ফোঁটা দিলে তার স্বাদ গলায় গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- স্ত্রীকে স্পর্শ করা ও চুম্বন করার ফলে বীর্য নির্গত না হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- পানিতে ডুব দেওয়ার ফলে কানে পানি প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

**রোযার তাৎপর্য:**

মহান আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য যে সকল বিধান দিয়েছেন সেগুলি নিছক আখিরাতের জীবনের জন্য নয় বরং প্রত্যেকটি নির্দেশের পেছনে নিহিত রয়েছে পার্থিব জীবনেরও বহুমুখী কল্যাণ। সে কল্যাণার্জনের জন্য প্রত্যেকেরই শর'ই বিধানগুলি যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার একনিষ্ঠ আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে বান্দা খুঁজে পেতে পারে তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত এবং একই সাথে দুনিয়াবী বিভিন্ন উপকার ও কল্যাণ হাসিল হতে পারে। অন্যান্য ইবাদতের মত রোযার মধ্যেও নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাত- এ উভয় জীবনের প্রভূত কল্যাণ। এ হিসেবে রমযানের রোযা একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রোযার মধ্যে যে জীবন দর্শন নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল

- **আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা:** রমযানের রোযা পালনের মধ্যে দিয়ে মানুষ আল্লাহ্‌ রাববুল আ'লামীনের হুকুম পালন ও বান্দার প্রতি তাঁর দেয়া কর্তব্য পালনের প্রমাণ দিয়ে থাকে। এই ফরয কাজটি আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা প্রকাশ পায় এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় বান্দা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে রাজি হয়ে যায়। রোযা পালনের মধ্যে দিয়ে মানুষ পরকালীন জিন্দেগীর পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা হাসিলের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে নেয়। পক্ষান্তরে রোযা পালনে অনীহা প্রকাশকারী ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করে পরকালীন অকল্যাণ এবং শাস্তির রাস্তা তৈরি করে নেয়।
- **তাকওয়া বা পরহেজগারী:** সিয়াম সাধনা আল্লাহভীতি প্রদর্শনের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। কেননা রোযার প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকওয়া অর্জন অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহর ভীতি জাগ্রত করা বা অর্জন করা। আর এই তাকওয়া-ই সকল গুণাহের কাজ থেকে রোযাদারদের অন্তরসমূহকে পাহাড়া দিয়ে রাখে। কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই মানুষ গোপণভাবেও খাদ্য ও পানীয় গ্রহন করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে রোযা মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত সকল বিধান পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং রোযাদার আল্লাহর

নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজগুলি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে মানুষ পরহেজগারী অর্জন করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারে।

-  **প্রশিক্ষণ:** রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ সারা বছরের জীবন পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। একজন রোযাদার স্বভাবতই সকল অন্যায়-অপরাধ কুকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয় রোযার মর্যাদার কারণে। কণ্টকাকীর্ণ জীবনের সকল প্রতিকূল অবস্থাকে পাড়ি দিয়ে মানুষকে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। সে দুর্গম বন্ধুর পথকে অতিক্রম করার জন্য রোযা একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ।
-  **আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি:** রোযার দ্বারা প্রবৃত্তির উপর আকলের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে মানুষের পাশবিক শক্তি অবদমিত হয় এবং রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। রোযা মানুষকে সংযমী করে তোলে। সারাদিনের পানাহার এবং যৌনাচার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানুষ সহিষ্ণু হয়ে ওঠে। রোযার মাধ্যমে মানুষ প্রবল ও অন্ধ আবেগ সৃষ্টিকারী হাজারো প্রকারের দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জন করে। এর ফলে মানুষ তার দৈহিক প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং জৈবিক চাহিদা সহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা রঙিন দুনিয়ার সকল অবৈধ আকর্ষণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় লিপ্সা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। রোযা মানুষের অন্তরে অপরাধবোধকে জাগ্রত করে। তাই রোযার কারণেই মানুষ সকল কুকর্ম ও অপরাধ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে এবং সকল পঙ্কিলতা ও জঞ্জাল সাফ করে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন বা পরিশুদ্ধ করে নিতে পারে। আগুনে পোড়ালে যেমন সোনা খাঁটি হয় তেমনি রোযা অন্তরের আবর্জনা ও শয়তানী নফসকে পুড়িয়ে মানুষকে খাঁটি বানিয়ে দেয়।
-  **বিনয় ও নম্রতা:** রোযার দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মনে আল্লাহর মহানত্বের ধারণা জাগ্রত হয়।
-  **মহব্বত:** রোযা পালন করা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি গভীর মহব্বতের অন্যতম নিদর্শন। কেননা রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতে দেওয়ানা হয়ে কেবলমাত্র তার নির্দেশ পালনের স্বার্থে পানাহার সহ স্ত্রী সহবাসের মত হালাল কাজগুলিও ছেড়ে দিতে এতটুকু সংকোচ বোধ করে না। মহান রবের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের এ এক মহান দৃষ্টান্ত ।
-  **শারীরিক সুস্থতা:** রোযা যে কেবল মানুষের আত্মার বিকাশ ঘটায় তাই নয়, রোযা মানুষের শারীরিক সুস্থতা প্রদানের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। পরিমিত খাদ্য গ্রহণ, কিছুদিনের উপবাস ইত্যাদি শরীরের অতিরিক্ত মেদ-চর্বি দূর করে হৃদরোগ সহ বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত রাখতে সহায়তা প্রদান করে।

**সিয়াম সাধনা বা রোযার শিক্ষা:**

সিয়াম সাধনা বা রোযা পালনের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য বহুমাত্রিক শিক্ষণীয় বিষয়। রোযা মানুষকে তাকওয়া অর্জনের সহায়তা প্রদান করে এবং সরলপথে প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। রোযা মুমিনের জন্য বয়ে আনে জাগতিক এবং পরকালীন কল্যাণার্জনের জন্য এক অপূর্ব সুযোগ। সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে একজন মুমিন জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে সকল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

o **সংযমের শিক্ষা:** সিয়াম সাধনা মানব জীবনে শিক্ষা দিয়ে যায় সংযমের। স্বীয় রিপু বা কুপ্রবৃত্তিকে দমন করার এক অপূর্ব সুযোগ রোযা পালনের মধ্য দিয়ে হাসিল করা যায়। লোভনীয় সব খাবার সামগ্রী ও পানীয় তার সামনে থাকা সত্ত্বেও রোযা অবস্থায় সে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। যৌন চাহিদা পূরণ করার সকল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কি চমৎকার তার সংযম শক্তি! এটা কেবলমাত্র সম্ভব হয় তার তাকওয়া বা আল্লাহভীতির কারণে। এখান থেকে সে সকল অনাচার ও পাপাচার থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রনের শিক্ষা নিতে পারে। এতে করে তার পরধনের ওপর লিপ্সা কমে যায় এবং তার সামনে রাশি রাশি সম্পদ থাকলেও সে তা আত্মসাৎ করার চিন্তা করে না, রোযা তাকে এ শিক্ষা দিয়েছে। প্রতি বছর রমযান আসে আর সিয়াম সাধনা মানুষকে বছরের বাকী এগার মাস সংযমের সাথে সঠিকভাবে দ্বীনের উপর পথ চলার প্রশিক্ষণ দিয়ে যায়।

o **আল্লাহর গোলামী করার শিক্ষা:** রোযা পালনকারী এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করে পানাহার বর্জন করেছে। গোপণেও তার হৃদয়ে থাকে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তিতার প্রতিশ্রুতি। তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালনের এক সবক নিল সে কখনো আল্লাহর গোলামী ছাড়া অন্য কারো গোলামী করতে পারে না। এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে আল্লাহর গোলামী করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

o **হালাল গ্রহণের শিক্ষা:** সওমের আর একটি শিক্ষা হলো সর্বাবস্থায় হালাল গ্রহণ করা এবং হারাম বর্জন করা। যেহেতু রোযা পালনকারী আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর নির্দেশ পালনের খাতিরে দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগের মত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করতে তৈরী হয়ে গেছেন, তিনি কিভাবে অন্য সময় হারাম বস্তু গ্রহণ করতে পারেন? একজন সত্যিকারের রোজা পালনকারী হয়ে থাকলে তার পক্ষে কখনো তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

o **সহমর্মিতার শিক্ষা:** সাওমের আরও একটি শিক্ষা হলো গরীব ও মিসকিনের দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করা। রোযার বরকতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা যে ব্যক্তি কোন দিনও ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকেনি সে কখনো ক্ষুধার্ত মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারেনা। যেহেতু রোজাদারকে পানাহার পরিত্যাগ করতে হয়, সেহেতু

রোযা পালনের মধ্য দিয়ে সে ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারে গরীব-দুঃখী মানুষের ক্ষুধার জ্বালা। তাই যাদের জীবনে সময়মত দু'মুঠো অন্ন জোটেনা তাদের সম্পর্কে একটি সুন্দর সহানুভুতি ও সহমর্মিতার মনোভাব তৈরী হয় সিয়াম সাধনার মাধ্যমে। এতে তাদের দুঃখ-দুর্দশার ভাগীদার হওয়া যায়।

o **সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা:** সিয়ামের মাধ্যমে রুটিন মাফিক আত্মগঠনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সাওম পালনকারী নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার বন্ধ করেন এবং সময়মত ইফতার করেন। আবার রাতে একই সময়ে নির্দিষ্ট ইবাদতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যান। এ যেন একটি সুশৃঙ্খল ও কর্তব্যপরায়ণ সমাজবদ্ধ জীবনের প্রকৃষ্ট নমুনা।

মোটকথা সিয়াম সাধনা এমন এক ইবাদত যা মানুষকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার এবং সমাজে তা প্রতিষ্ঠা করার উপযোগী মানুষ তৈরী করে। এতে আল্লাহর রেজাবন্দী হাসিল হয়। অতঃপর এমন মনোভাব সৃষ্টি হলেই সিয়াম সাধনা সার্থক হবে।

**রোযার ফজিলত:**

রোযার ফজিলত অপরিসীম। রোযা পালনের মধ্যে দিয়ে একজন মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য হাসিলের দুর্লভ সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে রোযা শরীর ও মনের ওপর ভারীবোঝা ও কষ্টসাধ্য মনে হলেও এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বহু নি'য়ামত এবং রহমত প্রাপ্তির এক অপার সুযোগ। যে মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের বহিঃপ্রকাশ ঘটে রোযার মাধ্যমে। রোযার মাধ্যমে আল্লাহর অপার করুণা লাভে সমর্থ হয় তাঁর মুমিন বান্দারা।

রোযার কাঙ্খিত ফলাফল লাভ করার জন্য অন্যতম শর্ত হল, হালাল বস্তু গ্রহণ করা। এ ছাড়াও রোযার ফায়দা হাসিল করার জন্য শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ এবং সকল পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং সেই সাথে নেক আমলের প্রতিও বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। তাই রোযাদার ব্যক্তিকে ইবাদত, তেলাওয়াত, যিকর ও তাসবীহে মগ্ন থেকে সহানুভুতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতার মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণ ও কামিয়াবীর পথ প্রশস্ত করে নেওয়ার প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকার তাকীদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রোযাদার বান্দাদেরকে পরকালে রোযার উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"আল্লাহ্ বলেন, 'প্রতিটি সৎকাজের প্রতিদান হলো দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত। কিন্তু**

রোযা আমার জন্যই এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। কারণ সে আমার উদ্দেশ্যে তার যৌনাচার এবং পানাহার পরিত্যাগ করে'।"

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং-২৫৭৬

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আর একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

"রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে- একটি হল যখন সে ইফতার করবে তখন সে খুশী হয় এবং অপরটি হল যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে খুশী হবে।"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং- ৭১৪

আর রোযাদারদের দোয়া সবথেকে তাড়াতাড়ি কবুল হয়। একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তিন ব্যক্তির দোয়া রদ হয়না, ন্যায়পরায়ন বাদশাহ, রোযাদার-যতক্ষণ না সে ইফতার করে এবং মজলুম ব্যক্তির দোয়া।"

হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ, নং- ১৭৫২

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর বরাতে তাফসীর গ্রন্থে একটি হাদিস এসেছে। তিনি বলেন,

"আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে- এই সময় তার দোয়া কবুল হয়।"

তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-১১৯

রোযা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। একটি হাদিসে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"রোযা ঢাল স্বরূপ (দোযখ থেকে বাঁচায়)। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট।"

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং- ১৭৭৩

রোযাদার 'রাইয়্যান' নামক দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করবে। হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে আর একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"বেহেশতের একটি ফটকের নাম হল রাইয়্যান। পরকালে সেই ফটক দ্বারা একমাত্র ঐ মুমিনগণ প্রবেশ করতে পারবে, যারা দুনিয়ায় রোযার অভ্যস্ত ও অনুরাগী ছিল। রোযাদারগণ প্রবেশ করার পর তা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং আর কেহই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।"**

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং- ১৭৭৫

রোযার কারণে রমযান মাসেরও মর্যাদা এবং ফজিলত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ মাসের মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"যখন রমযান মাস আরম্ভ হয় তখন উর্দ্ধ জগতের তথা রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় ও জাহান্নামের সমুদয় দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করে দেওয়া হয়।"**

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং- ১৭৭৮

রমযান মাসে রোযার সওয়াবতো রয়েছেই, এ ছাড়াও এ মাসে ইবাদত-বন্দেগী এবং প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব অন্য মাসের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"আল্লাহ্ তা'আলা রমযানের সিয়াম পালন করাকে ফরয এবং রাতে নামায পড়াকে নফল করেছেন। যে ব্যক্তি সে মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করল, সে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করার সমান সওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি সে মাসে একটি ফরয কাজ আদায় করল, সে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান সওয়াব লাভ করবে।"**

হাদিস, মেশকাত শরীফ, নং- ১৮৬৮

রমযান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাত্রিতে রাত জেগে ইবাদত করার ফজিলত অনেক। এ রাত্রির নাম 'লাইলাতুল কদর'। এ রাত্রিটি পবিত্র কোরআনের ভাষায় হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এবং মর্যাদাপূর্ন। এ রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার গুণাহ সমূহ মাফ করে থাকেন। একটি হাদিসে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে তার পিছনের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করা হবে।"**

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং- ১৭৮০

রোযা এবং রোযার মাসের এত বড় ফজিলত থাকা সত্বেও কেউ যদি অবহেলায় তা নষ্ট করে তবে তার মত হতভাগ্য আর কে হতে পারে? তাই আসুন আমরা রোযা নষ্ট না করে রোজার পুরোপুরি ফজিলত হাসিল করার জন্য রোযাব্রত পালনে সচেষ্ট হই।

**রোযার হক:**

রোযার ফজিলত প্রাপ্তির জন্য একজন মুমিনকে রোযার পূর্ণ হক আদায় করতে হয়। রোযার হক কি এবং তা কিভাবে আদায় করতে হয়? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের সকলের জানা থাকা দরকার। সারাদিন শুধু উপবাস থাকলেই কি সে হক আদায় হয়ে যাবে? এর উত্তর হলো: না, তাতে রোযার হক আদায় হবে না। কেননা রোযার মর্মার্থ হচ্ছে আত্মসংযম। সুতরাং রুটিনমাফিক সুবহে-সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকা, তারাবিহ সালাত পড়া, ইফতার আর সেহরী খাওয়াতেই রোযা পালন সম্পন্ন হয়না, এর জন্য রোযাদার ব্যক্তির নফস এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সংযম সাধনা করা বাঞ্ছণীয়। মানুষের দেহ ও মনকে সংযমের শাসনে রেখে ইসলামী শরিয়ত বা জীবন বিধানের পরিপন্থী যাবতীয় অসামাজিক ও অমানবিক কার্যাবলী পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাকওয়া অর্জনের কঠোর সিয়াম সাধনাই মাহে রমযানের মূলকথা। এভাবে দেহ ও মনের সংযম এবং ইখলাসের সাথে রোযাব্রত পালন করতে পারলেই রোযার পূর্ণ হক আদায় করা সম্ভব। প্রকৃত সিয়াম সাধনা হলো নিজের নফস, রিপু ও লালিত কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একজন প্রকৃত রোজাদারকে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলির অবৈধ কর্ম এবং অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর তাই রোযাদারের চোখকে খারাপ জিনিস দেখা থেকে বিরত রাখতে হবে। কুকথা শ্রবন করা থেকে কানকে বিরত রাখতে হবে। পা-কে অসৎ কাজে অগ্রসর হতে বাঁধা দিতে হবে। অনর্থক কথা-বার্তা, মিথ্যাচার, পরনিন্দা, গীবত, কটুবাক্য ব্যবহার প্রভৃতি গর্হিত কাজ থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে। হাতকে চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ-দুর্নীতি, ছিনতাই রাহাজানি, খুন-খারাবি, অপহরণ, মজুতদারী, চোরাকারবারি, ভেজাল মিশ্রন, ওজনে কম দেওয়া, হারাম খাদ্য গ্রহণ সহ সকল অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখতে হবে। তাছাড়াও যুলুম, অত্যাচার, প্রতারণা, শঠতা সহ যাবতীয় গুণাহের কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। মনকে সকল অবৈধ চাহিদা, কামনা-বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসামুক্ত রেখে মৃত্যু ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের কথা সর্বদা স্মরণে রেখে তাকওয়া অর্জনে উন্মুখ হতে হবে। এভাবে মাহে রমযানের কঠোর সংযম সাধনা ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে বছরের বাকী এগারটি মাস। তাহলেই সিয়াম পালন ও সংযম সাধনা পূর্ণাঙ্গ হবে আর তাতেই রোযার পুরস্কার নিশ্চিত হবে।

অন্যথায় রোযার কোন ফজিলত অর্জিত হবে না। একজন রোযাদার উল্লেখিত যে কোন অপরাধের সাথে যুক্ত থাকলে তার রোযা ভঙ্গ হবে না বটে, তবে তার রোযার মর্যদা ক্ষুণ্ন হবে নিশ্চিত। আল্লাহর কাছে এ রোযার কোন মূল্য নেই এবং এর জন্য তাঁর কাছে কোন প্রতিদানও পাওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”**

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং- ১৭৮২

এ হাদিস দ্বারা বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার যে, রোযা রেখে মিথ্যাচার এবং খারাপ কাজ পরিত্যাগ করতে না পারলে সে উপবাস অর্থহীন এবং এর কোন ফজিলতও আল্লাহর কাছে পাওয়ার আশা করা যায় না। সুতরাং রোযার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা’আলার সকল হুকুম আহকাম পুরোপুরিভাবে মেনে চলা জরুরী। সেজন্য যেমন হালাল খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং ফরয ইবাদতসমূহ পালন করতে হবে, তেমনি আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল কর্ম থেকেও নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

**রমযানের রোযা ভঙ্গ করার গুণাহ্:**

রোযা একটি ফরয ইবাদত, তাই বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা কবীরা গুণাহ্। রোযা একজন মুমিনের আল্লাহ্ ভীতি প্রদর্শনের এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কেননা আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া রোযাদারের অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের সুযোগ এখানে অনুপস্থিত। বান্দার রোযা পালনের ইবাদতটি আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়, পক্ষান্তরে বিনা কারণে রোযা ভঙ্গ করা তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ- যার পরিণাম অতি সহজেই অনুমেয়।

রোযা ফরয হওয়া উপযুক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং কেউ যদি এর ফরযিয়াত অস্বীকার করে তবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। কেউ রোযার প্রতি উপহাস বা বিদ্রুপমূলক আচরণ করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি এর ফরযিয়াত স্বীকার করা সত্বেও বিনা ওযরে রোযা না রাখে তবে সে গুণাহগার হবে। বিনা ওযরে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করা কঠিন অপরাধ এবং সারা জীবন ধরেও এর মাশুল দেওয়া সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আর একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

"যে ব্যক্তি কোন ওযর ছাড়া রমযান মাসের একটি রোযা ভাঙ্গে, তার সারা জীবনের রোযা দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ হবে না।"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং- ৬৭১

মাহে রমযানে নেক আমলের ফজিলত যেমন বেশী, তেমনি এ মাসে গুণাহ করলে এর শাস্তিও অনেক বেশী। বিশেষ করে ইচ্ছাকৃত রোযা না রাখলে কঠিন শাস্তির হুকুম রয়েছে। সে ব্যক্তি ইহকালে তা না পেলেও পরকালে তার শাস্তি হবে ভয়াবহ। সুতরাং কারো পক্ষেই শর'ই ওযর ছাড়া মাহে রমযানের একটি রোযাও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

## যাকাত আদায় না করা
## (WithHolding the Zakah)

যাকাত আরবী শব্দ যার অর্থ পবিত্রতা, প্রবৃদ্ধি, আধিক্য ইত্যাদি। তবে যাকাত শব্দটি এর আভিধানিক অর্থের তুলনায় অনেক বেশী প্রশস্ত তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত বলতে ধনীদের ধন-মালে আল্লাহর নির্ধারিত অবশ্য দেয় অংশকে বুঝায় যা পাওয়ার যোগ্য অধিকারী লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করতে হয়। যেহেতু সম্পদের একটি নির্ধারিত অংশ আদায় করে মুসলিম নিজের আত্মা ও মালকে পবিত্র করে তাই ইসলামী পরিভাষায় তাকে যাকাত বলা হয়।

ইসলামে সালাতের পরেই যাকাতের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম একটি স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা’বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেওয়া (৪) হজ্জ আদায় করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।”**

হাদিস, সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৭

**যাকাতের বিধান:**

যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। দ্বীন-ইসলামে যাকাত ফরয করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে।

**“আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-১১০

এভাবে পবিত্র কোরআনের বহু যায়গায় সালাতের হুকুমের সাথে একত্রিত করে যাকাতের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। অত্র আয়াতের মাধ্যমে যাকাত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয হয়ে গেছে। সালাত প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে যাকাতের বিধান মান্য করা এবং যথাযথভাবে তা আদায় করা প্রত্যেক মুমিন বান্দার ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। কেননা পবিত্র কোরআনে অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে,

**"সে সমস্ত লোক যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই হল সত্যিকারের ঈমানদার।"**

আল কোরআন, সুরা আনফাল, আয়াত-৩,৪

এখানে আল্লাহ্ ঈমানদারের স্বরূপ উৎঘাটন করার জন্য সালাতের সাথে যাকাতকেও ঈমানের একটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে যে, সালাত প্রতিষ্ঠাকারী এবং যাকাত আদায়কারীরা সত্যিকারের ঈমানদার। সুতরাং ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হওয়ার জন্য সালাত এবং যাকাতের বিধানের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা এবং তা যথাযথ পালন করা একজন মুমিনের অবশ্য কর্তব্য এবং এর কোনটি বিধান অমান্য করার কোন সুযোগ নেই।

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর বান্দাদের প্রতি যাকাত প্রদান করার জন্য সাধারণ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত সুনির্ধারিত বিধি-বিধান এবং আনুসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ের দিক-নির্দেশনা জারী করা হয়েছে কোরআনের অন্যান্য আয়াতে। তবে কোরআনে শুধু যাকাতের মৌলিক নীতিমালা বিবৃত হয়েছে, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের মাধ্যমে অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত মূলনীতির বিস্তারিত এবং বাস্তবরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে সুন্নাতে। উপরন্তু যাকাতের বাস্তব এবং ব্যবহারিক অনেক দিকও মুসলিম উম্মাহর ইজমার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

**যাদের উপর যাকাত ফরয:**

যাকাত ফরয করা হয়েছে ধন-সম্পদের উপর। সাধারণভাবে সকল মানুষ এ বিধানের আওতাভুক্ত বলে প্রতীয়মান হলেও যাকাত মূলত মানবজাতির জন্য শর্তাধীনে পালিত একটি ফরয ইবাদত। ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে যাকাত কেবলমাত্র মুসলমানের উপর ধার্য করা হয়েছে, যার সুনির্দিষ্ট নিসাব পরিমান সম্পদের মালিকানা রয়েছে। এখান থেকে তিনটি শর্ত বোঝা যায়:

- **মুসলিম হওয়া**
- **নিসাব পরিমান সম্পদ থাকা এবং**
- **মালিকানা নিশ্চিত হওয়া**

এ তিনটি বিষয়ের সবগুলি অথবা কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে তার উপর যাকাত ফরয নয় বলে বিবেচিত হবে। এ পর্যায়ে নিসাব, যাকাত দেওয়ার যোগ্য ধন-সম্পদ, যাকাতের পরিমান, যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল।

নিসাব:

ইসলাম ক্রমবর্ধনশীল ধন-মালের যে কোন পরিমানের উপরই যাকাত ফরয করেনি, বরং যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমানের সম্পদ হওয়া অপরিহার্য বলে শর্ত রেখেছে। যে পরিমান সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়, ফিকাহর পরিভাষায় তাকেই 'নিসাব' বলে। সম্পদের প্রকারভেদ বা বিভিন্নতার কারণে নিসাবের পরিমানেও বিভিন্নতা রয়েছে। তবে নিসাব পরিমান সম্পদ যার কাছে থাকে তাকে 'সাহেবে নিসাব' বা নিসাবের মালিক বলা হয়। প্রত্যেক নিসাবের মালিকের উপর নির্দিষ্ট পরিমানের যাকাত আদায় করা ফরয। ফিকাহবিদগণ কোনো মালের নিসাব নির্ধারণের জন্য কয়েকটি শর্ত রেখেছেন,

- মালের বর্ধনশীলতা
- মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল
- মালিকানা থাকা
- এক বৎসর কাল পূর্ণ হওয়া

কাজেই যে সকল মাল বর্ধনশীল এবং যা মৌলিক প্রয়োজন পুরা করার পর উদ্বৃত্ত থাকে তার উপরই নিসাব প্রযোজ্য হবে। এভাবে নিসাব পুরো হয়ে পূর্ণ এক বৎসরকাল উক্ত মাল তার মালিকাধীনে থাকার শর্তও রয়েছে। শর্তপূরণ সাপেক্ষে এ সমস্ত ধন-মালের উপর প্রতিবছর একবার করে যাকাত দেওয়া ফরয।

যাকাতযোগ্য  ধন-সম্পদের বিবরণ:

যে সব ধন-সম্পদে যাকাত ফরয হয়, সে সম্পর্কে কোরআন নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে কোরআনে যা সাধারণভাবে বলা হয়েছে বা অস্পষ্ট রয়েছে, সুন্নাত তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে এবং তার বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্দেশ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর ইজমা দ্বারাও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। সাধারণতঃ ক্রমবর্ধমান ধন-সম্পদের উপরে যাকাত ধার্য্য করা হয়েছে। ইসলামী শরি'য়া অনুযায়ী যে সকল ধন-সম্পদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে-

- স্বর্ণ ও রৌপ্য
- নগদ অর্থ
- পশু সম্পদ
- কৃষি সম্পদ
- খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদ
- ব্যবসা সম্পদ
- শেয়ার ও বণ্ড
- পেশাভিত্তিক উপার্জন ইত্যাদি।

সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এ সকল ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা জরুরী। এ সবগুলি বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনার সুযোগ আমাদের নেই, তবে আমাদের সমাজের বাস্তবতায় উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হল:

## স্বর্ণ-রৌপ্য এবং নগদ অর্থ:

**স্বর্ণ ও রৌপ্য:** স্বর্ণ ও রৌপ্য দু'টি উত্তম খনিজ পদার্থ। প্রাচীনকাল থেকেই বহু জাতি এ দু'টি ধাতুর দ্বারা মুদ্রা বানিয়েছে এবং দ্রব্যমূল্যের মান হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই এ দু'টি বস্তু নগদ সম্পদ হিসেবেও বিবেচিত হয়ে এসেছে। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় আরব সমাজ এ দু'টি মুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সমাধা করত। স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত হত 'দীনার' আর রৌপ্য দিয়ে নির্মিত হত 'দিরহাম'। সে সময়ে নগদ সম্পদের পরিমাপক ছিল এ দু'টি মুদ্রা। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দু'টি মুদ্রার উপর নগদ সম্পদের নিসাব নির্ধারণ করেছেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে যথাক্রমে ২০ দীনার এবং ২০০ দিরহাম। এ বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,

**"যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দু'শত দিরহাম (রৌপ্য) থাকে, তবে বছর শেষে এর জন্য পাঁচ দিরহাম (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত দিতে হবে। বিশ দীনারের কম পরিমান স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। এরপর যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমান স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত থাকে তার জন্য অর্ধ দীনার (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত প্রদান করতে হবে। আর যদি এর পরিমান আরও বেশী হয়, তবে উক্ত হিসেব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।"**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং- ১৫৭৩

কিন্তু কালের স্রোতে এ দু'টি বস্তুর মুদ্রা হিসেবে প্রচলন কমে গেছে এবং বর্তমান সময়ে ধাতব মুদ্রার প্রচলন নেই বললেই চলে। তবে মুদ্রা হিসেবে প্রচলন না থাকলেও স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যমান হ্রাস পায়নি বরং বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বর্ধনশীল সম্পদ রূপেই বহাল রয়েছে। অলংকার হিসেবে এবং গচ্ছিত সম্পদরূপে স্বর্নের বহুল প্রচলন এখনও রয়েছে, তবে রৌপ্যের প্রচলন অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। শর'য়ী বিশেষজ্ঞগণ গচ্ছিত সম্পদরূপে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাতের হুকুম বহাল রেখেছেন। তাই নিসাব পূর্ণ হলেই বছর শেষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। **স্বর্ণের নিসাব** হচ্ছে ৮৫ গ্রাম বা সাড়ে সাত তোলা এবং **রৌপ্যের নিসাব** হচ্ছে ৫৯৫ গ্রাম বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা। নিসাব পূর্ণ হলেই বছর শেষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত আলাদাভাবে আদায় করে দিতে হবে।

**ব্যাহারযোগ্য অলংকারের যাকাত:** ব্যাহারযোগ্য অলংকারের যাকাত ফরয কিনা, তা নিয়ে সাহাবা, ফুকাহা ও ওলামাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বলছেন যে, ব্যবহৃত অলংকার স্বর্ণ বা

রৌপ্যের নিসাব পূর্ণ হলে এর উপরে যাকাত প্রযোজ্য হবে। আর অন্যদল বলছেন, ব্যবহৃত অলংকারের উপর কোন যাকাত নেই। উভয় পক্ষেরই তাদের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ও দলীল রয়েছে। তবে পূর্বসতর্কতামূলকভাবে নিসাব উর্দ্ধ অলংকারের যাকাত প্রদান করা হলে সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত এবং নিরাপদ থাকা যায় বিধায় এ আমলটি গ্রহণ করা যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত রয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, মহিলা যদি অবৈধ অলংকার ব্যবহার করে, যেমন সোনার ক্রুশ কিংবা কোন প্রাণীর আকারের অলংকার অথবা অস্বাভাবিক বেশী ওজনের অলংকার ব্যবহার করে অথবা অলংকার বানিয়ে ব্যবহার না করে সিন্দুকে বা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে অথবা কোন পুরুষ তার জন্য হারাম হওয়া সত্বেও সোনা ব্যবহার করে কিংবা অলংকার ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে তাতে অবশ্যই যাকাত আছে। আরও জ্ঞাতব্য যে, অলংকারের ব্যবসা করা হলে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

অধিক ওজনের ব্যবহৃত স্বর্নের অলংকারের উপর যাকাত আবশ্যক হওয়ার দলীল হিসেবে একটি হাদিস এখানে প্রণিধানযোগ্য। আমর ইবনে শু'আয়ব (রঃ) হতে বর্ণিত যে,

**"এক ইয়ামানী মহিলা এবং তার কন্যা রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- **এর কাছে আসলো। তার কন্যার হাতে স্বর্নের দু'টি পুরু কাঁকন ছিল। রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় করে থাক? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এ দু'টি কাঁকনের পরিবর্তে আগুনের দু'টি কাঁকন পড়াবেন? তখন সে দু'টি কাঁকনই খুলে রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-**কে দিয়ে দিল এবং বলল যে, এ দু'টিই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-**এর জন্য।"**

হাদিস, সুনান নাসাঈ, হাদিস নং- ২৪৮০

**নগদ অর্থ:** বর্তমানে আমাদের সমাজে সর্বক্ষেত্রে মূলতঃ কাগজী নোটের লেনদেন বহুল প্রচলিত। নগদ অর্থ বা সম্পদ বলতে সাধারণতঃ নগদ টাকা এবং ব্যাংকে জমানো টাকাকে বোঝান হয়ে থাকে। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে নগদ অর্থের মান নির্ধারিত হতো স্বর্ণ ও রৌপ্যের মাধ্যমে। তাই বর্তমান কালেও শর'ই বিশেষজ্ঞগণের অভিমত অনুযায়ী যাকাতের ক্ষেত্রে নগদ অর্থের নিসাব নির্ধারণের আদর্শ মানদণ্ড ধরা হয়েছে স্বর্ণ বা রৌপ্যকে। এ বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত ইজমার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার মূল্য পরিমান নগদ অর্থ কারো কাছে বর্তমান থাকলে সে নগদ সম্পদের নিসাবের মালিক হিসেবে বিবেচিত। তাই নগদ অর্থের নিসাব হচ্ছে স্বর্ণের হিসেবে ২০ দীনার বা ৮৫ গ্রাম যা আমাদের সমাজের প্রচলিত হিসেবে প্রায় সাড়ে সাত তোলার সমান, আর রৌপ্যের হিসেবে ২০০ দিরহাম বা ৫৯৫ গ্রাম বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা। তবে যাকাত দাতাকে নগদ সম্পদের যাকাত

দেওয়ার জন্য প্রথমেই স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার দর যাচাই করে সে অনুযায়ী নিসাব পরিমান স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার মূল্য নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং ঐ মূল্যই হবে নগদ সম্পদের নিসাব। এ দু'টি বস্তুর যে কোনটিকেই নিসাব হিসেব করার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে নিসাব পরিমান স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজার মূল্য এক নাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে যেটির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম সেটির উপর নিসাব নির্ধারণ করাই সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত বলে শর'ই বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের অভিমত। নিসাবের কম সম্পদে কোন যাকাত নেই। কিন্তু পরিবারের ভরণ-পোষণ তথা মৌল প্রযোজন মিটোনোর পরে কারো কাছে নিসাব পরিমান বা তার অতিরিক্ত অর্থ থাকলে এবং ঐ সম্পদ পুরো এক বৎসরকাল তার মালিকানায় থাকলে, সমুদয় সম্পদের উপর তাকে যাকাত দিতে হবে। নিসাব পূর্ণ হওয়ার পরে মোট অর্থ-সম্পদ হিসেব করে তার মধ্যে থেকে যাকাত পরিমান অর্থ বের করে নিতে হবে। শরিয়ত যাকাতের পরিমান নির্ধারণ করেছে মোট সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২.৫%। এ হিসেবে প্রাপ্ত যাকাতের সমুদয় অর্থই যাকাত খাতে ব্যয় করা বাধ্যতামূলক।

প্রকাশ থাকে যে, সোনা, রূপা ও টাকা এই তিনটি তিন শ্রেণীর মাল। এগুলি পৃথকভাবে নিসাব পরিমান হলে পৃথক পৃথকভাবে যাকাত লাগবে। একটি অপরটির সাথে মিলানো যাবেনা। অতএব কারো কাছে যদি ৭ ভরি সোনা, ৫০ ভরি রূপা ও ২৫০০০ টাকা থাকে তাহলে পৃথকভাবে কোনটিরই নিসাব পূর্ণ হয়নি। সে ক্ষেত্রে তার উপর যাকাত ফরয নয়। আবার যদি কোনটির নিসাব পূর্ণ হয় এবং অন্যটির নিসাব পূর্ণ হয় না, তাহলে যেটির নিসাব পূর্ণ হয়েছে শুধুমাত্র সেটির যাকাত দিতে হবে। যেমন কারো কাছে যদি ৭ ভরি সোনা, ৫০ ভরি রূপা ও নগদ ৫০০০০০ টাকা থাকে তাহলে টাকার নিসাব পূর্ণ হওয়ার কারণে শুধু টাকার যাকাত দিতে হবে। সোনা ও রূপার যাকাত থেকে সে অব্যহতি পাবে।

**ঋণের টাকার যাকাত:** ঋণে নেওয়া টাকা যদি নিসাব পরিমান হয় অথবা তা মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ হয় এবং বছর পূর্ণ হয় তাহলে ঋণ গ্রহীতাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে।
যদি ঋণ পরিশোধ করার পরে নিসাব বহাল না থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।

ঋণ পরিশোধ না করে যাকাত ফরয নয় মনে করা ঠিক নয়। সুতরাং ঋণ থাকলে আগে ঋণ পরিশোধ করে ফেলুন, তারপর যদি নিসাব পরিমান মাল থাকে তাহলে যাকাত দিন, নচেৎ নয়। আর ঋণ পরিশোধ না করলে এবং নিসাব পরিমান মাল সাড়া বছর জমা থাকলে আপনাকে যাকাত দিতে হবে।
ঋণ দেওয়া টাকা যদি নিসাব পরিমান হয় তাহলে আদায় হওয়া মাত্র সেই বছরের যাকাত আদায় করে দিতে হবে। এর পূর্বের বছরগুলোর যাকাত লাগবে না। অনুরূপভাবে পেনশনের টাকা একসাথে নিসাব পরিমান পেলে এক বছরের যাকাত সাথে সাথে আদায় করতে হবে (সূত্র: যাকাত ও খয়রাত, আবু সালমান আব্দুল হামিদ মাদানী)।

## কৃষি সম্পদ:

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই কৃষি নির্ভর। তাদের জীবন ও জীবিকার প্রধান উপকরণ কৃষি সম্পদ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কৃষি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ যমীনকে উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করেছেন এবং মানুষের রিযিক ও জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস বানিয়েছেন এই যমিনকে। বস্তুতঃ এ সবই মানুষের প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ। তাই মানুষকেও আল্লাহর নির্দেশ পালন করে এ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। এসব দিক বিবেচনা করে শরিয়তে কৃষি সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে। প্রত্যেক নিসাব পরিমান কৃষি সম্পদের মালিকের উপর যাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক। কৃষি ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর দেয় যাকাতকে শরিয়তের পরিভাষায় 'ওশর' বলে। কৃষি সম্পদের নিসাব কিভাবে নির্ধারিত হবে, এ সম্পর্কে হাদিসে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"পাঁচ অছক (প্রতি অছক ছয় মণের উর্দ্ধে)-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে ওশর দান করা ফরয হবে না।"**

হাদিস, সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৭৬২

এ হাদিস অনুযায়ী উৎপাদিত কৃষি পণ্যের পরিমান পাঁচ অছক অর্থাৎ আমাদের দেশীয় হিসেবে ত্রিশ মনের কম হলে ওশর বা যাকাত প্রযোজ্য হয় না। এটাকেই কৃষিপণ্যের নিসাব গণ্য করা হবে। নিসাব পরিমান বা তদোর্দ্ধে উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাতের পরিমান কি হবে সে সম্পর্কেও হাদিসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে সমস্ত জমি বৃষ্টিপাতের, নদী-নালা বা প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ও রসের সাহায্যে শস্য উৎপাদন করে থাকে, তার উৎপন্ন দ্রব্য এক দশমাংশ যাকাতরূপে প্রদান করতে হবে। আর যে সমস্ত জমি ব্যয় সাপেক্ষ সেঁচ-প্রণালীর সাহায্যে শস্যোৎপাদন করে থাকে, তার উৎপন্ন দ্রব্যের কুড়িভাগের একভাগ দান করতে হবে।"**

হাদিস, সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৭৮৩

## ব্যবসা সম্পদ:

ব্যবসা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অন্যতম মাধ্যম। শরিয়তে ব্যবসা সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে। ব্যবসায়ের সম্পদের যাকাত নিরূপণকালে মালিকানার বছর সমাপ্তি দিবসে যে সম্পদ থাকবে তাই সারা বছর ছিল বলে ধরে নিয়ে তার উপর যাকাত দিতে হবে। ব্যবসায়

www.waytojannah.com

ব্যবহৃত চলতি মূলধন, দোকানে এবং গুদামে রক্ষিত মালামাল, কাঁচামাল, প্রক্রিয়াধীন মাল, প্রস্তুতকৃত মাল ইত্যাদির মূল্যমান ব্যাংক ঋণ বা অন্যান্য দেনা বাদ দিয়ে যদি নিসাব পূর্ণ হয় তাহলে সামগ্রিক সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে মেশিন, দালান, জমি ইত্যাদি স্থায়ী মূলধন সামগ্রীর উপর যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি মেশিন বা যন্ত্রপাতির ব্যবসা করা হয় তাহলে এর যাকাত দিতে হবে।

**যে সব সম্পদে যাকাত ফরয নয়:**

মানুষের এমন অনেক প্রকারের সম্পদ থাকতে পারে যার উপরে যাকাত প্রদান করা ফরয করা হয়নি। এ ব্যপারে মূলনীতি এই যে, নিজের ও সংসারের ব্যবহার্য জিনিস পত্র, কারবারে ব্যবহার্য জিনিসপত্র, কৃষিকাজে ব্যাবহৃত উপকরণ ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। এ মূলনীতির আওতায় যে কোন সম্পদই যাকাত প্রদানের দায়মুক্ত সম্পদ বলে বিবেচিত হতে পারে। যে সকল সম্পদের উপর যাকাত নেই তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল:

১. বসবাসের বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা ইত্যাদির উপর যাকাত নেই, তা যত মুল্যমানের হোক না কেন।
২. যে কোন প্রকারের মনি-মুক্তা ইত্যাদির উপর যাকাত নেই।
৩. কৃষি ও সেঁচ কাজের জন্য প্রতিপালিত পশু, যেমন গরু, মহিষ, উট ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। যে সব পশু গোশত খাওয়ার জন্য পালা হয় এবং বন্য পশু যেমন হরিণ, নীল গাই ইত্যাদির উপরও যাকাত নেই। ডেইরী ফার্মের পশুর উপর যাকাত নেই।
৪. ব্যবসায় ব্যবহৃত কল-কারখানা, মেশিন ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। কারখানার জমি, দালান-কোঠা, ফর্নিচার, দোকান ঘর এ সবের উপর যাকাত নেই। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রীত জমি, মেশিন বা অন্যান্য সম্পদের যাকাত দিতে হবে।
৫. মূল্যবান কোন দুষ্প্রাপ্য জিনিস কেউ যদি সখ করে ঘরে রাখে, তার উপর যাকাত নেই। তবে এর ব্যবসা করা হলে তার যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে সখের বশে পশু-পাখী বা মাছ পুষলে তার উপর যাকাত নেই কিন্তু এর ব্যবসা করা হলে তার যাকাত দিতে হবে।
৬. গৃহপালিত পশু যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাখা হয়, যেমন দুধ পানের জন্য গাভী, বোঝা বহনের জন্য গরু, মহিষ, যানবাহনের জন্য ঘোড়া, হাতি, উট ইত্যাদি তাহলে তার সংখ্যা যতই হোক কোন যাকাত দিতে হবে না।
৭. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মটর সাইকেল, কার বা বাস ইত্যাদির উপর যাকাত নেই।
৮. ভাড়ায় খাটানো জিনিস যেমন সাইকেল, রিক্সা, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক ইত্যাদি এবং ভাড়ায় খাটানো বাড়ী, দোকান, ফর্নিচার, ক্রোকারীজ ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। তবে ঐ সব ভাড়া থেকে যে আয় হয় তা নিসাব পরিমান হলে আয়ের উপর যাকাত দিতে হবে।
৯. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র যেমন ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার ইত্যাদির উপর যাকাত নেই।

www.waytojannah.com

১০. সরকারী মালিকানাভুক্ত নগদ অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের উপর যাকাত নেই, যেমন: প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা হস্তগত হওয়ার পূর্বে এ ফাণ্ডের ওপর যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই।

১১. কৃষি জমির উপর যাকাত নেই। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যদি জমা-জমি ক্রয় করা হয় তবে ঐ জমির বর্তমান মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে।

**যাকাত প্রদানের খাত:**

যাকাত সম্পদশালী বা ধনীদের উপর গরীবের অধিকার। এ অধিকার স্বয়ং আলাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত যে আটটি খাতে ব্যয় করা যাবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন সুরা তাওবায়:

**"যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকিন, যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের ও যাদের চিত্ত আকর্ষণের প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-দাসী মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, এই হলো আল্লাহ নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।"**

আল কোরআন, সুরা তাওবা(৯), আয়াত-৬০

যাকাত বণ্টনের খাত নির্ধারণের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কাউকে প্রদান করেন নি; বরং তিনি নিজেই যাকাত প্রদানের জন্য আটটি খাতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীকে বা সবকটিকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। তবে কারোপক্ষে নিজের খেয়াল-খুশী মত উল্লেখিত খাত বহির্ভুত অন্যকোন খাতে যাকাত প্রদান করার কোন সুযোগ নেই। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত যাকাত প্রদানের আটটি খাতের বিবরণ এবং এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হল:

**যাকাতের আট খাতের বিবরণ:**

**প্রথম** ও **দ্বিতীয়** খাত হচ্ছে যথাক্রমে **ফকীর ও মিসকিন**। শব্দ দু'টি যদিও দরিদ্র অর্থপ্রকাশক সমার্থবোধক শব্দ তবুও এখানে বৈশিষ্ট্যগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। **ফকীরকে** বাংলায় গরীব বলা হয়। যারা নিঃস্ব, যাদের কিছুই নেই, নিজের পেটের অন্নও যোগাড় করতে পারে না এবং অভাবের তাড়নায় অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়, সেই সব অসহায় মানব সন্তানদের বলা হয় ফকীর। আর **মিসকীন** বলতে এমন অভাবগ্রস্থ শ্রেণীর লোককে বুঝায়- যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেও দরিদ্র মনে হয়না। তারা স্বীয় আত্মসম্মানবোধের জন্য অপরের নিকট সাহায্য চাইতে পারে না অথচ কঠোর শ্রম ও প্রানান্তর চেষ্টার পরও সংসারের অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। অথবা বলা যায়, এরা জনগোষ্ঠীর সেই অংশ যাদের কিছু সম্পদ ও উপার্যন

আছে বটে! কিন্তু তা তার ও তার পরিবারের লোকদের প্রয়োজন পুরো করার জন্য যথেষ্ট নয়। মোটকথা যাদের কাছে নিসাব পরিমান সম্পদ নেই তারাই মিসকীন। যারা কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য হয় এবং মানবেতর জীবন যাপন করে, হযরত উমর (রাঃ) তাদেরকেও মিসকীনদের মধ্যে গণ্য করতেন। শর'ই দৃষ্টিতে এই দুই প্রকারের লোকই দরিদ্র বা অভাবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফকীর হচ্ছে মিসকিনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক গরীব। তবে এ দুই শ্রেণীর লোকই অভাবী এবং যাকাত প্রাপ্যতার হকদার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একজন যাকাত দাতাকে যাকাত প্রদানের পূর্বে কারো পক্ষে ফকীর বা মিসকিন হিসেবে যাকাত পাওয়ার প্রকৃত হকদার হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত করে নিতে হবে। হানাফীমতে এ খাতে যাকাত পাওয়ার জন্য যে যোগ্যতা বা শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক তা হল:

- **নিঃস্ব- যার কোন সম্পদ নেই, নেই আসলেই কোন উপার্জন।**
- **যার কিছু মাল বা উপার্জন আছে কিন্তু তা তার ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।**
- **যার মাল-সম্পদ আছে বটে; তবে তা নিসাব পরিমান সম্পদের চেয়ে কম।**

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত যে কেউ-ই যাকাত পাওয়ার হকদার। তবে এর সাথে আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই শ্রেণীর যাকেই যাকাত দেওয়া হোক, তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কেননা যাকাতের অর্থ কেবল মুসলিম ফকীর-মিসকিনের হক।

**তৃতীয়** খাত হচ্ছে **'আমেলিনে সাদাকা'** অর্থাৎ যাকাত আদায়কারী কর্মচারী। এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ হতে লোকদের নিকট হতে যাকাত ও ওশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুলমালে জমা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকে। তাদের পারিশ্রমিক সরকারের পক্ষ হতে যাকাত খাত থেকেই আদায় করতে হবে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে মাদ্রাসা এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা ধনীদের নিকট থেকে যে যাকাত ও সাদকা আদায় করেন, তারা উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নন। তাই সাদকা বা যাকাত থেকে তাদের বেতন-ভাতা আদায় করা যাবে না (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৯)।

**চতুর্থ** ব্যয়খাত হল **'মুআল্লাফাতুল ক্বুলুব'** অর্থাৎ যে সব লোকের মন জয়ের প্রয়োজন। এই পর্যায়ে সেই সব লোক গণ্য, যাদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কিংবা ইসলামের উপর তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য অথবা তাদের দুষ্কৃতি থেকে মুসলিম জনগণকে রক্ষা করার জন্য তাদের মনতুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন হবে, যাকাত ফাণ্ড থেকে তা করা যাবে। এদের মধ্যে মুসলিম, অমুসলিম কিংবা নওমুসলিম- এ তিন শ্রেনীর লোকই থাকতে পারে। দুর্বল ঈমানের মুসলিমদের ইসলামের উপর স্থিত রাখতে এবং ঈমান দৃঢ় ও শক্তিশালী

করতে, অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আর নওমুসলিমদের ইসলামের উপর অবিচল রাখার জন্য এদের পরিতুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা বৈধ।

**পঞ্চম** খাত হল **'ফির-রিক্বাব'** অর্থাৎ দাসমুক্তি। আমাদের সমাজে দাস প্রথার প্রচলন নেই বিধায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

**ষষ্ঠ** খাত **'আল-গারেমীন'** অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। এখানে ঋণগ্রস্ত বলতে বোঝান হয়েছে, যার উপর ঋণের বোঝা চেপেছে এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু সে ঋণ পরিশোধ করার সাধ্য তার নেই। এই প্রকারের ঋণগ্রস্তকে ঋণ শোধ পরিমান যাকাত দেয়া যাবে, তবে এর পেছনে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ অবশ্যই রক্ষা করতে হবে:

- **প্রথম শর্ত:** তার প্রয়োজনটা হবে ঋণ শোধ করার। সে যদি ধনী হয় বা তার নিজের জিনিসপত্র দিয়ে তা শোধ করতে সমর্থ হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।
- **দ্বিতীয় শর্ত:** ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে আল্লাহর বন্দেগী পালন অথবা কোন মুবাহ বা বৈধ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য- এরূপ হতে হবে। যদি কোন নাফরমানীর কাজ বা অবৈধ কাজ করার জন্য ঋণ করা হয়ে থাকে, যেমন মদ্যপান, গান-বাজনা, ব্যাভিচার, জুয়া, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের হারাম কাজ করার জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে না।

**সপ্তম** খাত **'ফি-সাবীলিল্লাহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পথে। 'ফি-সাবীলিল্লাহ্' শব্দের আভিধানিক অর্থ অতি ব্যাপক। যে সব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী 'ফি-সাবীলিল্লাহ্'-র অন্তর্ভুক্ত। তবে যাকাতের ক্ষেত্রে এর শাব্দিক অর্থকে গ্রহণ না করে, বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অনুযায়ী এ খাতের জন্য উপযুক্ত হকদার হচ্ছে - গাযী ও মুজাহিদ যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্জ আদায় করতে পারে। এ দু'টি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খিদমত ও ইবাদত। এ ছাড়াও 'বাদায়ে' প্রণেতা তার তাফসীরে বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফি-সাবীলিল্লাহ্' খাতের অন্তর্ভুক্ত- যে নিজেকে কোন সৎকাজে উৎসর্গ রেখেছে যেমন ধর্মীয় শিক্ষা, দাওয়া বা প্রচার-প্রকাশনা ইত্যাদি যেখানে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থ সম্পদ থাকবে না যদ্বারা একাজ সম্পাদন করা যায়, সেক্ষেত্রে তাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু কোন মালদার লোককে তা দেয়া যাবে না (তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৭)। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য যে চার ইমাম ও ফিকাহবিদগণ সবাই এ বিষয়ে একমত যে, সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন, বাঁধ, পুল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরী বা মেরামত এবং মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ অথবা মৃতের দাফন-কাফন ইত্যাদি বিষয়ে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

www.waytojannah.com

**অষ্টম** খাত হল **'ইবনুস সাবীল'** অর্থাৎ পথিক ও মুসাফির। 'ইবনুস সাবীল' বলে বোঝান হয়েছে সেই পথিক-মুসাফিরকে যে এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করে। এই প্রকারের মুসাফিরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয, তবে এ ব্যপারে কিছু শর'ই শর্ত আরোপিত রয়েছে-

-  মুসাফির যে স্থানে রয়েছে, সেখানেই তাকে অভাবগ্রস্ত হতে হবে তার স্বদেশ পৌঁছার সম্বলের জন্য।
-  তার সফর পাপমুক্ত হতে হবে। তার সফর যদি কোন পাপ কাজের জন্য হয়-যেমন কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে বা হারাম ব্যবসা করার জন্য প্রভৃতি তাহলে তাকে যাকাতের অংশ থেকে দেয়া যাবে না এক বিন্দুও।
-  যার নিজের ঘরে ধন-মাল রয়েছে, ঋণ শোধ করার সামর্থও রয়েছে কিন্তু সে যে স্থানে রয়েছে সেখানে যদি ঋণ বা অগ্রিম হিসেবে পাওয়ার কোন উপায় না পায় বা তাকে দেয়ার মত কোন লোকই না পাওয়া যায়, তাহলে তাকেও যাকাত থেকে দেয়া যাবে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর জামানায় যাকাতের অর্থ-সম্পদ সরকারীভাবে সংগ্রহ করা হত এবং এ সমুদয় সম্পদ বায়তুল-মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা করা হত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত খাতে তা হতে খরচ করা হত। যে সকল রাষ্ট্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, সেখানে এ ব্যবস্থাটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তবে আমাদের অবস্থাটি তদ্রূপ নয় বিধায় ব্যক্তিগত উদ্যোগেই যাকাতের অর্থ বিতরণ করতে উদ্দ্যোগ নিতে হয়। তবে যেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত আটটি ব্যয়খাতেই শুধুমাত্র এ অর্থ ব্যয় করা যাবে। এর বাইরের কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হলে তা যাকাত হিসেবে গণ্য করা হবে না।

**যাকাত যাদেরকে দেওয়া যাবে না:**

শরীয়তে যাকাত প্রদানের জন্য যে সকল খাতকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এর বাইরে অন্য কোন খাতে যাকাত প্রদানের বৈধতা নেই। সে হিসেবে শর'য়ী বিশেষজ্ঞগণ বিচার-বিশ্লেষণ করে যে সব খাতে যাকাত প্রদান করা যাবে না তার একটি মূলনীতি পেশ করেছেন। সে মূলনীতি অনুযায়ী যে সকল খাতে যাকাত দেওয়া যাবে না তা হচ্ছে:

১. নিসাব পরিমান মালের অধিকারী বা ধনীকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
২. সম্পদশালীর নাবালক পুত্র-কন্যাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
৩. যে সব প্রতিষ্ঠানে ধনী-গরীব সবাই সেবা পায় সেখানে যাকাত দেওয়া যাবে না। যেমন: মসজিদ, মাদ্রাসা (এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং ব্যতীত), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আশ্রয় কেন্দ্র এবং সেতু, টিউবওয়েল, পুকুর, কূপ রাস্তা-ঘাট নির্মান ইত্যাদি সেবামূলক কাজ।

৪. পিতামাতা, দাদা, নানা, সন্তান এভাবে উপর থেকে নিচের দিকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

৫. স্বামী বা স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

৬. নিজ চাকর-চাকরানীকে যাকাতের টাকায় বেতন-ভাতা দেওয়া যাবে না।

৭. উপার্যনক্ষম অলস ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

৮. অমুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

**যাকাত প্রদান সম্পর্কিত কতিপয় মাস'আলা:**

- **এক.** এ পর্যন্ত বর্ণিত যে আটটি খাতের কথা বলা হল এর যে কোন একটি অথবা একাধিক খাতে যাকাত দেয়া বৈধ। তবে এসকল খাতে যাকাত প্রদানের একটি সাধারণ শর্ত বর্ণনা করেছেন অধিকাংশ ফিকাহবিদগণ। তা হল এই যে, এসব খাতের কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় কোন মাল তাদের উপকারকল্পে ব্যয় করা হলেও তাতে যাকাত আদায় হবে না।
- **দুই.** যদি যাকাতের হকদার আত্মীয় বা আপনজন হয়, তবে তাদেরকে দান করা অধিকতর উত্তম এবং তাতে দ্বিগুন সওয়াব হয়। তবে স্বামী-স্ত্রী এবং পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে পারস্পরিকভাবে একে অপরকে দিতে পারবে না। কারণ এদেরকে দেয়া একদিক দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার শামিল। সন্তানের সন্তান এবং দাদা-পরদাদার বেলায়ও একই হুকুম এবং তাদের যাকাত দেয়া জায়েয নয়।
- **তিন.** যাকাতের মাল বণ্টন করার উত্তম পদ্ধতি হল এই যে, কাউকে এমন পরিমান যাকাত দিতে হয় যাতে তার দারিদ্র্য দূর হয় এবং পরবর্তী বছর যেন সে নিজেই যাকাত দিতে সমর্থ হয়। আমাদের সমাজের বাস্তবতায় যাকাতের নামে কিছু লুঙ্গি, শাড়ী বা কিছু কিছু নগদ টাকা বহু মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে দেখা যায়। যাকাতের এ পদ্ধতিটি নজায়েয নয়, তবে উত্তমও নয়। তাই এ পদ্ধতিতে যাকাত বিতরণ করাকে শরিয়াত নিরুৎসাহিত করেছে।
- **চার.** কোন সম্পদের যাকাত জীবনে একবার দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং নিসাব পরিমান বা তদোর্দ্ধ সম্পদ কারো কাছে বর্তমান থাকলে তার উপর প্রতি বছর একবার করে যাকাত দিতে হবে। তবে নিসাব পুরো না হলে সে বছরের যাকাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।
- **পাঁচ.** যাকাতের পরিবর্তে কোন প্রকার বিনিময় গ্রহনের সুযোগ একেবারেই নেই।

**যাকাত প্রদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:**

যাকাত মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তরফ থেকে বিত্তশালীদের উপর ফরযকৃত এমন একটি আমল, যার দ্বারা তিনি বান্দাকে তার প্রিয় বস্তুর কিয়দাংশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে পরীক্ষা করে

থাকেন। যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ সম্পদশালীদের সম্পদের উপর দরিদ্র ও অভাবীদের হক নির্ধারণ করেছেন। গরীবের হক আদায় করা তাই প্রত্যেক সম্পদশালীর ঈমানী দায়িত্ব এবং অবশ্য কর্তব্য। যাকাত প্রদান করে গরীবের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে- এমন ভাবনার কোন অবকাশ নেই। কারণ যাকাত আসলে কোন দান নয়, যা প্রার্থী কিংবা ভিখেরীকে দান করা হয়; বরং যাকাত হচ্ছে ধনীর সম্পদে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত দরিদ্রদের অধিকার। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

**"এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"**

আল কোরআন, সুরা যারিয়াত(৫১), আয়াত-১১০

মহান আল্লাহ্ যখন বলেছেন যে, সম্পদশালীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে, তখন কারো পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে গরীবের হক নষ্ট করে বা আদায় না করে। সম্পদ থেকে যাকাত বের করে তা দরিদ্র-অভাবীদের হাতে তুলে দেওয়াই হচ্ছে সম্পদশালীদের উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক্ষেত্রে যাকাত দাতার পক্ষে অহংকারী হয়ে দরিদ্রদের তুচ্ছ জ্ঞান করা বা যাঞ্চাকারীকে অবজ্ঞা করা কোনভাবেই শোভনীয় নয়। যাকাত প্রদান না করা হলে আল্লাহর নাফরমানী করা হয় এবং তার জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে পরকালে। তাই সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জন্যই যাকাত আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ।

**যাকাত আদায়ের ফজিলত বা উপকারীতা:**

যাকাত আদায়ের উপকারীতা ও ফজিলত অপরিসীম। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এর কিছু বর্ণনা করা হল:

১. যাকাত হল আর্থিক ইবাদত। এই ইবাদত পালন করলে মুসলিম সওয়াব অর্জন করতে পারে। মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে, লাভ করতে পারে পরকালীন শান্তি। যাকাত হল আখেরাতের পুঁজি। যাকাত মুমিনের জন্য জান্নাত লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। একটি হাদিসে আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

**একব্যক্তি বললো,**

**"ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**বললেন,**

**"তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে"।**

হাদিস, সহীহ্ বোখারী শরীফ; নং ৫৫৫৭

২. যাকাত আদায় করলে সম্পদে প্রবৃদ্ধি আসে। আপাতঃদৃষ্টিতে ধন-সম্পদ থেকে দান করা হলে তা হ্রাস পায় বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হ্রাস পায় না; বরং তা পরিমানে বৃদ্ধি পায়। ধন-সম্পদ প্রদান করা ও তা কেঁড়ে নেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। মানুষ এখানে শুধু আমানতদারের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়ই ধন-সম্পদ খরচ হওয়া বাঞ্চনীয়। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান পালনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় করার মধ্যেই সম্পদের প্রবৃদ্ধি অর্জন নির্ভরশীল। যাকাত আদায় করলে মালে বরকত আসে, আল্লাহর তরফ থেকে মাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজ যা দান করবে কাল তা আল্লাহর নিকট বর্ধিত আকারে পাবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

**“তোমাদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, ওরাই হল সমৃদ্ধশালী ।”**

আল কোরআন, সুরা রূম(৩০), আয়াত-৩৯

৩. যাকাতে পবিত্রতা লাভ হয়। তাতে যেমন মাল পবিত্র হয় তেমনি পবিত্র হয় আত্মা। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান পালনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় করার মধ্যেই সম্পদের পবিত্রতা হাসিল হতে পারে। যাকাতের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকেই নিশ্চিত করা হয়। বস্তুতঃ যাকাতের মাধ্যমে পবিত্রতা কেবল ধন-সম্পদের মধ্যেই সাধিত হয়না; বরং যাকাত প্রদানকারীর মন মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তা পরিব্যপ্ত হয়। এ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেছেন,

**“তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকা গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পাক-সাফ করে দেবে।”**

আল কোরআন, সুরা তাওবা(৯), আয়াত- ১০৩

উল্লেখিত আয়াতে সাদকা বলতে যাকাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা কোরআন ও সুন্নাতের ভাষায় যাকাত-ই সাদকা নামে অভিহিত। এখানে আল্লাহ্ তা’আলা স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে লোকসকলের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদেরকে পাক-পবিত্র করে দেওয়ার কথা বলেছেন। যদিও এ নির্দেশনাটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কেন্দ্র করেই উপস্থাপিত হয়েছে তবুও সকল ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে এ হুকুমটি সাধারণ হুকুম এবং তা সর্বকালের জন্য প্রজোয্য।

৪. যাকাত আদায় করলে মালের সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

৫. যাকাতে রয়েছে কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ইলাহী অর্থব্যবস্থা। যাকাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থের সুষম বণ্টন সহ নানাবিধ

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কল্যাণ। যাকাত ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যাকাত একদিকে যেমন দরিদ্র, অভাবী ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি, অন্যদিকে এটা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ণেরও অন্যতম হাতিয়ার। ইসলাম কায়েমী, স্বার্থবাদী এবং পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। যাকাত ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবসান করে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সৃষ্ট আকাশ-পাতাল ব্যবধান হ্রাস করতে পারে। এ ব্যবস্থায় সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে দরিদ্রদের মাঝেও আবর্তিত হয়ে থাকে। ফলে সমাজের অভাবগ্রস্ত মানুষের অভাব অনেকটা দূর হয়ে যায়। এভাবে সম্পদের ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ বজায় থাকে এবং এর ফলে সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

৬. যাকাত আদায়ে অর্থ ও কর্ম বাজার চাঙ্গা থাকে। কারণ অর্থ জমা থাকলে যাকাত খেয়ে নেবে এই ভয়ে মানুষ নিজ অর্থ ব্যবসায়ে বিণিয়োগ করবে এবং কর্মে মনোযোগ দেবে। আর সেই সাথে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

৭. যাকাতের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে সহমর্মিতা, সহনশীলতা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির মত মানবীয় উত্তম গুণগুলি অর্জিত হতে পারে এবং হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, অহংকার প্রভৃতির মত বদগুণসমূহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

৮. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং এর মাধ্যমেই একজন মানুষ পরহেজগারীতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ধন-সম্পদ মানুষের কাছে অতি প্রিয় এবং লোভনীয় বস্তু। তাই স্বভাবতই মানুষ ধন-সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে। যাকাত একটি সাময়িক ব্যয়, তাই যাকাতকে অনেকের কাছে ভারী বোঝা বলে মনে হয়। তবে অন্তরে আল্লাহভীতি জাগরিত থাকলে এ কাজটি অতি সহজ মনে হবে। আর এভাবেই মানুষ অন্যান্য সকল কাজেও আল্লাহভীতি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

৯. যাকাত আদায়ে মহান দাতার শুকরিয়া আদায় করা হয়। আর শুকরিয়া আদায় করলে নিয়ামত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১০. যাকাত মানুষের অন্তরে দানশীলতার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং সমাজে যাকাতদানকারী জনপ্রিয় উপকারী মানুষরূপে পরিচিতি লাভ করে।

১১. যাকাত দিলে দুঃস্থ ও গরীবদের দুয়া পাওয়া যায়।

**যাকাত আদায় না করার পরিনাম:**

যাকাত অস্বীকারকারী সরাসরি কাফির হিসেবে আখ্যায়িত। তবে শর'ই বিধি-বিধানের উপর আস্থা স্থাপন করা সত্ত্বেও অনেক মানুষকে যাকাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত থেকে বিমুখ থাকতে দেখা যায়। তারা আসলে যাকাত প্রদান না করে ঘোর বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। যাকাত প্রদান

না করা অথবা যাকাত দানে বিরত থাকা বা আনীহা প্রকাশ করা কিংবা সঠিকভাবে যাকাত আদায় না করা- এ সবই কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। বস্ততঃ যাকাত প্রদান না করা, যাকাতকে অস্বীকার করারই নামান্তর এবং তারাও প্রকারান্তে অবিশ্বাসী মুশরিকদের দলে শামিল। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে যাকাত না দেওয়া কেবল পরকালে অবিশ্বাসী মুশরিকদেরই কাজ। যারা যাকাত দেয় না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

**“দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য- যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।”**

আল কোরআন, সুরা হা-মীম আস্ সাজদাহ(৪১), আয়াত- ৬,৭

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী যাকাত সম্পর্কে কোরআনের এ বক্তব্যের আলোচনায় বলেছেনঃ যাকাত না দিলে কোন লোকই পরকালে অবিশ্বাসী মুনাফিকদের থেকে ভিন্নতর পরিচিতি লাভ করতে পারে না; যাকাত না দিলে কোন লোকই কল্যাণ পেতে পারে না, যাকাত না দিয়ে কেউ আল্লাহর রহমতের যোগ্য অধিকারীও হতে পারে না।

অবিশ্বাসী কাফিররা স্বভাবতই যাকাত বিধান অস্বীকার করার কারণে যাকাত প্রদানে বিরত থাকে। কিন্তু বিশ্বাসী মুসলিমদের বেলায় যাকাত প্রদান না করার পেছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তবে যাকাত দিতে অনেক মানুষেরই কষ্ট হয়। যাকাতকে অনেক মানুষই জরিমানা বা অর্থদণ্ড মনে করে। আসলে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। মাল কমে যাওয়ার ও গরীব হওয়ার ভয় দেখায়। তাই যাকাত না দেওয়ার পেছনে শয়তানের চক্রান্তই মূল কারণ। তবে সামাজিক বাস্তবতার আলোকে মানুষের যাকাত আদায় না করার পিছনে যে কারণগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় সেগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ:

- **ঈমানের দুর্বলতা**
- **অজ্ঞতা**
- **সম্পদের লোভ-লালসা**
- **কার্পণ্য**
- **সম্পদ হ্রাস পাওয়ার আশংকা**
- **অহংকার**
- **অবহেলা প্রদর্শন এবং যাকাতকে গুরুত্ব না দেওয়া।**

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কারণ যাই হোক না কেন, যাকাত না দেওয়া একটি বড় অপরাধ এবং সে অপরাধ করে কেহই রেহাই পেতে পারে না। পরকালে তাকে যাকাত আদায় না করার মাশুল দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। তাই যারা অযৌক্তিকভাবে যাকাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি থেকে গাফেল রয়েছেন অর্থাৎ যাকাত দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন, তাদের এখনই ভেবে দেখা উচিত যে, যাকাত আদায় না করার পেছনে তার মধ্যে এর কোন কারণটি বা কারণগুলো

বিদ্যমান রয়েছে। এবং সেই সাথে সেগুলি পরিহার করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায় করে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে যাবতীয় কল্যাণার্জনে সচেষ্ট থাকাই বাঞ্ছণীয়।

সম্পদের যাকাত আদায় না করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হলে সীমালঙ্ঘণের অপরাধ সংঘটিত হয়। আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘণকারীদের পছন্দ করেন না; উপরন্তু তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে পরকালীন কঠোর শাস্তি। যাকাত অমান্যকারী এবং অনাদায়কারীরাও সীমালঙ্ঘণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাই এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ভয়াবহ আযাব। কোরআন ও হাদিসে যাকাত অনাদায়কারী লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের কঠিন আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

**"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা ব্যায় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে, বলা হবে এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা রাখার।"**

আল কোরআন, সুরা তাওবা(৯), আয়াত- ৩৪,৩৫

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুসলিম শরীফের একটি হাদিস বিবৃত হয়েছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায়। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে রোজ কিয়ামতে তার জন্য আগুনের বিছানা পেতে দেয়া হবে। তারপর দোযখের আগুনে ঐসব স্বর্ণ-রৌপ্য উত্তপ্ত করে তদ্বারা তার পাঁজরে, পৃষ্ঠে এবং ললাটে দাগ দেয়া হবে। এরপর তাপ কমে গেলে পুণরায় তা উত্তপ্ত করা হবে, এভাবেই শাস্তি প্রদান চলতে থাকবে সারাদিন ধরে, যার পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।"**

হাদিস, সহীহ্ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ২১৬০

পবিত্র কোরআনে সুরা আলে-ইমরানের একটি আয়াতে যাকাত অনাদায়কারীদের উপর অন্য প্রকারের শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

**"আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে- এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে তারা যেন এমন ধারনা না করে; বরং এটা তাদের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে।"**

আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান(৩), আয়াত- ১৮০

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা এরশাদ করেছেন, তার উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-দৌলত দান করেছেন কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করে না; কিয়ামতের দিন তার ঐ ধন-দৌলতকে বিকট আকারের অতি বিষাক্ত অজগর রূপে রূপান্তরিত করা হবে, যার মুখের উভয় পার্শ্বে বিষদাঁত থাকবে। ঐ অজগরটি কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির গলবদ্ধ রূপে পরিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর অজগরটি উভয় চিবুক দ্বারা পূর্ণমুখে ঐ ব্যক্তিকে কাঁমড় দিয়ে বিষোদগার করতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমারই ধন-সম্পদ, আমি তোমারই রক্ষিত পুঁজি।"**

হাদিস, সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদিস নং- ৭৩৪

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! কি ভয়াবহ হতে পারে সে অবস্থা তা অন্তত একবার আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সুতরাং অজ্ঞতাবশতঃ হোক আর জ্ঞাতসারেই হোক, যাকাত প্রদান করা থেকে কারো বিরত থাকা উচিত নয়। পরকালের সেই ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ করে অতিসত্বর সকলেরই যাকাত প্রদানে অগ্রগামী হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা পরকালীন কল্যাণার্জনে সচেষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়।

www.waytojannah.com

## সামর্থ্যবান হয়েও হজ্জ আদায় না করা

## (Not Performing the Hajj When One Has the Ability to Do so)

'হজ্জ' শব্দের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। শরিয়তের পরিভাষায় হজ্জের মাসে নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান ও বিশেষ কার্যাদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করাকে হজ্জ বলা হয়।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ একটি অন্যতম স্তম্ভ। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেওয়া (৪) হজ্জ আদায় করা এবং  (৫) রমযানের রোযা রাখা।"**

হাদিস, সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৭

**হজ্জের বিধান:**

হজ্জ একটি ফরয ইবাদত। এটা ফরয হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ্ বলেন,

**"আর মানব জাতির ওপর আল্লাহর  জন্য এ দায়িত্ব দেয়া হরেছে যে, যে ব্যক্তির এ ঘর (কা'বা) পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে, এবং যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী।"**

আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান(৩), আয়াত- ৯৭

উল্লেখিত আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়া সহ হজ্জ সম্পর্কিত অনেকগুলি বিধান বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ্ মানবজাতির প্রতি শর্তাধীনে হজ্জ ফরয করেছেন। শর্ত হল এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যায় দু'টি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে-

এক. **আর্থিক সামর্থ্য** এবং

দুই. **শারীরিক বা দৈহিক সামর্থ্য**।

**আর্থিক সামর্থ্য** বলতে বুঝানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমান অর্থ থাকতে হবে যদ্দারা কা'বা গৃহ পর্যন্ত আসা-যাওয়া ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

**শারীরিক বা দৈহিক সামর্থ** বলতে বোঝানো হয়েছে যে, হাত-পা, চক্ষু সহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম থাকতে হবে এবং দূরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত হতে হবে। এর কারণ এই যে, শারীরিক সক্ষমতা ব্যতীত সেখানে যাওয়া এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এর সাথে মাহিলাদের সম্পর্কিত অতিরিক্ত বিষয়টি হল এই যে, তাদের পক্ষে মাহরিম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শর'ই দৃষ্টিতে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহরিম পুরুষ হজ্জে থাকবে। এ সমূদয় বিষয় ছাড়াও সকলের জন্য কা'বা গৃহে পৌঁছার রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশংকা থাকে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছার যদি কোন বাহন না থাকে, তবে হজ্জের সামর্থ্য নেই বলে মনে করা হবে (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৩-১০৪)।

**হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ:**

হজ্জ শর্ত সাপেক্ষে পালনীয় একটি ফরয ইবাদত। সাধারণভাবে সকল মানুষের উপরই হজ্জ ফরয করা হয় নাই। এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, যে শর্তগুলি পূরণ হলেই কেবল একজন মানুষের উপর হজ্জ ফরয বলে বিবেচিত হবে। শর্তগুলি নিম্নরূপঃ

১. **মুসলমান হওয়া**
২. **প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া**
৩. **সুস্থ মস্তিস্ক হওয়া**
৪. **আযাদ হওয়া**
৫. **হজ্জ পালনের দৈহিক ও আর্থিক সঙ্গতি থাকা**
৬. **হজ্জের সময় হওয়া**
৭. **হজ্জ যাত্রাপথের নিরাপত্তা থাকা।**

এ সকল শর্তপূরণ সাপেক্ষে একজন ব্যক্তির উপর হজ্জ পালন ফরয করা হয়েছে। এ শর্তগুলির পূরণ না হলে কাউকে হজ্জ পালন না করার জন্য পাঁকড়াও করা হবে না। আর এ কথাও সাব্যস্ত যে, সামর্থবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। তবে কেউ যদি অতিরিক্ত করতে চান তবে তারও অনুমতি রয়েছে এবং তখন সেটা নফল হজ্জ হিসেবে গৃহীত হবে। আবার শর্তপূরণ না হলেও একজন মুমিনের জন্য হজ্জ পালন করতে কোন বাঁধা নেই এবং তার জন্য এটা অতিরিক্ত।

www.waytojannah.com

**হজ্জের প্রকারভেদ:**

হজ্জ তিন প্রকারঃ

১. ইফরাদ হজ্জ- হজ্জের মাসে ওমরা ছাড়া কেবল হজ্জ করা।
২. তামাত্তু হজ্জ- হজ্জের মাসে প্রথমে ওমরা এবং পরে হজ্জ করা।
৩. কিরান হজ্জ- হজ্জ ও ওমরা একসাথে মিলিয়ে করা।

**হজ্জের আহকাম:**

**হজ্জের ফরয তিনটিঃ**

১. ইহরাম বাঁধা বা হজ্জের নিয়ত করা
২. উকুফে আরাফা বা আরাফাতে অবস্থান করা, ৯ই যিলহজ্জ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জের ফযরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও।
৩. তাওয়াফে জিয়ারত, ১০ই যিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন দিন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।

এ তিনটি ফরযের একটি যদি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর তার কাযা আদায় করা ফরয হয়ে যাবে।

**হজ্জের ওয়াজিব সমূহ:**

১. মিকাত হতে ইহরাম বাঁধা
২. সাফা মারওয়ায় সাঈ করা এবং সাফা থেকে সাঈ আরম্ভ করা
৩. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা
৪. উকুফ মুযদালিফা বা মুযদালিফায় অবস্থান করা
৫. জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা
৬. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা
৭. কিরান বা তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর কুরবানী আদায় করা
৮. মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এগুলোর কোন একটি ওয়াজেব ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে তবে ওয়াজেব তরক করার জন্য দম দিতে হবে অর্থাৎ কাফফারা স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হবে।

**হজ্জের সুন্নতসমূহ:**

১. জিলহজের ৮ তারিখে মিনার উদ্দেশ্যে গমন করা এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার ফরয পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করা।
২. ৯ই জিলহজ্জ সূর্য উদয়ের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

৩. আরাফার ময়দানে গোসল করা।
৪. আরাফা থেকে সূর্য অস্ত যাবার পর হজ্জের ইমামের রওয়ানার পর রওয়ানা দেওয়া।
৫. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।
৬. ১০,১১ও ১২ তারিখ রাত্রগুলো মিনায় অবস্থান করা।
৭. তাওয়াফে কুদুম বা তাওয়াফে ওমরাতে রমল করা।

এগুলোর কোন একটি সুন্নাত ছুটে গেলেও হজ্জ হয়ে যাবে এবং এর জন্য কোন কাফফারাও দিতে হবে না।

**হজ্জের তাৎপর্য ও ফজিলত:**

হজ্জ পালনের মধ্যে দিয়ে একজন মুমিন আল্লাহর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমেই সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁর সান্নিধ্য ও নৈকট্য হাসিলের দুর্লভ সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে হজ্জ আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি ও শারীরিক কষ্টের কারণ বলে মনে হলেও এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবনের অশেষ কল্যাণ। পূণ্যভূমি সফরের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের কলুষ ও পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়ে যায়। সে অন্তরের প্রশান্তি লাভ করে এবং যাবতীয় পূণ্য কাজে তার মন চলে আসে। আল্লাহর আদেশ পালনের স্বার্থে খাঁটি অন্তরে যে ব্যক্তি হজ্জব্রত পালন করে, তার পূবের্র গুণাহখাতা আল্লাহ মাফ করে দেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তিনি এরূপ বলতে শুনেছেন,

**"যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুণাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এই মুহূর্তে প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।"**

হাদিস, সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ১৪৩১

হজ্জের মাধ্যমে একজন মুমিনের জন্য এটা খুব বড় একটা প্রাপ্তি। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এর জন্য হজ্জ হতে হবে মাকবুল বা মাবরুর হজ্জ। মাবরুর হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়। হজ্জ মাবরুর হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক। শর্ত পূরণ না হলে মাকবুল হজ্জের আশা করা যায় না। সেক্ষেত্রে হজ্জের এ দুর্লভ ফজিলত থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। মাকবুল হজ্জের জন্য ন্যূনতম যে সকল শর্ত পালন করা আবশ্যক তা নিম্নরূপ:

১. একনিষ্ঠতার সাথে শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য হজ্জ পালন করা।
২. উহা পালনে শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা।
৩. হালাল বা বৈধ উপার্যন থেকে হজ্জব্রত পালন করা।
৪. যাবতীয় শির্ক, বিদআত ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

**হজ্জের হাকিকত:** ইসলামের ইবাদত সমূহের মধ্যে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হজ্জ মূলত পালিত হয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে, তবে এর বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে হজ্জের হকিকত। আমরা যদি সে সত্যটা উপলব্ধি করতে পারি তাহলেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের হজ্জ হবে প্রাণবন্ত। হজ্জের এ হাকিকত নিম্নে বর্ণিত হজ্জের বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে যেভাবে অনুধাবন করা সম্ভব তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল:

-  এহরামের কাপড় জড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে হজ্জের সফরে রওয়ানা হওয়া কাফন পড়ে সবাইকে ছেড়ে আখিরাতের পথে রওয়ানা হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
-  'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে বান্দা হজ্জ বিষয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর যে কোন ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকার কথা ঘোষণা দেয়।
-  এহরাম অবস্থায় সকল বাঁধা নিষেধ মেনে চলা স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে মুমিনের জীবন বল্গাহীন নয় যে, যেমন খুশী তেমন জীবন পরিচালনা করা যায়। আল্লাহর ইচ্ছার সামনে বৈধ এমনকি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসকেও ছেড়ে দিতে সে ইতস্তত বোধ করে না বিন্দুমাত্র।
-  ত্বাওয়াফ আল্লাহ কেন্দ্রিক জীবনের নিরন্তর সাধনাকে বুঝায়। অর্থাৎ একজন মুমিনের জীবন আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এক আল্লাহকে সকল কাজের কেন্দ্র বানিয়ে যাপিত হয় মুমিনের সমগ্র জীবন।
-  হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ মুমিনের হৃদয়ে সুন্নতের তাজিম-সম্মান বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি করে। এ চুম্বন বিনা শর্তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যে নিজেকে আরোপিত করার একটি আলামত।
-  এহরাম অবস্থায় ঝগড়া করা নিষেধ। এর ফলে ঝগড়া-বিবাদের উর্দ্ধে উঠে সে পবিত্র ও সহনশীল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। এভাবে মুমিন ধৈর্য ও ক্ষমার উদাহরণ স্থাপন করে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে।
-  উকুফে আরাফা কেয়ামতের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হবে সুবিস্তৃত এক ময়দানে

**সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করার পরিণতি:**

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ফরয হজ্জ আদায় না করা কবীরা গুণাহ্। তবে যদি কেউ পরিষ্কারভাবে হজ্জকে ফরয মনে না করে, সে যে ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত এবং কাফির তা সর্বজনবিদিত। ইতিপূর্বে উল্লেখিত কোরআনের সুরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতের শেষ দিকে 'যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী'- এ কথার মাধ্যমে অবিশ্বাসী কাফিরদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং হজ্জ অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হজ্জকে ফরয বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ

আদায় করে না, সেও এক দিক দিয়ে অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত। এ আয়াতে শাসনের ভঙ্গিতে তার সম্পর্কে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সে কাফিরদের মত কাজেই লিপ্ত। অবিশ্বাসী কাফির যেমন হজ্জের গুরুত্ব অনুভব করে না, সেও তদ্রূপ কাফিরদেরই মত হয়ে গেছে। কাজেই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না তাদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে এ আয়াতের মধ্যে। হাদিসের মাধ্যমেও এ ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার মত পাথেয় ও বাহনের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যদি হজ্জ না করে তবে সে ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করুক বা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করুক, তাতে আল্লাহর কোন পরওয়া নেই।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং- ৭৫৯

এ প্রসংগে আমাদের একটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রযোজন যে, হজ্জের সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ দেরী না করে যথাশীঘ্র হজ্জ পালন করা কর্তব্য। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় দেখা যায় অনেক বিত্তশালী লোক হজ্জের সকল সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালনে উদাসীন থাকেন বা গড়িমসি করে এ ফরয ইবাদতটিকে বিলম্বিত করতে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের ধারনা যে, বুড়ো হলে হজ্জ করবে বা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-শাদী সম্পন্ন করে হজ্জ করবে ইত্যাদি। তবে এরূপ যারা করেন তারা বোধ করি বোকার স্বর্গে বসবাস করেন। কারণ কোন ব্যক্তিই নিজের আয়ু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, তাই হতে পারে হজ্জ বিলম্বিত করার কারণে কোন দিনই তার নসিবে হজ্জ পালনের সৌভাগ্য হলো না। এ ধরনের নমুনা সমাজে অনেক রয়েছে যাদেরকে বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ বিলম্বিত করার কারণে হজ্জ না করেই চির বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। আবার অনেক লোক এভাবেও ভেবে থাকেন যে, হজ্জ করার পরে তো আর পাপ করা যাবে না, তাই বৃদ্ধ বয়সে হজ্জ করে জীবনের সকল পাপ মোচন করে নিয়ে বাকী অল্প কিছুদিনের জীবনে নেক আমল করবেন। এদের অবস্থা আরও ভয়াবহ, কেননা যাদের নিয়তের মধ্যে গলদ রয়েছে তারা কি করে সফলকাম হবে বলে ভাবতে পারে? আবার একশ্রেণীর বিত্তশালী আছেন যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে নয়; বরং লোক দেখানোর জন্য এবং আলহাজ্জ খেতাব নিয়ে সমাজের নেতা সাজার জন্য বা পার্থিব কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য হজ্জ করে থাকেন। এ ধরনের লোক শির্কের মত বড় অপরাধ করে যাচ্ছেন এবং তাদের অবস্থা যে কত ভয়াবহ তা বলাই বাহুল্য। তাই বিলম্ব না করে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনের স্বার্থে এবং কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে একনিষ্ঠতার সাথে হজ্জ পালন করাই সকল সাফল্যের মূল বিবেচনা করে সামর্থবানদেরকে সময়মত হজ্জব্রত পালনে মনোযোগী হতে হবে।

## পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া
## (Disobedience to Parents)

**"আমিতো মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।"**

আল-কোরআন, সুরা আনকাবুত(২৯), আয়াত- ৮

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাদের পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য সরাসরি নির্দেশ দান করেছেন। তাই সন্তানের পক্ষে পিতামাতাকে মান্য করা এবং তাদের খেদমত করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ আদেশ অমান্য করা অর্থাৎ পিতামাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুণাহ হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে এটা কবীরা গুণাহ্ হওয়া নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে বাকরা (রাঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"আমি কি তোমাদের সবচেয়ে মারাত্মক গুণাহ্ সম্পর্কে জানাব না?"**

সাহাবাগণ বললেন,

**"ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অবশ্যই বলে দিন।"**

তিনি বললেন,

**"আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।"**

রাবী বলেন, তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন,

**"এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা কথা বলা।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৮৫০

এ হাদিস দ্বারা শির্কের অপরাধকে সবচেয়ে বড় আপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সাথে পিতামাতার অবাধ্য হওয়াকে এর সাথে শামিল করে এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এটাকে কবীরা গুণাহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিত পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে তাদের হক আদায় করা এবং এ প্রকারে কবীরা গুণাহ্ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। এ পর্যায়ে পিতামাতার হক সহ পিতামাতার অবাধ্যতার স্বরূপ এবং তার পরিণাম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হল।

### পিতামাতার হক:

"আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে

**কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারন করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"**

আল-কোরআন, সুরা লোকমান(৩১), আয়াত- ১৪

আল্লাহর ইচ্ছায় পিতামাতার মাধ্যমেই মানুষ অস্তিত্বে এসে থাকে। জননী নয়মাস গর্ভে ধারন করে সন্তানের রক্ষনাবেক্ষণ করেন এবং এর জন্য অসাধারন ত্যাগ ও ক্রমবর্ধমান অবর্ননীয় দু:খ-কষ্ট বরদাশত করে থাকেন। মায়ের অসহ্য প্রসব যন্ত্রনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট হবার পর সন্তান পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখতে সক্ষম হয়। তখন সন্তান থাকে সম্পূর্ন অসহায় এবং জননীর মুখাপেক্ষী। মাতা তাকে স্তন্য দান এবং লালন-পালনের কঠিন ঝামেলা ও অবর্ণণীয় দুখ-কষ্ট পোহায়ে আস্তে আস্তে বড় করে তোলেন। সন্তানের অসুস্থতায় মাতা নিরবে চোখের অশ্রু ফেলেন আর গভীর সোহাগে বুকে আগলে রাখেন। পিতা সন্তানের জন্য পরিশ্রমলব্ধ অর্থ খরচ করেন এবং আদর-সোহাগ আর স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাকে মানুষ করেন। পিতামাতা তাদের সাধ্যাতীত পরিশ্রমের মাধ্যমে সন্তানের হক আদায় করে থাকেন। এর বিনিময়ে সন্তানের দিক থেকে পিতামাতার প্রতি হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক সন্তানকে আল্লাহর প্রতি এবং সেই সাথে তার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার নির্দেশ দান করেছেন। সন্তান পিতামাতাকে মান্য করবে, সর্বাবস্থায় তাদের আনুগত্য করবে ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং সেই সাথে বিনয়াবনত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করবে- এ হক প্রত্যেক পিতামাতারই প্রাপ্য। সুতরাং পিতামাতার যথাযথ হক আদায় করা প্রত্যেক সন্তানেরই অবশ্য করণীয়।

### পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

**"তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্যকারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে বিরক্তিসূচক 'উফ' শব্দটিও বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো: 'হে আমার পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন'।"**

আল-কোরআন, সুরা বানি ইসরাঈল(১৭), আয়াত- ২৩,২৪

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, **প্রথমতঃ** শিরক বর্জিত আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং **দ্বিতীয়তঃ** পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য। একই সাথে দু'টি নির্দেশ দানের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষকে জানাতে চেয়েছেন যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পিতামাতার আনুগত্য করা। পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাযত্ন করা কোন অবস্থাতেই বয়সের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং পিতামাতার সব বয়সেই তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। তবে এখানে পিতামাতার

বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কথা বিশেষত উল্লেখ করা হয়েছে এ কারনে যে, এ বয়সে পিতামাতার শারীরিক অক্ষমতা এসে যায় এবং সন্তানের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সন্তান যেরূপ শৈশবে পিতামাতার মুখাপেক্ষী ছিল আজ তারা তেমনি সন্তানের মুখাপেক্ষী। শৈশবের স্মৃতি স্মরণ রেখে সে ঋণ শোধ করার প্রচেষ্টা সকল সন্তানেরই করা উচিত। পিতামাতা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েস ও কামনা-বাসনা সন্তানের জন্য কোরবান করেছিল, আজ তাদের বার্ধ্যকে সন্তানের পক্ষ থেকে পিতামাতার সে ঋণ শোধ করার সময় এসেছে। আলোচ্য আয়াত সমূহে এ সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছেঃ

**প্রথমতঃ** 'উফ' না বলা; এখানে উফ দ্বারা বিরক্তি প্রকাশক শব্দ উচ্চারণ বা ভঙ্গিমা প্রদর্শন করাকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি তাদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ফেলাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিরক্তিসূচক কোন কথা, কাজ বা আচরণ দিয়ে পিতামাতার মনে কষ্ট বা আঘাত না দেওয়ার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে।

**দ্বিতীয়তঃ** ধমক না দেয়া; ধমকের সুরে বা ধমকের ভঙ্গিমায় পিতামাতার সাথে কথা বলা বা তাদের ভৎর্সনা করা অন্যায়। এ ধরনের আচরণ যে কত কষ্টের কারণ, তা বলাই বাহুল্য। পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব আচরণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

**তৃতীয়তঃ** সম্মান করা; এ আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতামাতার সাথে কথা বলা ও আচার-আচরণের আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র সুরে কথা বলার উপদেশ দেয়া হয়েছে। যে কাজ করলে পিতামাতা সন্তুষ্ট থাকে সে কাজ করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে। সদাচরণের সাথে সাথে অসহায় পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা করা, সকল প্রকার প্রয়োজন পুরা করা সহ অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগীতা দান করাও সন্তানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

**চতুর্থতঃ** অনুকম্পায় বিনয়াবনত থাকা; এ দ্বারা সকল আচার-আচরণ বিনয়, আন্তরিকতা, মমতা ও আদবের সাথে সম্পাদন করা এবং সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য বলে বুঝানো হয়েছে। পিতামাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে নিজেকে প্রকাশ করাই সত্যিকারের মহব্বত ও অনুকম্পা।

**পঞ্চমতঃ** পিতামাতার জীবিতবস্থায় এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও দোয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি এহসান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আল্লাহ্ নিজেই এ দোয়াটি শিখিয়ে দিয়েছেন: **'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি রহম করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।**

আল্লাহ্ আমাদের জীবন দান করেছেন আর পিতামাতার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর আলো দেখতে সক্ষম হয়েছি। মা শিশু অবস্থায় লালন-পালন করেছেন, শৈশবে আগলে রেখেছেন নানা প্রতিকূলতা হতে আর বাবা দিয়েছেন সহযোগীতা। আর বাবা যৌবন অবধি সর্বপ্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। তাই পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত সারা জীবন কঠোর সাধনা করেও পিতামাতার এহসানের পুরো হক আদায় করা একজন সন্তানের পক্ষে সম্ভব হয়না। এ

সম্পর্কিত একটি হাদিস এখানে প্রণিধানযোগ্য। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"কোন উপায়েই সন্তান নিজ পিতার সম্পূর্ণ অধিকার আদায় করতে পারে না। তবে যদি সে তার পিতাকে দাস অবস্থায় পায় এবং তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়, তাহলে কিছুটা অধিকার আদায় হয়।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ; নং ১৮৫৬

**কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার আনুগত্য করা জায়েয নয়:**

**"পিতামাতা যদি তোমাকে আমার (আল্লাহর) সাথে এমন কিছুকে শরীক স্থীর করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে।"**

আল-কোরআন, সুরা লোকমান(৩১), আয়াত- ১৫

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে সর্বাবস্থায় পিতামাতার আনুগত্য করা সন্তানের অবশ্য করণীয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এর একটি ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। যদি পিতামাতা কোন কিছুকে আল্লাহর অংশী স্থাপন করতে বলে বা সন্তানের উপর বল প্রয়োগ করে, তবে তাদের এ আদেশ কোন অবস্থাতেই মান্য করা জায়েয নয়। শির্ক চরম জুলুম। তাই সর্বাবস্থায়ই শির্ক পরিত্যাজ্য। এটা এমন মারাত্মক অপরাধ যে পিতামাতার জোর-জবরদস্তিতেও তা জায়েয হয়না। অর্থাৎ যদি কারো পিতামাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনের জন্য বাধ্য করতে থাকেন এমনকি অত্যাচারও করেন তবুও পিতামাতার এ আদেশ মান্য করা যাবে না; এটাই আল্লাহর আদেশ। এর সাথে এটাও পরিস্কার হয়ে গেল যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এমন কারো আদেশ, হোক সে পিতা বা মাতা বা অন্য কেউ, পালন করা বৈধ নয়। আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কোন কাজ অন্য কারো নির্দেশে পালন করা জায়েয নয়; উপরন্তু তা গুণাহের কাজ। তাই আল্লাহর বিরোধীতা করা হয় এমন আদেশ ছাড়া পিতামাতার অন্য সকল আদেশ মান্য করতে সন্তান বাধ্য। সেক্ষেত্রে যদি পিতামাতা সন্তানের উপর কোন যুলুমও করে, তবুও সন্তানের পক্ষে তাদের অবাধ্য হবার কোন উপায় নেই। কেননা পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহনের অধিকার সন্তানের নেই। সারকথা এই যে, পিতামাতার পক্ষ থেকে শির্ক সহ শরীয়ত পরিপন্থী যে কোন আদেশ পালনে বাধ্য করার চেষ্টা করা হলে সন্তানকে সে আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে হবে আদবের সাথে অর্থাৎ সে আদেশ পালন করা থেকে বিরত থাকতে হবে কিন্তু চরমপন্থী হওয়া যাবে না। এ ছাড়া পিতামাতার অন্য সকল আদেশ-নিষেধ সন্তান বিনা দ্বিধায় মেনে নিবে এবং তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে।

**পিতামাতার আনুগত্যের ফযীলত:**

পিতামাতার খিদমত করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং পিতামাতা অখুশী থাকলে আল্লাহ্ও অখুশী হন। পিতামাতার এহসানকারীদের জন্য জান্নাত হাসিল করা সহজ হয়ে যায়। পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য পিতামাতার আনুগত্য ছাড়া গত্যান্তর নেই। পিতামাতার আনুগত্যের ফজিলত সম্পর্কে আনেকগুলি সহীহ্ হাদিস বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"পিতার আনুগত্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার নারাজিতেই আল্লাহর নারাজি।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ নং ১৮৪৮

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"তোমরা নিজ পিতা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না, যে ব্যক্তি তার পিতা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে কাফির।"**

হাদিস, মুসলিম শরীফ নং ১২২

আবু দারদা (রাঃ) বলেন যে, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

**"পিতা হলেন বেহেশতের সর্বোত্তম দরজা, তুমি চাইলে একে ভেঙ্গেও ফেলতে পার অথবা এর হেফাযত করতে পার।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ নং ১৮৪৯

হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাযাহ্ বর্ণনা করেছেন যে,

একব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল,

> **"সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি?"**

তিনি বললেন,

> **"তারা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে তাদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাদের সাথে বেআদবি ও তাদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।"**

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৫

**পিতামাতার নাফরমানীর স্বরূপ এবং এর সম্ভাব্য কারণ:**

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তাদের সাথে উদ্ধত আচরণ করা, ধমক দেয়া, গালাগাল দেয়া, তাদের সেবা-যত্নে কার্পণ্য করা, তাদেরকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়া সহ সকল প্রকার মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন পিতামাতার নাফরমানীর অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ে মাতাপিতার অবাধ্যতার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

- পিতামাতা সন্তানের কাছে প্রয়োজনীয় কিছু চেয়েছেন; অথচ সে তাদের উক্ত চাহিদা পূরণ করেনি।
- পিতামাতা সন্তানের ব্যপারে কোন কসম খেয়েছেন; অথচ সে তাদের উক্ত কসমটি রক্ষা করেনি।
- পিতামাতা সন্তানের কাছে কিছু আশা করেছেন; অথচ সে তাদের উক্ত আশা ভঙ্গ করেছে।
- পিতামাতা সন্তানকে কোন বৈধ কাজের আদেশ করেছেন; অথচ সে তাদের উক্ত আদেশটি মান্য করেনি। যেমন: পিতামাতার অসম্মতিতে সন্তানের খেয়াল-খুশীমত কাউকে বিবাহ করে নিয়েছে ইত্যাদি।
- বিবাহের পরে পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে তাদের অমতে আলাদা সংসারে বসবাস করছে এবং পিতামাতার দেখা-শুনা করছে না।
- পিতামাতার অসম্মান করা, কারো নিকট পিতামাতার গীবত করা বা তাদের দোষ চর্চা করা।
- পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা, ধমক দিয়ে কথা বলা, তর্ক করা, ঝগড়া-ঝাটি করা বা তাদেরকে গালাগাল করা, নির্যাতন করা বা মারধোর করা। পিতামাতার মনে কোনরূপ কষ্ট দেয়া।
- পিতামাতার খিদমত না করা বিশেষত পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় তাদের দেখা-শুনা না করা বা খোঁজ-খবর না নেওয়া, তাদের পরিত্যাগ করা, তাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া বা তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া।
- পিতামাতার সাথে বিনয় ও নম্রভাবে কথা না বলা।
- পিতামাতার সাথে শালীন ব্যবহার না করা।
- নিজের প্রয়োজনকে পিতামাতার প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া।
- পিতামাতার সাথে ঘনিষ্ট না হওয়া, তাদের কাছে না আসা, পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা না করা, তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছু জানতে না চাওয়া। এভাবে পিতামাতার নাফরমানীর আরো অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়।

বস্তুতঃ পিতামাতাকে সম্মান করা এবং সর্বাবস্থায় তাদের মর্যাদা রক্ষা করে চলা প্রত্যেক সন্তানের জন্যই অপরিহার্য। কোন সন্তানের পক্ষে এমন কোন কাজ বা আচরণ করা সমীচীন নহে যাতে তার পিতামাতার মান-সম্মান ক্ষুন্ন হতে পারে। প্রত্যেক পিতামাতারই একটি সামাজিক

www.waytojannah.com

অবস্থান তথা মর্যাদা রয়েছে। সন্তান যখন বিপথগামী হয়ে যায় তখন তাদের সে মর্যাদার আসন টুটে যায় এবং তারা হেনস্থ হন। নেশা করা, চুরি করা, মেয়েদের উত্তক্ত করা, অবৈধ প্রণয় স্থাপন করা সহ যাবতীয় অসামাজিক কাজগুলি শরিয়ত অসমর্থিত এবং অবৈধ কাজ। সন্তান যখন এ ধরনের অসামাজিক এবং অবাঞ্চিত কাজে রত থাকে তখন পিতামাতারই বদনাম হয় এবং তাদের মর্যাদা ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়- যেটা প্রকারান্তে পিতামাতার অসম্মান করা এবং তাদের অবাধ্যতার শামিল।

তবে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এটা অনুমেয় যে, একজন সন্তান তার পিতামাতার অবাধ্য হতে পারে না। কিন্তু এ ধারণার সাথে বাস্তবতার অনেক অমিল দেখা যায়। সামর্থ্যবান সন্তানের জন্ম দিয়েও একজন পিতা বা মাতা বৃদ্ধাশ্রমে দিন কাটাচ্ছেন; এটা সন্তানের নাফরমানীর কঠিন বাস্তবতা নয় কি? এ ছাড়াও পিতামাতার প্রতি সন্তানের অবহেলার আরো অনেক করুণ চিত্র আমাদের সমাজে বিদ্যমান আছে। সামর্থ্যবান সন্তানের জনক হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জীবন কাটানো, সন্তানের নির্যাতনের শিকার হয়ে ফুটপাতে কাল যাপন, কখনওবা নিজের সংসারে সন্তানের দাসী-বাদী হয়ে জীবন কাটানো আবার অধিকার বঞ্চিত হয়ে অন্যের কাছে ধর্ণা দেয়া সহ সমাজের অনেক ঘটনাই পিতামাতার অবাধ্যতার বাস্তব চিত্র। কিন্তু কেন এ অবহেলা, কেন এ নাফরমানী? একটু চিন্তা করলেই আমরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব এবং এর পিছনের কারণগুলিও উৎঘাটন করতে পারব। সাধারণতঃ যে সকল কারনে এ অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার মধ্যে রয়েছে:

ক) ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞতা
খ) অবাঞ্চিত প্রণয়-ভালবাসা
গ) সামাজিক অবক্ষয়
ঘ) অপসংস্কৃতির বিস্তার
ঙ) অসৎ সঙ্গ ও মাদকাসক্তি
চ) স্ত্রী বা তৃতীয় অপশক্তির প্রভাব
ছ) সম্পদের মোহ
জ) সন্তানের প্রতি পিতামাতার অতিরিক্ত স্নেহ-ভালবাসা।
ঝ) পিতা মাতা তাদের পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।

**ধর্মীয় জ্ঞান:** ধর্মীয় জ্ঞান বা শরিয়ত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। কেননা কেবলমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানই মানুষের বিবেককে কলুষমুক্ত করে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে এবং সকল অপরাধ থেকে পবিত্র রাখতে সহায়তা করতে পারে। আর সঠিক জ্ঞানের অভাবে মানুষ অনেক অন্যায় করে বসে। মানুষ যখন অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে তখন সে অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তাই বিষয় ভিত্তিক ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের বিকল্প নেই। পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তা অবহেলার শাস্তি সম্পর্কিত ধর্মীয় বিধান

জানা থাকলে পিতামাতার নাফরমানীর মত কঠিন অপরাধগুলো বহুলাংশে হ্রাস পেত। তাই সকলেরই উচিত কিশোর বয়স থেকেই তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সেই সাথে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের সাথে সদাচারণ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে সচেতন করা।

**অবাঞ্ছিত প্রণয়-ভালবাসা:** সন্তানের অবাঞ্ছিত প্রণয়-ভালবাসা যে কত বাবা-মায়ের জীবনে অশান্তি ডেকে এনেছে, কত সংসার ভেঙ্গেছে তার হিসেব কে রাখে? প্রগতি আর আধুনিকতার নামে সমাজে আমরা কি দেখছি? সন্তানের ধারনা জীবন-সংগী নির্বাচনে তার একচেটিয়া অধিকার। সেখানে পিতামাতার মতামতের কোন মূল্যায়ণই করা হয়না। তাই বাবামার সারা জীবনের সাধনাকে, তাদের নির্মল হৃদয়ের বাসনাকে নিস্পেষিত করে সন্তান নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সদা ব্যস্ত। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার টানা-পোড়াণে এক পর্যায়ে শুভকাজটি সম্পন্ন হলেও এর পরিনাম দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষ আর কলহ। আর এটা নিশ্চয়ই পিতামাতার অবাধ্যতার একটি ফসল। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সন্তানকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং পিতামাতার প্রাপ্য হক আদায় করতে হবে।

**সামাজিক অবক্ষয়:** বর্তমান সমাজের বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সকল প্রকার অপরাধ প্রবনতা ক্রমাগত আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে পিতামাতার নাফরমানী কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সন্তানের শৈশব কাল থেকেই উশৃংখল সন্তানকে পিতামাতার শাসন না করা বা তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা না দেওয়ার ফলেও এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তবে সুষ্ঠ সমাজ ব্যাবস্থাপনা ও নৈতিক উন্নয়ণ অপরাধ প্রবণতাকে অনেকাংশে হ্রাস করতে সহায়ক হবে বলে মনে হয়।

**অপসংস্কৃতির প্রসার:** মিডিয়ার বদৌলতে পশ্চিমা তথা বিদেশী সংস্কৃতি সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে। মানুষ নিজস্বতা ভুলে গিয়ে অপসংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিতেই বেশি উৎসাহী। এর প্রভাবে প্রগতির দোহাই দিয়ে সংসার ভাঙ্গা হচ্ছে, সন্তান বাবামায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পরিনামে পিতামাতার নাফরমানীতে লিপ্ত হচ্ছে। এ অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রেহাই পেতে মিডিয়া সিলেকশন অত্যন্ত জরুরী।

**অসৎ সঙ্গ ও মাদক সেবন:** পারিবারিক তথা সামাজিক বিশৃংখলার একটি অন্যতম প্রধান কারণ মাদকাসক্তি। মাদক মানুষের সুক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা লোপ করে দেয়। তখন মানুষ সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় তথা ভুল-শুদ্ধ পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেই সাথে সে নিজের অধিকার, কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পরে এবং নানা প্রকার অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায়। এভাবে সর্বনাশা মাদক সমাজের কিশোর ও যুব সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পারিবারিক অশান্তি, দ্বন্দ-কলহ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সহিংসতা সহ প্রায় সকল অপরাধের সাথেই মাদকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। মাদকের নিষ্ঠুর ছোঁবল এভাবেই একজন সন্তানকে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে নাফরমান বানিয়ে দেয়। মাদকাসক্তির শুরুটা সাধারণত কিশোর বয়স থেকেই হয়ে থাকে। সন্তান যখন বাবামার স্নেহের গণ্ডী পেরিয়ে সমাজের অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিশতে শুরু করে তখনই কিছু অসৎ-সংগীর কবলে পড়ে গাঁজা,

ফেন্সীডিল, হেরোইন, মদ সহ বিভিন্ন প্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্যের সাথে পরিচিত হয়। প্রথমে সখ বা কৌতুহল বসে এবং পর্যায়ক্রমে পুরোপুরি নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গদোষই যেহেতু মাদকাসক্তির সূত্রপাতের মূল কারণ, তাই অসৎ-সংগীদের থেকে এড়িয়ে চলাটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এক্ষেত্রে পিতামাতাকেই শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে। তাদেরকে সন্তানের প্রতি সার্বক্ষণিক নজরদারি করতে হবে যাতে তারা অসৎ সংগীদের সাথে মিশে নেশার জগতে পা রাখতে না পারে। এর সুফল পরিনামে বাবামাই ভোগ করবে কারণ সন্তানের পক্ষ থেকে নেশার কারনে উদ্ভুত অবাধ্যতার সম্ভাবনা কমে যাবে।

**তৃতীয় অপশক্তি এবং স্ত্রীর প্ররোচনা:** সন্তান অনেক সময় তৃতীয় কোন শক্তির অনুপ্রেরণা বা প্ররোচনায় পড়ে পিতামাতার অবাধ্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকা সর্বাধিক বলেই সমাজে পরিলক্ষিত হয়। বউ-শাশুড়ির কলহ নতুন কোন ঘটনা নয় এবং এটা সমাজের সর্বস্তরেই কম-বেশি বিদ্যমান আছে। প্রগতিশীল বউয়েরা আধুনিকতার নামে সেকেলে শাশুড়িদের সহজে মেনে নিতে পারে না। তারা মায়ার জালে বশঃ করে স্বামীকে বিদ্রোহী করে তোলে এবং পিতামাতার অবাধ্য হতে বাধ্য করে। এক পর্যায়ে পরিবারে সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি হয় এবং পরিনতিতে অবাধ্যতার চরম পর্যয়ে পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। এক্ষেত্রে তৃতীয় কারো যেমন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা সংগী-সাথীদের ইন্ধন থাকাটাও খুব স্বাভাবিক। কোন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য, অন্যের ভাল দেখতে না পারার অভ্যাসগত কারনে বা নিছক মজা করার কারনে ইন্ধনদাতা এ ধরনের অপশক্তির প্রয়োগ করে থাকে। এমন হতে পারে বিরাজমান পারিবারিক দ্বন্দ-কলহের জের ধরে প্রতিশোধের নিমিত্তে প্রতিপক্ষ শত্রুর সন্তানকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকবে। বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দিয়ে পিতার বিরুদ্ধে সন্তানকে খেপিয়ে দিয়ে অবাধ্যতার শিকারে পরিণত করতে পারে। মূর্খ সন্তানও বিপক্ষের সহযোগীতা দিয়ে নিজের পিতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে যায়। এই অশুভ শক্তির প্রভাবে অনেক বড় ধরনের ক্ষতি সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন পিতামাতার নাফরমানী করার সকল অপরাধ সন্তানের উপরেই বর্তাবে।

**ব্যক্তিস্বার্থ ও সম্পদের মোহ:** সম্পদের মোহ মানুষকে অমানুষ করে দেয়। সম্পদের মোহে মানুষ নানা প্রকার সামাজিক অপরাধ করতে দ্বিধা বোধ করে না। ব্যক্তিস্বার্থ মানুষকে এমন পর্যায়ে উপনীত করে যে পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, সংসারে ভাঙ্গন ধরানো সহ পিতামাতাকে অস্বীকার করতেও তাদের মন টলে না। শুধু তাই নয়, মোহ এবং স্বার্থের চরম পর্যায়ে সন্তান কর্তৃক জন্মদাতা পিতাকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলার ঘটনাও সমাজে বিরল নহে। কিন্তু এ স্বার্থ ও মোহের পিছনের কারণ কি ? এর পিছনে উচ্চাভিলাষী স্ত্রীর চাহিদা পূরণ, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা, অন্যদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার শিকার হওয়া, সম্পদের মাধ্যমে সুখ সন্ধানের ভ্রম প্রচেষ্টা ইত্যাদি সহ আরো অনেক কারণ থাকতে পারে।

**পিতামাতার অতিরিক্ত স্নেহ-ভালবাসা:** সন্তানদের যদি কোন প্রকার শাসন না করা হয় আর মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ-ভালবাসা দেয়া হয় তাহলে সে সন্তান লাই পেয়ে মাথায় উঠে যায় এবং যা খুশী তাই করে বেড়ায়। এভাবে এক সময় সে পিতামাতার অবাধ্য হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক

সময় এর উল্টোটাও হতে দেখা যায়; অতিরিক্ত শাসনের ফলেও সন্তান বেপরোয়া হয়ে ওঠে পিতামাতার অবাধ্য হয়ে যায়।

**পিতামাতা তাদের পিতামাতার অবাধ্য হওয়া:** পিতামাতা যদি তাদের পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে আর তা যদি কোন সন্তান প্রত্যক্ষ করে তবে সে সন্তান নিশ্চিত এটা আয়ত্ব করবে। প্রতিদানে ঐ সন্তান তার পিতামাতার সাথেও এই একই ধরণের আচরণ করবে এবং তাদেরকেও কষ্ট দেবে। আপনি আপনার পিতামাতার সাথে যেরূপ আচরণ করেছেন আপনার সন্তানও আপনার সাথে তদ্রূপ আচরণ করবে বলে আপনাকে জেনে রাখতে হবে। এটাই জীবনের স্বাভাবিক চলমান গতি।

**পিতামাতার অবাধ্যতার অপকারীতা:** পিতামাতার অবাধ্যতার অপকারীতা সন্তানকে অনেকাংশে ইহকালেই ভোগ করতে হবে। নিম্নে এর কিছু অপকারিতার বিষয় তুলে ধরা হল:

১. **পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তির রিযিক সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোন বরকত হয় না।**
২. **পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। প্রভুর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আর তাঁর অসন্তুষ্টি তাদের অসন্তুষ্টির মধ্যে।**
৩. **পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হবে অথবা হওয়া স্বাভাবিক।**
৪. **পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি যখন তার অপরাধের কথা বুঝতে পারবে তখন সে চরমভাবে লজ্জিত হবে। তার বিবেক সর্বদা তাকে দংশন করতে থাকবে। কিন্তু তখন এ লজ্জা আর কোন কাজে আসবে না।**
৫. **কোন সন্তান তার পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তার পিতামাতা তাকে কোন বদদোআ বা অভিশাপ দিলে তা তার সমূহ অকল্যান বয়ে আনবে। সন্তানের জন্য পিতামাতার দোআ কখনো না-মঞ্জুর হয় না।**

**পিতামাতার অবাধ্যতার পরিণতি:** পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। পরকালে তাকে ভোগ করতে হবে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“যে উপকার করে খোঁটা দেয়, আর যে মাতাপিতার অবাধ্য হয় আর যে সদা শরাব পান করে, এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”**

হাদিস, সুনানু নাসাঈ শরীফ, নং ৫৬৭৫

**সন্তান যখন অবাধ্য তখন পিতামাতার অন্তরের অবস্থা কি?:**

পিতামাতার অন্তর অত্যন্ত কোমল। সন্তান অবাধ্য হলেও পিতামাতার পক্ষে কখনও সম্ভব নয় মন থেকে তাদের স্মৃতি মুছে ফেলা। সন্তানের অবাধ্যতা তাদের কষ্ট দেয় আর ব্যাথায় বুক ভারী হয়ে

থাকে। তারা নিরবে নিভৃতে ডুকরে ডুকরে কাঁদে সন্তানের জন্য। তাদের এ কান্না কি সন্তানের কানে পৌঁছে বা তাদের হৃদয়ে এতটুকু অনুভুতির জন্ম দেয়? সন্তানের অবাধ্যতা পিতা-মাতার হৃদয়ে যে কতটা আঘাত হানতে পারে তার কিছুটা নমুনা আমরা দেখতে পাব এক অবাধ্য সন্তানের হতভাগ্য পিতার মুখে আওরানো একটি কবিতার লাইনে। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় জনৈক আরবীয় সন্তানের অবাধ্যতায় মর্মাহত হয়ে ছেলের উদ্দ্যেশে নবীজির সম্মুখে তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের করুণ অভিব্যক্তি কবিতার ছন্দে প্রকাশ করেছেন এভাবেঃ

আমি তোমাকে শৈশবে খাদ্য দিয়েছি এবং যৌবনেও তোমার দায়িত্ব বহন করেছি।
তোমার যাবতীয় খাওয়া-পড়া আমারই উপার্জন থেকে ছিল।
কোনো রাতে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পরেছ, তখন আমি সারা রাত
তোমার অসুস্থতার কারনে জেগে কাটিয়েছি;
যেন তোমার রোগ আমাকেই স্পর্শ করেছে- তোমাকে নয়।
ফলে আমি সারারাত ক্রন্দন করেছি।
আমার অন্তর তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হত; অথচ আমি জানতাম যে,
মৃত্যুর দিন নির্দিষ্ট রয়েছে-আগে-পিছে হতে পারবে না।
অতঃপর যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ এবং আমার আকাঙ্খিত বয়সের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছ;
তখন তুমি কঠোরতা ও রূঢ় ভাষাকে আমার প্রতিদান করে দিয়েছ,
যেন তুমিই আমার প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করতে!
আফসোস! যদি তোমার দ্বারা আমার পিতৃত্বের হক আদায় না হয়,
তবে কমপক্ষে ততটুকুই করতে যতটুকু একজন ভদ্র প্রতিবেশী করে থাকে।
তুমি কমপক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তো দিতে এবং
স্বয়ং আমারই অর্থ-সম্পদে আমার বেলায় কৃপণতা না করতে।

কবিতাটির মধ্যেদিয়ে অসহায় বৃদ্ধ পিতার ব্যাথিত হৃদয়ের করুণ চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এটা যেন তার একার ব্যাথা নয়, সন্তান কর্তৃক অবহেলিত ও লাঞ্চিত সকল পিতা-মাতারই ব্যথিত হৃদয়ের করুণ অভিব্যক্তি।

## আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা

## (Cutting off the Ties of Relationship)

**"ক্ষমতায় অধিষ্ঠত হলে সম্ভবতঃ তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ এদেরকেই লানত করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিহীন।"**

আল-কোরআন, সুরা মুহাম্মদ(৪৭), আয়াত-২২,২৩

এ আয়াতে ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; **প্রথমতঃ** বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং **দ্বিতীয়তঃ** আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। প্রাসংঙ্গিক কারণে আমাদের আলোচনা এখানে দ্বিতীয় বিষয়টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য জোর তাকীদ রয়েছে। আত্মীয়তার বন্ধন আল্লাহই সৃষ্টি করেন। মানুষের সাধ্য কি যে সে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়াস পায়? তবুও এ ধরনের আচরণ থেকে মানুষ বিরত নেই। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার প্রচেষ্টা সাধারণত সবলদের বা ক্ষমতাবানদের পক্ষ থেকে দুর্বলের উপরই হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। সম্পর্ক ছিন্নকারীর প্রতি আল্লাহ্ লানত করেছেন এবং কঠিন শাস্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

**আত্মীয়ের হক:** বিশেষজ্ঞ ইসলামী পন্ডিতগণের মতে এখানে আত্মীয় বলতে রক্ত-সর্ম্পকের আত্মীয়দেরকে বুঝান হয়েছে। আত্মীয়ের হক আদায় করা অত্যন্ত জরুরী। আত্মীয়ের সর্বপ্রথম হক হচ্ছে অত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ঈমানের একটি বাহ্যিক পরিচয়। এ বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে, তিনি বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।"**

বোখারীর রেওয়াতে ইমাম আয্যাহাবী (রহ)

সুতরাং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আত্মীয়ের হক আদায় করা অতি আবশ্যক। তবে আত্মীয়ের হক বলতে আমরা কি বুঝি বা আত্মীয়ের কি ধরনের হক রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা থাকা দরকার। সংক্ষেপে বলতে গেলে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার জন্য যা যা করণীয় তা সবই আত্মীয়ের হক। আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের বিপদে-আপদে সহযোগীতা করা, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা প্রদর্শন করা ও খোঁজ-খবর নেয়া, প্রয়োজনের সময় বা সংকটের সময় তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা ইত্যাদি সকল কিছুই আত্মীয়ের হকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

**আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা:**

আত্মীয়ের হক আদায় না করাই মূলতঃ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার শামিল। উপরন্তু আত্মীয়ের সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাদের কষ্ট দেয়া, তাদের সাথে অহংকার করা এবং সুসম্পর্ক বজায় না রাখা, তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা, তাদের সাথে মনমালিন্য করা, তাদের গালাগাল দেওয়া, তাদের আত্মীয় বলে পরিচয় না দেয়া, তাদের সাথে যোগাযোগ না রাখা, তাদের বিপদের দিনে সহযোগীতা না করে তাড়িয়ে দেওয়া সহ সকল প্রকার অসদাচরণই আত্মীয়তার হক নষ্ট করার মধ্যে গণ্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বুঝায়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কোন আবস্থাতেই বৈধ নয়। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। হযরত উক্বাহ বিন আমীর ও হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

**"আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ ওর সাথে যে তোমার সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, দাও ওকে যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে এবং যালিমের পাশ কেটে যাও তথা তাকে ক্ষমা কর।"**

হাদিস, আহম্মদ; নং ১৭৩৭২

কেউ কেউ মনে করেন, আত্মীয়-স্বজনেরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা জায়েয। বস্ততঃ ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়; বরং আত্মীয়েরা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করার পরও আপনি যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার দেখান তখনই আপনি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছেন বলে প্রমাণিত হবে। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক আদায়কারী সে ব্যক্তি যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"**

হাদিস, সহীহ্ বোখারী শরীফ; নং ৫৫৬৫

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী আত্মীয়ের সাথেও সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত রাখা উৎকৃষ্ট আমল। একটি হাদিসে হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

একটি লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে বলল,

**"হে আল্লাহর রাসূল** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! **আমার কতক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখি কিন্তু তারা আমার সাথে তা ছিন্ন করে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় আমি কি তাদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করব?"**

তিনি জবাবে বললেন,

**"না, তুমি বরং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখবে।"**

তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪৭।

**আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফজিলত:** আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে নিহিত রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন বহুবিধ কল্যাণ। এর ফজিলত ও উপকারীতা সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

১। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে জান্নাত অতি নিকটবর্তী ও জাহান্নাম দূরবর্তী হয়ে যায়। একটি হাদিসে আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

একব্যক্তি বললো,

**"ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বললেন,

**"তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে।**

হাদিস, সহীহ্ বোখারী শরীফ; নং ৫৫৫৭

২। আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কার সাধ্য সে সম্পর্ককে ছিন্ন করে? বস্তুতঃ যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ্ তার সাথে রহমতের সম্পর্ক বজায় রাখেন; কিন্তু যে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। একটি হাদিসে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

**"পরিপূর্ণ কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমিই আল্লাহ্ এবং আমিই রহমান। আমিই অত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে নির্গত করে এই নাম (রহমান থেকে রেহেম) রেখেছি। যে বাক্তি এই সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব।"**

হাদিস, সহীহ্ তিরমিযী শরীফ; নং ১৮৫৭

৩। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি দুনিয়াতেও প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। তার রিযিক ও হায়াতে বরকত হবে। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে ।”**

হাদিস, সহীহ্ বোখারী শরীফ; নং ৫৫৬০

৪। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং মানুষের পেরেশানি অনেকাংশে কমে যায়।

**আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পরিণতি:**

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা মহাপাপ। এ সম্পর্ক ছিন্নকারীর শাস্তিও ভয়াবহ। আলোচনার শুরুতেই সুরা মোহাম্মদের ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর প্রতি আল্লাহ্ লানত বর্ষণ করেন।

আল্লাহ্ তা’আলা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখেরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস। হাদিস থেকে জানা যায় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জোবায়ের ইবনে মোতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

**“আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”**

হাদিস, সহীহ্ বোখারী শরীফ; নং ৫৫৫৮

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর নেক আমল আল্লাহ্ তা’আলার কাছে গৃহীত হয়না। একটি হাদিসে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**“আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ্ তা’আলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর আমল গ্রহন করা হয় না।”**

হাদিস, আহমাদ; নং ১০২৭৭

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণার্জনের জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অতি সহজেই অনুমেয়। তাই আসুন ভাঙ্গনের খেলা না খেলে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার প্রচেষ্টায় সচেষ্ট থাকি এবং উভয় জাহানের কল্যাণ লাভে ধন্য হই।

## প্রতিবেশীর ক্ষতি করা

## (Harming Neighbors)

প্রতিবেশী অর্থ পড়শী। কাছাকাছি বসবাসকারী বাসিন্দাদেরকে প্রতিবেশী বলা হয়। কারো বাসস্থানের নিকটবর্তী অবস্থানকারী ব্যক্তিই তার প্রতিবেশী। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে হিসেবে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিবেশী যখন সমাজেরই একটি অংশ তখন আপনা থেকেই প্রতিবেশীর প্রতি কিছু দায়িত্ব মানুষের উপর এসে বর্তায়।

**প্রতিবেশীর হক:**

একজন প্রতিবেশীর উপর তার অপর প্রতিবেশীর অনেক অধিকার রয়েছে। প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করা প্রত্যেক মানুষের নৈতিক তথা ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। একজন প্রতিবেশীর উপর তার অপর প্রতিবেশীর অধিকার হচ্ছে এই যে, উক্ত প্রতিবেশী যেন তার সাধ্যানুসারে তার ধনসম্পদ এবং মর্যাদা ও কল্যাণকারীতার মাধ্যমে তার সাথে সদ্ব্যবহার করে। প্রতিবেশীর আরও অধিকার এই যে, তাকে কথা ও কাজে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া থেকে সে নিজেকে বিরত রাখবে। প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে তাকে সাহায্য-সহযোগীতা করতে হবে। চাই সেটা আর্থিক সাহায্য হোক কিংবা শারীরিক শক্তি দ্বারা হোক আর উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা হোক বা সমবেদনা জানানোর মাধ্যমেই হোক। প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারের আরও একটি দিক হচ্ছে এই যে, তার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য বেশি বেশি করে উপহার উপঢৌকন পাঠাতে থাকবে এবং তাকে সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ধার দিতে কুণ্ঠিত হবে না। এছাড়াও নিজের বাগানের শাক-সবজী, ফল-মূল ইত্যাদি হাদিয়া স্বরূপ প্রতিবেশীকে পাঠানো যেতে পারে। বাসায় ভাল রান্না হলেও প্রতিবেশীকে তার কিছু অংশ দেওয়া যেতে পারে। প্রতিবেশীর সাথে বেশি বেশি সালাম বিণিময় করতে হবে। এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবেশীর হক আদায় করার প্রতি কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট তাকীদ রয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন,

**“তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা; এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীমগণ, মিসকিনগণ, সম্পর্কীয় ও সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী ও সহচর পথিক এবং তোমাদের অধিনস্থ দাসদাসীদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী আত্মভিমানীকে ভালবাসেন না।”**

আল-কোরআন, সুরা নেসা, আয়াত-৩৬

আলোচ্য আয়াতে প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দান করা হয়েছে। তারা আত্মীয় প্রতিবেশী হোক আর অনাত্মীয় প্রতিবেশী হোক, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, এসব বাছবিচার না

করে সকল প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দান করা হয়েছে। এর পক্ষে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“প্রতিবেশী তিন প্রকার রয়েছে (১) এক হক বিশিষ্ট (২) দুই হক বিশিষ্ট (৩) তিন হক বিশিষ্ট। এক হক বিশিষ্ট ঐ প্রতিবেশী যে মুশরিক এবং যার সাথে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। সে শুধু প্রতিবেশীর হক পাবে। দু’হক বিশিষ্ট ঐ প্রতিবেশী যে মুসলমান কিন্তু তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তার এক হক হলো ইসলামের হক এবং দ্বিতীয় হক হচ্ছে প্রতিবেশীর হক। তিন হক বিশিষ্ট ঐ প্রতিবেশী যে মুসলমান এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। কাজেই তার প্রথম হক হলো ইসলামের হক, দ্বিতীয় হক হলো প্রতিবেশীর হক এবং তৃতীয় হক হলো আত্মীয়তার হক।”**

তফসীর ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৫

একজন প্রতিবেশীর কি ধরনের হক রয়েছে সে সম্পর্কে ইমাম আয্যাহাবী (রাহঃ)-এর ‘কবীরা গুণাহ ও গীবত’ গ্রন্থে একটি হাদিসের উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত হয়েছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, **“প্রতিবেশীর অধিকার এটাই, সে যখন সাহায্য চাইবে তাকে সাহায্য করতে হবে, সে যখন ঋণ চাইবে তাকে ঋণ দিতে হবে। যখন সে কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হবে তখন তাকে তা দিতে হবে। যখন সে কল্যাণ লাভ করে, তখন তাকে অভিনন্দন জানাতে হবে, যখন সে বিপদে পড়ে তখন তাকে সমবেদনা জানাতে হবে ও সাধ্যমত সহযোগীতা করতে হবে, যখন সে মারা যাবে, তখন তার জানাযা পড়তে ও দাফন করতে কবরের কাছে যেতে হবে। তার অনুমতি ব্যতিরেকে উঁচু বাড়ী নির্মাণ করে বাতাস বন্ধ করা যাবে না। পাত্রে যে খাদ্য সামগ্রী রাখা হয়, তার ঘ্রাণ যদি সে পায়, তাহলে তা থেকে তাকে কিছু দিতে হবে, ফল কিনলে তাকে হাদিয়া পাঠাতে হবে, নতুবা তার খোসা বাইরে ফেলা যাবে না, যাতে সে দেখতে পায়।”**

শরিয়তে প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর গুরুত্ব বোঝা যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এত বেশী উপদেশ দেন যে, আমার মনে হয় যে অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।”**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-৫৫৯০

**প্রতিবেশীর হক আদায় না করার পরিণতি:** প্রতিবেশীর হক আদায় করা একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। প্রতিবেশীর প্রতি সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া খুব মহৎ কাজ, যদিও সে বিরোধী হয়।

www.waytojannah.com

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া নাজায়েয এবং শর'য়ী বিশেষজ্ঞদের মতে তা কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেশীর হক যথাযথ পালন না করা হলে যেমন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হয় তেমনি তার অনিষ্ট সাধন করে বা তার সাথে দুর্ব্যবহার করেও তাকে কষ্ট দেওয়া হতে পারে। যেমনঃ প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি বা ডাকাতি করা, প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করা ও অপবাদ আরোপ করা, প্রতিবেশীর জমি জবরদখল করা বা জোরজুলুম করা, প্রতিবেশীকে পথ না দেওয়া, উদ্বৃত্ত পানি প্রদানে বাধা দেওয়া, তাকে গালাগাল দেওয়া বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা ইত্যাদি নানাপ্রকারে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হতে পারে। কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া কারো পক্ষেই সমীচীন নয়। একজন মুমিন তার প্রতিবেশীর অনিষ্ট করতে পারে না বা তাকে কষ্টও দিতে পারে না। এ সম্পর্কে একাধিক হাদিস রয়েছে। একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-৫৫৯৩

আর একটি হাদিসে আবু শুরায়হ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা বলেছিলেন,

> **"আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে লোক মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে লোক মুমিন নয়।"**

জিজ্ঞাসা করা হলো,

> **"ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কে সে লোক?**

তিনি বললেন,

> **"যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকেনা।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-৫৫৯১

মুসলিম শরীফে অন্য একটি হাদিসে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে ব্যক্তির ক্ষতি হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে, সে বেহেশতে যাবে না।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং-৭৮

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আশাকরি উপরোক্ত হাদিস সমূহ থেকে এটা অত্যন্ত পরিস্কার হয়েছে যে, যে ব্যক্তির কু-কর্ম ও অন্যায় আচরণ থেকে তার প্রতিবেশী মুক্ত নয় সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না এবং সে জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। অনুতাপের বিষয় যে, বর্তমানে অনেক লোকই

প্রতিবেশীর অধিকারগুলোকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যত্নবান নয়, এমনকি তাদের প্রতিবেশীগণ তাদের অন্যায় আচরণের কারণে শান্তিতে বসবাসও করতে পারছে না। দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা সব সময়ই ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত রয়েছে এবং প্রতিবেশীকে কথা ও কাজে ব্যাথা দিচ্ছে। আর এরূপ আচরণ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুমের পরিপন্থী। তাই আসুন প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় ও অসদাচরণ থেকে বিরত থাকার চেষ্টায় ব্রত হই এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে কল্যাণার্জনে সচেষ্ট হই।

## ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা
## (Usurping the Property of Orphans)

ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বলতে বোঝায় নিজ জিম্মায় বা তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে হস্তগত করা বা জবরদখল করা। যার জিম্মায় ইয়াতীমের সম্পদ রয়েছে তার জন্য এ সম্পদের আমানতদারী সঠিক ও ন্যায়ানুগভাবে পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা একটি কবীরা গুণাহ। এটা কবীরা গুণাহ হওয়ার সপক্ষে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

**"ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। তাদের ভাল মালামালের সাথে তোমাদের খারাপ মালামালের বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রণ করে তা গ্রাস করো না; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর পাপ।"**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-২

উল্লিখিত আয়াতে ইয়াতীমদের অভিভাবকদের প্রতি ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা সহ তাদের সম্পদ আত্মসাৎ না করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। **প্রথমতঃ** ইয়াতীমদের প্রাপ্য সম্পদ পরিপূর্ণরূপে এবং যথাসময়ে তাদের নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ** ইয়াতীমদের উত্তম সম্পদের সাথে নিজেদের মন্দ সম্পদের অদল-বদল করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। **তৃতীয়তঃ** ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রণ করে অবৈধ পন্থায় তা ভোগ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ নির্দেশনার মাধ্যমে ইয়াতীমদের মালামাল ভক্ষণ বা দখল করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবং **সবশেষে** বলা হয়েছে যে, ইয়াতীমদের সম্পদ অপচয় ও আত্মসাৎ করা একটি গুরুতর পাপ। এ আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমানিত হয়েছে যে, ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভোগ করা বা আত্মস্থ করা কবীরা গুণাহ্।

### ইয়াতীম কারা?

ইয়াতীম আরবী শব্দ। ইয়াতীম শব্দের অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ। ইসলামের পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করেছে তাকে ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট বয়স সীমা পর্যন্ত সন্তান ইয়াতীম থাকে। সন্তান যখন প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়, তখন তাকে আর ইয়াতীম বলা হয়না। ইয়াতীম হতে পারে কন্যা সন্তান অথবা ছেলে সন্তান। ইয়াতীম বলার জন্য মূলত দু'টি শর্ত থাকা আবশ্যক; **প্রথমতঃ** পিতৃ বিয়োগ এবং **দ্বিতীয়তঃ** অপ্রাপ্ত বয়স। এক কথায় পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা বালিকা ইয়াতীম নামে অভিহিত।

**ইয়াতীমদের সম্পদ বলতে কি বুঝায়?**

একজন ইয়াতীম বিভিন্নভাবে সম্পদের মালিক হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পদশালী পিতার মৃত্যুতে সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে বিধি মোতাবেক তার পিতার সম্পত্তির মালিক হতে পারে। পারিতোষিক বা উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ হতে পারে। এ ছাড়াও হতে পারে বিধি মোতাবেক অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত সম্পদ। এ সকল সম্পদই ইয়াতীমের ব্যক্তিগত সম্পদ। যৌথভাবেও ইয়াতীমগণ সম্পদের মালিক হতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যেমন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানাসমূহে ইয়াতীমদের জন্য চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল সম্পদ বা ইয়াতীমদের জন্য সরকারী বা বেসরকারী অনুদান হিসেবে বরাদ্দকৃত সকল প্রকার সম্পদের মালিক ঐ প্রতিষ্ঠানের ইয়াতীমগণ।

**ইয়াতীমদের সম্পদ সংরক্ষণ বা হেফাজতের বিধান কি?**

ইয়াতীম স্বভাবতঃই অপরিণত বয়স্ক, অপরিপক্ক এবং দুর্বল। কাজেই ইয়াতীমদের সম্পদ হেফাজতের দায়িত্ব ইয়াতীমদের অভিভাবকের উপর ন্যাস্ত। ক্ষেত্র বিশেষে এ অভিভাবক হতে পারে ইয়াতীম সন্তানের আত্মীয় বা অনাত্মীয়। ইয়াতীমের মৃত পিতার মনোনীত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির উপরে ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব বর্তায়। অনেক সময় এ প্রকারের মনোনীত অভিভাবকের অভাবে স্থানীয় পর্যায়ে একজন প্রভাবশালীর উপর অভিভাবকত্বের ভার অর্পিত হয়। অভিভাবকের মনোনয়ণ যে প্রকারেই হোক না কেন তার উপরই ইয়াতীমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক সঠিকভাবে সে দায়িত্ব পালন করা জরুরী। পবিত্র কোরআনে ইয়াতীমদের সম্পদ রক্ষার জন্য সুন্দর একটি বিধান দেয়া হয়েছে,

**“আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারিত করেছেন তা অবোধদের হাতে তুলে দিওনা; বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল। আর ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে উপনীত হয়। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতেই তুলে দিবে। ইয়াতীমদের মাল অপচয় করো না বা তারা বয়োঃপ্রাপ্ত হবে বলে তাড়াহুড়া করে হজম করে ফেল না। যারা স্বচ্ছল (অভিভাবক) তারা অবশ্যই ইয়াতীমদের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমান ভোগ করবে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যার্পণ কর তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহই হিসেব গ্রহনে যথেষ্ট।”**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-৫,৬

আলোচ্য আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অত্যন্ত পরিস্কাভাবে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলা ধন-সম্পদকে সকলের জন্য জীবিকার আবলম্বন করে দিয়েছেন। ধন-

সম্পদ যত্নের সাথে সংরক্ষণ এবং পরিমিত ব্যায় করা প্রয়োজন। ইয়াতীম অপরিপক্ক, অনভিজ্ঞ এবং অপর্যাপ্ত বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন বিধায় তাদের হাতে সম্পদ তুলে দিলে তা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশী। এদিকে দৃষ্টি রেখেই ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধায়ক বা ওলীদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে করে তারা অবোধ ইয়াতীমদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ হস্তান্তর না করে। সেই সাথে ইয়াতীমদের সম্পদ নিজেদের কাছে রেখে তা থেকে ইয়াতীমদের খাওয়া, পরা, লালন-পালন ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করার নির্দেশ রয়েছে। যদি তারা সম্পদ নিজেদের হাতে নেয়ার আবদার করে তবে তাদেরকে সদ্ভাবে সুন্দর ভাষায় বুঝাতে হবে যে এ সম্পদ বিনষ্ট হবার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আর যদি ইয়াতীমের সম্পদ না থাকে তবুও ওলীদের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের সম্পদ থেকে ইয়াতীমের ভরণ-পোষণ করানো। এর পরের আয়াতে আল্লাহ্ ইয়াতীমদের প্রতি নজর রেখে তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং যোগ্যতা যাচাই-বাছাই করে নেয়ার কথা বলেছেন। যখন তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিয়ের উপযুক্ত হবে এবং দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করবে, তখন তাদের হাতে সম্পদ হস্তান্তর করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বা অপচয় থেকে বিরত থাকার জন্য এবং ইয়াতীম পরিণত বয়সে উপনীত হবার পূর্বেই তাদের সম্পদ তাড়াহুড়ো করে নিজের স্বার্থে ব্যয় না করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভিভাবক স্বচ্ছল হলে কিংবা নিজের প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের সংস্থান থাকলে সে অবশ্যই ইয়াতীমের সম্পদ থেকে নিজের জন্য খরচ করা থেকে বিরত থাকবে এবং কোন প্রকার বিনিময় মূল্য গ্রহণ করবে না। তবে অভিভাবক গরীব হলে বা তার রোজগারের অন্যকোন পথ না থাকলে, সে নিতান্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন পরিমান পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে বা গ্রহন করার অনুমতি আছে। সবশেষে উপযুক্ত সময়ে ইয়াতীমদের হাতে সম্পদ প্রত্যার্পণ করার সময় কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে সাক্ষী করে রাখার কথা বলা হয়েছে। সঠিক হস্তান্তর নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে কোন প্রকার অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির উদ্ভব এড়াতে এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সর্বোপরি সবকিছুর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে।

**ইয়াতীমের লালন-পালনের ফযীলত:**

ইয়াতীম সন্তানরা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্ তাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাই ইয়াতীমের হিফাজত করার অনেক ফযীলত এবং হেফাজতকারী ব্যক্তিও আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ইয়াতীমের হেফাযত বলতে বুঝায় ইয়াতীমের লালন-পালন করা, তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা, এলেম শিক্ষা দেয়া, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাদের সাথে সদাচরণ করা, তাদের কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট না দেয়া, তাদের প্রতি জুলুম না করা এবং সর্বোপরি তাদের সম্পদের সংরক্ষণ সহ সঠিক সময়ে তা তাদের কাছে হস্তান্তর করা। ইয়াতীম, চাই সে আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক, তাদের সেবা করা, তাদের লালন-পালন করা বা তাদের সাহায্য-সহযোগীতা করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারীর প্রতি জান্নাতের খোশ খবর দিয়েছেন। সাহল

ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী বেহেশ্তে এই দুই আঙ্গুলের মত একত্রে থাকব; এই বলে তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলি একত্রিত করে ইশারা করে নিকটবর্তী অবস্থান দেখালেন।”**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৫৫৭৩; তিরমিযী শরীফ, নং ১৮৬৮; আবুদাউদ শরীফ, নং ৫০৬২

**ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের শস্তি**

ইয়াতীম অপরিণত বয়স্ক তাই তাদের শারীরিক শক্তি যেমন অপর্যাপ্ত তেমনি বুদ্ধিমত্তাও অপ্রতুল। সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ তাদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে প্রতারিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইয়াতীমের অভিভাবক বা অভিভাবক ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃকও ইয়াতীমগন নিষ্পেষিত হতে পারে। সমাজের বাস্তবতা এটাই যে ইয়াতীম সন্তানের সাথে প্রায় প্রতিটি পরিবারই জুলুম ও অত্যাচার করে থাকে। ইয়াতীমের সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ না করে নিজেই হজম করে ফেলা, ছল-চাতুরী করে ইয়াতীমের সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়া ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ভাবে ইয়াতীমকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ ধরনের অপকর্ম সমাজের একটি করুন বাস্তব চিত্র। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় ইয়াতীমের নামে সংগ্রহীত চাঁদা এবং তাদের নামে বরাদ্দকৃত সরকারী ও বেসরকারী অনুদানের সকল অর্থ ইয়াতীমের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত। সে সম্পদ তাদের কল্যানে ব্যয় না করে কোন ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করা ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের অন্তর্ভুক্ত। যে ভাবেই হোক না কেন ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা চরম অপরাধ। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, সুক্ষ্মদর্শী এবং সুবিচারক। তিনি দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার কখনই বরদাশত করেন না। তাই অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছেন। পবিত্র কোরআনে আছে,

**“যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং অচিরেই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।”**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত- ১০

আলোচ্য আয়াতে ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পত্তি দখল করে নিয়ে নিজেদের ভোগের জন্য ব্যবহার করে তারা প্রকারান্তে উদরে অগ্নি প্রবেশ করাচ্ছে। কেননা এ আত্মসাতকৃত সম্পদই তার জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। সেই সাথে এও বলা হয়েছে যে অতি সত্বরই অর্থাৎ কিয়ামতের

দিনে বিলম্ব না করে তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করানো হবে। এ প্রসংগে হযরত সুদ্দী (রহঃ) বলেন,

**“পিতৃহীনদের মাল ভক্ষণকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যে তার মুখ, নাক, চক্ষু ও কান দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা বেরুতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি দেখেই চিনে নিবে যে সে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে।”**

তফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৬

ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ আল্লাহর গজব ও শাস্তির কারণ। সুতরাং এ পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যথায় আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবার কোন পথ থাকবে না

## যেনা বা ব্যাভিচার করা
## (Committing Adultery or Fornication)

ইসলামে যেনা বা ব্যভিচার একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত ঘৃণিত কর্ম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অন্যান্য সকল ধর্মেও যেনা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। যেনা কবীরা গুণাহ হওয়া সম্পর্কে সমস্ত আলেম-ওলামাগণ একমত পোষণ করেছেন। কেননা শরিয়তের দলিল দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, যেনা একটি মারাত্মক অপকর্ম। শির্ক এবং মানুষ হত্যার পরেই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ন বড় গুণাহ্ হচ্ছে যেনা। পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণিত আছে,

**“আর যারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যাভিচার করেনা; যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।”**

আল কোরআন, সুরা ফুরকান(২৫), আয়াত- ৬৯-৭০

ব্যাভিচার একটি মারাত্মক অপরাধ। হত্যার পরেই যার অবস্থান। কারণ তাতে বংশ পরিচয় সঠিক থাকে না। লজ্জাস্থানের হিফাযত হয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক সম্মান রক্ষা পায়না। মানুষে মানুষে কঠিন শত্রুতার জন্ম নেয়। দুনিয়ার সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থা বজায় থাকে না। একে অন্যের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যাকে সম্পূর্ণরূপে কলুষিত ও বিনষ্ট করে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা’আলা হত্যার পরেই এর উল্লেখ করেছেন।

যেনার অপরাধের জন্য পরকালের শাস্তির বিষয়টি এখানে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। হাদিসের মাধ্যমেও এ বিষয়ের উপরে পার্থিব এবং কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। এ অপরাধ থেকে তাই সকলকেই নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে সচেষ্ট থাকা চাই। এজন্য খুঁটি-নাটি সহ যেনা সম্পর্কিত শরিয়াতের সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করা আবশ্যক। এখানে যেনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহ যেনার গুরুত্বপূর্ণ শর’ই বিধানের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল।

**যেনার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

যেনা একটি আরবী শব্দ, এর বাংলা অর্থ ব্যাভিচার। যেনা বা ব্যাভিচারের শাব্দিক অর্থ অবৈধ যৌনাচার। এটি একটি স্বতঃপ্রবৃত্ত যৌন অপরাধ। ইসলামী পরিভাষায় যেনা হল বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত নারী-পুরুষের প্রণয় বা যৌন সম্পর্ক। সুন্নী শরি’য়া অনুসারে বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত বিবাহিত/অবিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত/অবিবাহিত নারী একে অন্যের সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে দৈহিক যৌন মিলন বা যৌনক্রিয়া করার নাম যেনা। আবার এভাবেও বলা যায়, বিবাহিত

স্ত্রী/স্বামী ব্যতীত অন্য নারী/পুরুষ-এর সাথে যৌনকামনা চরিতার্থ করাই যেনা। এক কথায় বলা যায় বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের যৌনাচারই হল যেনা।

যেনা বলতে যদিও সাধারনতঃ নারী-পুরুষের চুড়ান্ত দৈহিক সম্পর্ককেই বুঝান হয়ে থাকে, তবুও এটাই যেনার শেষ কথা নয়। যেনার কতগুলি স্তর বা প্রকার রয়েছে। এ স্তরের মধ্যে রয়েছে এমন সব আনুসঙ্গিক কর্ম-কাণ্ড যা কাউকে চুড়ান্ত পর্যায়ের যেনা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এর সর্বনিম্ন প্রকারের যেনা হল কাম-লালসার দৃষ্টি, অর্থাৎ দু'চোখ দিয়ে পর-নারী বা পর-পুরুষের সৌন্দর্য অবলোকন করা (পুরুষের ক্ষেত্রে নারীর এবং নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের)। এ প্রকারের যেনাকে চোখের যেনা বলা হয়। এভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে যেনা সংঘটিত হয়ে থাকে। জিহবার যেনা হল যৌন আবেদনমূলক কথা-বার্তা বলা, কানের যেনা হল ঐ কথা শোনা, পায়ের যেনা ঐ কাজের জন্য গমন করা এবং অন্তরের যেনা হল যৌন আকাঙ্খা পোষণ করা ইত্যাদি। এ সবই নিম্নস্তরের যেনা। দ্বিতীয় উচ্চস্তরের বা মধ্যম স্তরের যেনা হয় ব্যক্তিগত গোপন অঙ্গ স্পর্শের মাধ্যমে। হাত দ্বারা স্পর্শ করলে হাতের যেনা, চুম্বনের মাধ্যমে মুখের যেনা এবং আলিঙ্গনের মাধ্যমে সাড়া শরীরের যেনা হয়। সর্বোচ্চ বা চুড়ান্ত পর্যায়ের যেনা হল যৌনাঙ্গের ব্যবহারের মাধ্যমে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করা বা সঙ্গম করা। এর সমর্থনে এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"আদম সন্তানের জন্য ব্যাভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যেনা হচ্ছে পর-স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের যেনা হল যৌন উত্তেজনামূলক বাক্যালাপ শোনা, মুখের যেনা হল আলোচনা করা, হাতের যেনা স্পর্শ করা, পায়ের যেনা ঐ উদ্দেশ্যে গমন করা। হৃদয় ঐ কাজের প্রতি কু-প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। আর যৌনাঙ্গ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে"।**

হাদিস: রিয়াদুস সলেহীন, নং ১৬২৩

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা যেনা এবং যেনা প্ররোচনাকারী সকল আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"আর তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না।"**

আল কোরআন, সুরা বানী-ইসরাঈল(১৭), আয়াত- ৩২

এ আয়াতটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত সুকৌশলে যেনার বিষয়টি উপস্থাপন করে মানুষকে যেনা উদ্রেককারী এবং যেনা সম্পর্কিত এর চতুর্পাশের যাবতীয় দুঃস্কর্ম হতে দূরে থাকার নির্দেশ দান করেছেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে অবৈধ যৌনাকাঙ্খার সৃষ্টি হয়

এবং এর পরে শয়তানের দেখানো পথ অনুসরণ করেই মানুষ প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ের যেনায় লিপ্ত  হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সাবধান করে দিয়েছেন এভাবে,

**"হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"**

আল কোরআন, সুরা নূর(২৪), আয়াত- ২১

কিন্তু তবুও মানুষ ভুল করে বার বার শয়তানের ধোঁকা খায়। শয়তানের দেখানো ছোট ছোট পথ ধরেই একসময় মানুষ বিরাট অন্যায় করে ফেলে। কিন্তু যেনার ক্ষেত্রে শয়তানের দেখানো পথ কোনটি এবং কিভাবে শয়তান মানুষকে পথ দেখায়? এ প্রশ্নের সমাধান একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে করা যায়। একজন মুমিন সহসা যেনার কথা শুনলে আঁৎকে উঠবে, 'ওহ, এতো মহাপাপ!' কিন্তু সেই ব্যক্তিটিকেই শয়তান ধীরে ধীরে কব্জা করে ফেলতে পারে এবং যেনার শেষ পরিনতি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। এর সূত্রপাত হতে পারে দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে অথবা টেলিফোন কিংবা মোবাইলে কথা বলার মাধ্যমে। শয়তান তাকে মন্ত্রণা দেয় এভাবে- পরনারীকে একটু দেখা বা তার সাথে ফোনে আলাপ করাতে অপরাধ কোথায়? তারপর, তার সাথে একটু দেখা করাতে ক্ষতি কি? এরপর ঐ নারী তাকে রেস্টুরেন্টে আমন্ত্রণ জানালে সে ভাববে এতে সমস্যার-তো কিছু নেই।  এভাবে ক্রমে ক্রমে পার্কে বা নদীর ধারে বেড়ানো এবং নির্জনে তার সাথে মিলিত হওয়া তার কাছে বৈধ মনে হবে। সবশেষে সে শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে মহিলার সাথে হোটেলে কিংবা অন্যকোথাও নির্জনে রাত কাটাতেও দ্বিধা করবে না এবং এর ফলশ্রুতিতে দৈহিক মিলনের মাধ্যমে চুরান্ত পর্যায়ের যেনা সংঘটিত হয়ে যাবে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এ যদি হতে পারে একজন মুমিনের অবস্থা, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কথাতো বলাই বাহুল্য।

**যেনা বা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার উপায়:**

কোন ব্যক্তি অন্তত চারটি অঙ্গকে সঠিক ও শরিয়ত সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রন করতে পারলেই সত্যিকারার্থে সে ব্যভিচারের মত পাপাচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর তা হচ্ছে:

**১। চোখ ও দৃষ্টি শক্তি:** প্রাথমিকভাবে যেনার সূত্রপাত হয় দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। তাই দৃষ্টি শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার শামিল। দৃষ্টিই সকল অঘটনের মূল। কারণ কোন কিছু দেখার পরেই তো তা মনে জাগে। মনে জাগলে তার প্রতি চিন্তা আসে। চিন্তা আসলে অন্তরে তাকে পাওয়ার কামনা বাসনা জন্মে। কামনা বাসনা জন্মিলে তাকে পাওয়ার খুব ইচ্ছা হয়। দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে আর তখনই কোন চুরান্ত কর্ম সংঘটিত হয়। তবে এ অবস্থার শিকার হওয়া থেকে আল্লাহ্ মানুষকে পরিত্রাণের রাস্তা বাতলে দিয়েছেন। পরনারীর সৌন্দর্য এবং যৌন আবেদনময়ী চাল-চলন পুরুষের চোখে এবং মনে কু-মতলবের সৃষ্টি

করে এবং এটাই মূলতঃ যেনার সূত্রপাত। তাই এটাকে পরিহার করার জন্যই ইসলামে পর্দার বিধান রাখা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দার হুকুম রয়েছে,

**“হে নবী! মুমিদেরকে বলঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। ঈমান আনায়নকারী নারীদেরকে বল-তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।”**

আল কোরআন, সুরা নূর(২৪), আয়াত- ৩০,৩১

এ আয়াতে প্রথমে পুরুষের উদ্দেশ্যে পর্দা করার কথা বলা হয়েছে এ কারনে যে, দৃষ্টি পড়ার পর অন্তরে যে ফাসাদ সৃষ্টি হয় তা থেকে লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার জন্য দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা জরুরী। দৃষ্টি অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। দৃষ্টিও শয়তানের তীর সমূহের মধ্যে একটি তীর। অন্তরকে নাড়া দিয়েই তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়। ব্যাভিচার থেকে বাঁচা জরুরী, সুতরাং এর জন্য দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখা প্রাথমিক পর্যায়ের যেনার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি কৌশল। নারীকেও দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখার সাথে সাথে তাদের দৈহিক সৌন্দর্য গোপন রাখার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এব ফলে যেমন পুরুষের অন্তরে কামভাব সৃষ্টি হবে না, তেমনি নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযতও মজবুত হবে। দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার কৌশল হচ্ছে এই যে, কোন অবৈধ বা হারাম জিনিসের প্রতি চোখ পড়ে গেলে তা তড়িঘড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে। হঠাৎ দৃষ্টিতে কোন দোষ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই দোষের। শরিয়তে কোন পরনারীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা জায়েয রয়েছে। তবে একবারের দৃষ্টিতেই দীর্ঘক্ষণ অবলোকন করা বা বারে বারে দৃষ্টিপাত করে নারীর সৌন্দর্য অবলোকন করা একেবারেই না-জায়েয। এটা যেনা থেকে পরিত্রানের জন্য অতি চমৎকার একটি এলাহী ব্যবস্থা।

২। **মন ও মনোভাব:** এ পর্যায় খুব কঠিন। কেননা মানুষের মনই হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র উৎস। মানুষের ইচ্ছা, স্পৃহা, আশা ও প্রতিজ্ঞা মনেরই সৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে সে নিজ কু-প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে না নিশ্চিতভাবে সে কু-প্রবৃত্তির শিকার হবে। পরিশেষে তার ধ্বংস একেবারে অনিবার্য। তাই মনের ভিতর যেনার অপরাধবোধ সব সময় জাগ্রত রেখে মনকে কঠোর নিয়ন্ত্রনের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে। মনকে ধর্মীয় শাসনের কঠোর বেড়াজালে আবদ্ধ রাখতে পারলে যেনা সহ যাবতীয় দুঃস্কর্ম ও অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩। **মুখ ও বচন:** কারো মনোভাব তার কথার মাধ্যমে টের পাওয়া যায়। যেনা উদ্রেগকারী কোনো আলোচনা মনকে প্রভাবিত করে। মন তখন সেটা বাস্তবায়নের আকাঙ্খা করে। মন মানুষের

www.waytojannah.com

প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রক ঠিকই। তবে সে কোন না কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া যে কোন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং মন যদি কোন খারাপ কথা বলতে বলে তাহলে জিহবার মাধ্যমে কোন সহযোগীতা করা যাবে না। তখন সে নিজ কাজে ব্যর্থ হবে নিশ্চয়ই এবং গুণাহ কিংবা তার অঘটন থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

৪। **পদ ও পদক্ষেপ:** সওয়াবের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে পদক্ষেপ করা যাবেনা। অন্তরে যেনা আকাঙ্খা জাগ্রত হলে তার বাস্তবায়ন হয় পদক্ষেপের মাধ্যমে। কাজেই যেনার কাজে পদক্ষেপ নেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। তাহলে যেনার অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে।

**যেনার সামাজিক বাস্তবতা:**

যেনার মূল পর্বটি মঞ্চস্থ হয় নির্জনে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাই এ বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোপন থেকে যায় এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তবে যেনার অকাঙ্খা বা খায়েস সৃষ্টিকারী অনেক উপায়-উপকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি দিয়ে সমাজ ভরপুর রয়েছে। এ বিষয়গুলির মধ্যে স্যাটেলাইট মিডিয়া, ভিডিও, মিউজিক, ম্যাগাজিন, মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির অপব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ অপরাধের জগতে পা বাড়াতে প্ররোচিত হয়। পাশ্চাত্য ঢংয়ের চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা মেশার সুযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলিও যৌন উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়াও যেনা উদ্রেগকারী মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতাও এ কাজের জন্য অনেকাংশে দায়ী। সর্বোপরি সরাসরি যৌনকর্মে লিপ্ত হবার জন্য সমাজে রয়েছে কল-গার্ল বা সোসাইটি গার্ল এবং পতিতালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে সেক্স ওয়ার্কারদের সহজলভ্যতা- এদের মাধ্যমে মানুষ নির্বিকারে যেনায় লিপ্ত হয়ে পড়ছে।

যেনা একটি ঘৃনিত সামাজিক অপরাধ। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলি সহ পৃথিবীর অনেক দেশেই ভদ্রতার মুখোশে সভ্যতার নামে যেনা চলে আসছে নির্বিকারে। সেখানে চলছে অবাধ যৌনাচার বৈধভাবে। সে সমাজে বিবাহপূর্ব বা বিবাহিত পুরুষ-নারীর বিপরীত লিঙ্গের সাথে মেলা-মেশাকে কোন অপরাধ ভাবা হয়না, তা যতই গভীর হোক সে সম্পর্কটা। আবার অনেক সমাজে একটু ভিন্ন কায়দায় যেনার আঁখরা পতিতালয়কে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে যৌনাচারের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া হলেও যেনার অপরাধ কোনভাবেই মাফ হয়ে যায় না।

**যেনার শাস্তি:**

ইসলামে যেনা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বস্ততঃ সকল ধর্মই এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে এবং কোন ধর্মেই যেনার অনুমোদন নেই। তবে ইসলাম যেনার বিরুদ্ধে সব থেকে কঠোর

অবস্থানে রয়েছে। যেনাকে অন্যতম গুরুতর কবীরা গুনাহ্ বিবেচনা করে এর জন্য কঠিন এবং ভয়াবহ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ যেনা মানুষের সম্মান ও বংশমর্যাদা হানি করে এবং এটা মানুষের অতিসংবেদনশীল বিষয়ের উপর আঘাত হানার ফলে মানবাধিকার ক্ষুন্ন হয়। কোন ঈমানদারের পক্ষে এ সংবাদ শ্রবণ করা অবশ্যই কঠিন যে, তার স্ত্রী কারো সংগে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। পরিবারের কোন সদস্য যেনা করলে গোটা পরিবার ও অত্মীয়-স্বজন লাঞ্ছিত হয়। তাদের উপর কলঙ্কের কালিমা লেপিত হয়। জনসমক্ষে তারা আর মাথা উঁচু করে কথা বলার সাহস পায় না।

কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচারের প্রচার ও প্রসার তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক আযাব বা গযব নিপতিত হবার এক বিশেষ কারণ।

যেনার পাপ বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে এবং অপরাধের গুরুত্ব নির্ভর করে যেনার প্রকৃতি ও পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। এসব বিচারে মাহরিম পুরুষ-নারীর মধ্যে যেনা অনাত্মীয় নারী-পুরুষের যেনা অপেক্ষা অধিকতর মন্দ বিবেচনা করা হয়। তদ্রূপ বিবাহিত অবস্থার যেনা অবিবাহিত নারী-পুরুষের যেনার তুলনায় গুরুতর অপরাধ। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়াও চরম ঘৃণিত অপরাধ। এ বিষয়ে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম,

> **"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কি?"**

তিনি বললেন,

> **"আল্লাহর জন্য প্রতিযোগী নির্ধারণ করা (শির্ক করা) অথচ তিনি তোমাকে পয়দা করেছেন।"**

আমি বললাম,

> **"ইহাতো অবশ্যই বড় পাপ। ইহার পর কি?"**

তিনি বললেন,

> **"নিজ সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করে ফেলা যে, সে তোমার আহারে ভাগী হবে।"**

আমি জিজ্ঞেস করলাম,

> **"তারপর কি?"**

তিনি বললেন,

> **"তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।"**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং- ১৫৯

এসব বিচার-বিবেচনায় রেখে যেনার অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। যেনার পার্থিব শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই শাস্তিকে হদ্দ বলা হয়। এসব শাস্তি ইহজগতে আইনগতভাবে বলবৎ হবে। শর'ই বিধান অনুযায়ী বিবাহিত অবস্থায় যেনার অপরাধ অবিবাহিত অবস্থায় যেনার অপরাধ থেকে অপেক্ষাকৃত গুরুতর এবং সে মোতাবেক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। যেনার শাস্তি নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রাপ্য। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ যেনার শাস্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে,

**"যেনাকারিনী নারী এবং যেনাকার পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশত কষাঘাত করবে।"**

আল কোরআন, সুরা নূর(২৪), আয়াত- ২

এ আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি অবিবাহিত যেনাকারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এ সম্পর্কে সকল তাফসীরবিদগণ একমত রয়েছেন। বিবাহিত যেনাকারদের শাস্তি আরো ভয়াবহ আর তা হচ্ছে রজম অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে এ শাস্তির বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন- এ সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত আছে। এর একটি হাদিস বর্ণনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার করা হল: ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া তামীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন,

**"তোমরা আমার নিকট হতে গ্রহণ কর যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নারীদের জন্য একটি পথ বাহির করে দিয়েছেন। কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করলে একশত করে বেত্রাঘাত মার এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরী কর। আর বিবাহিত পুরুষ কোন বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করলে তাদেরকে প্রথমে একশত করে চাবুক মার তারপর প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৪২৬৯

এ তো গেল, যেনার পার্থিব শাস্তির কথা; যেনার অপরাধের জন্য পরকালীন শাস্তিও রয়েছে- আর তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন, যা আল্লাহ্ প্রস্তুত করে রেখেছেন। তবে খাঁটি তওবার মাধ্যমে সে শাস্তি থেকেও রেহাই পাওয়ার আশা করা যায়।

## সডোমি বা পায়ুকাম/ সমকামিতা
## (Sodomy / Homosexuality)

সডোমি (Sodomy) ও সমকাম (Homosexuality) এক ধরনের অস্বাভাবিক, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যৌনাচার। এটি একটি যৌন বিকারও বটে। ইসলামের দৃষ্টিতে সডোমি ও সমকামিতা একই পর্যায়ের অপরাধ। তবে এ শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থবোধক হলেও এর মধ্যে প্রকৃতিগত বা পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। সমকামিতা বলতে বুঝায় একই লিঙ্গের সাথে আচরিত যৌনকর্ম। অর্থাৎ পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর যৌনকর্ম সম্পাদন। অপরদিকে সডোমি মূলত সমলিঙ্গের সাথে যৌনাচার হলেও এ কর্মটি পুরুষ চালিত এবং বিপরীত লিঙ্গের সাথেও হতে পারে। সডোমি একটি ইংরেজী শব্দ-যার বাংলা অর্থ করা যায় পায়ুকাম। প্রচলিত অর্থে সডোমি বলতে বুঝায় গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা। Webster's Dictionary সডোমির সংজ্ঞা নিরূপন করেছে এভাবে:

কোন মানুষের গুহ্যদ্বার বা মলদ্বার দিয়ে যৌনসঙ্গম করাকে সডোমি বলে (Sodomy is Anal Copulation With a Human)।

ইসলামী পরিভাষায় সডোমি বলতে পুরুষে পুরুষে একে অপরের মলদ্বার বা গুহ্যদ্বার ব্যবহারের মাধ্যমে যৌন কামনা চরিতার্থ করাকেই বুঝানো হয়। তবে অধিকাংশ ওলামাগণ স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে যৌনসঙ্গম করাকেও সডোমির সমপর্যায়ের অপরাধ হিসেবে গন্য করেন।

সডোমি শব্দটির আর একটি ইংরেজী সমার্থবোধক শব্দ হলো Lutishness - যার ইসলামী পারিভাষিক শব্দ হল 'লাওয়াতাত'। ইসলামের দৃষ্টিতে এই 'লাওয়াতাত' বা সডোমি শব্দ দু'টির প্রকৃত রূপ বুঝতে হলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহ এর পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ধারনা নেওয়া প্রয়োজন। Sodomy শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সাদুম (SADUM) শব্দ থেকে। সাদুম ছিল হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের একটি জনপদের নাম। এই জনপদের লোকদের নিকট প্রচলিত বহু কু-কর্মের মধ্যে জঘন্যতম নোংরা অভ্যাসটি ছিল পুরুষের সাথে পুরুষের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। আধুনিক সভ্যতার যুগে সাদুম জনপদের এই নোংরা অভ্যাসটি সডোমি হিসেবে পরিচিত এবং লূত (আঃ)- এর কওমের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলে Lutishness বা 'লাওয়াতাত' নামেও অভিহিত। আল্লাহ্ তা'আলা এই কওমের মধ্যে প্রচলিত কু-কর্মটি সবথেকে বেশি অপছন্দ করেছেন এবং পরবর্তীদেরকে এ অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

www.waytojannah.com

**"পৃথিবীতে তোমরা শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হও। আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাকো। তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"**

আল কোরআন, সুরা শূ'আরা(২৬), আয়াত- ১৬৫,১৬৬

এ আয়াত দ্বারা লূত (আঃ)-এর কওমের আচরিত কর্মটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুরুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার জন্য নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নারীকে বৈধভাবে সম্ভোগ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নারীকে ছেড়ে কোন পুরুষের পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, সে অন্য পুরুষের সাথে যৌন সম্ভোগ করে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাতো আল্লাহর নাফরমানী এবং সীমালঙ্ঘনের অপরাধ। সেক্ষেত্রে কোন পুরুষের পক্ষে অন্য পুরুষের সাথে উপগত হওয়া খুবই নিন্দিত বিষয় এবং মহাপাপ। তবে কোরআন বা হাদিসের মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রকৃত ধরন, পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াগত কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে পুরুষের গুহ্যদ্বারে সঙ্গমের পদ্ধতি বুঝান হয়েছে। তবে অনেকের ধারণায় শুধু পুরুষের নয়, যে কোন মহিলার এমনকি নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রেও গুহ্যদ্বার বা মুখগহবরে সঙ্গম করা হলেও তা এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন কোন ওলামা হস্তমৈথুনের মত বিষয়টিকেও এই জাতীয় যৌনকর্মের অন্তর্ভুক্ত করে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলা-মহিলায় আচরিত নিজেদের মধ্যে যৌনতৃপ্তি লাভের প্রক্রিয়াকেও এ অপরাধের মধ্যে সমকামিতার একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে প্রকৃত অবস্থাটি আল্লাহ্ই সবথেকে ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা লূত সম্প্রদায়ের এ কু-কর্মটি অত্যন্ত অপছন্দ করেছেন এবং সীমালঙ্ঘনের শাস্তি স্বরূপ তাদের ভূ-খন্ডকে উলোট-পালট করে ফেলেন এবং তাদের সবাইকে প্রস্তর বর্ষণ করে খতম করে দেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বিবৃত আছে,

**"অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছলো, আমি ঐ ভূ-খন্ডের উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর পাথর বর্ষণ করতে থাকলাম, যা একাধারে ছিল। যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর এ জনপথগুলি এই জালিমদের হতে বেশী দূরে নয়।"**

আল কোরআন, সুরা হূদ(১১), আয়াত- ৮২,৮৩

হযরত লূত (আঃ)- এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিনতির প্রতি ইঙ্গিত করে বর্তমান জামানায় এ অপরাধের সাথে জড়িত যালিমদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, প্রস্তর বর্ষণের ফলে বিধ্বস্ত ঐ জনপদটি তাদের কাছ থেকে দূরে নয়। বস্ততঃ কোরআনে বর্ণিত এ জনপদটির ধ্বংসাবশেষ আজও লূত জাতির কু-কর্মের সাক্ষী বহন করে পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে । এটি বায়তুল মোকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে অবস্থিত যা 'লূত সাগর' বা মৃত সাগর (Dead

sea) নামে পরিচিত। এর একটি অংশে আর্শ্চয ধরনের পানি বিদ্যমান, যে পানিতে কোন জন্তু, প্রাণী এমনকি মাছ ও ব্যাঙ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। এ থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় সমকামীতা আল্লাহর কাছে কতটা ক্রোধ সৃষ্টিকারী ভয়াবহ অপরাধ।

**সমকামিতার সামাজিক বাস্তবতা:**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতদের দ্বারা এ জাতীয় কর্মের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতার ব্যপারে খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এ সম্পর্কে একটি হাদিস রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"আমি আমার উম্মতদের মধ্যে যে দুস্কর্ম ছড়িয়ে পড়ার ভয় করি তা হল লূত জাতির অপকর্ম।"**

হাদিস, তিরমিযী শরিফ, নং ১৩৯৭

আমাদের সমাজে এ জাতীয় অপরাধ সংঘটিত হচ্ছেনা, একথা জোর দিয়ে বলা যায়না। কারণ এটি একটি অত্যন্ত গোপন বিষয় এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটিত আচরণ। তবে যুগের হাওয়া যেভাবে বইছে তাতে এ বিষয়টি আমাদের সমাজের জন্য একটি অশনি সংকেত। অন্যান্য সমাজে এ গোপন বিষয়টি এখন আর গোপন নেই। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সমকামিতা আজ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমকামিতার ঝড় উঠেছে। আধুনিকতা ও ফ্যাশনের নামে সমকামিতাকে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানের মত ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই সমকামীতার স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কি সীমাহীন লজ্জার কথা! এর পরিনতি কি হতে পারে? আমাদের সমাজ যেমন করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে তাতে সমকামিতার মত জঘণ্য পাপ এ সমাজকে গ্রাস করে ফেলবে- এ আশংকা অমূলক নয়। তবে ইতিহাস থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে যে, লূতের কওমকে যেভাবে ভূমি উল্টিয়ে এবং পাথর বর্ষণ করে বিধ্বংস করা হয়েছিল, আজকের দিনেও এর পূনরাবৃত্তি করা বা এর চেয়েও ভয়াবহ পন্থায় উশৃংখল সমাজকে ধ্বংস করে দেওয়া আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন কোন কাজ নয়। আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি পৃথিবীতে সুনামি বা ভূমিকম্পের মত ভয়াবহ সর্বনাশা দূর্বিপাকগুলো কিসের সংকেত? এর উত্তর হিসেবে একটি হাদিস প্রনিধানযোগ্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"আমার উম্মতের কিছু লোক কওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর।"**

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৭২৮

**সমকামীতার অপরাধ ও অপকার সমূহ:**

সমকামীতার মধ্যে নিহিত রয়েছে বহুবিধ ক্ষতি ও অপকার। যা ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ের এবং দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কিত। এর কিছু উপস্থাপন করা হল:

**ধর্মীয় অপকার সমূহ:** সমকাম কবীরা গুণাহ সমূহের একটি। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক অনেক নেক আমল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তার ধর্মীয় চেতনাকে বিনষ্ট করে দেয়। এমনকি তা যে কারো তাওহীদ বিনষ্টে ভূমিকা রাখে। কখনো ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে দাড়ায় যে, সে ধীরে ধীরে অশ্লীলতাকে ভালবেসে ফেলে এবং সাধুতাকে ঘৃণা করে। তখন সে কাফির ও মুরতাদ হতে বাধ্য হয়।

**চারিত্রিক অপকার সমূহ:** প্রথমতঃ সমকামই হচ্ছে চারিত্রিক এক অধঃপতন। এটা স্বাভাবিকতা বিরুদ্ধ। এরই কারণে লজ্জা কমে যায়, মুখ হয় অশ্লীল এবং অন্তর হয় কঠিন। অন্যদের প্রতি দয়া-মায়া লোপ পায়, পুরুষত্ব ও মানবতা বিলুপ্ত হয় এবং সাহসিকতা, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিনষ্ট হয়। তা ব্যক্তির উচ্চ মানসিকতা বিনষ্ট করে দেয় এবং তাকে বেকুব বানিয়ে তোলে।

**মানসিক অপকার সমূহ:** ব্যক্তির অস্থিরতা ও ভয়-ভীতি অধিক হারে বেড়ে যায়। মানসিক বিশৃংখলা ও মনের অশান্তি তার নিকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তার মাঝে স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বহীনতা জন্ম নেয়। মেজাজ পরিবর্তন হয়ে যায়। যে কোন কাজে এরা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানসিক টানাপড়েন এবং বেপরোয়াভাব এদের মধ্যে জন্ম নেয়।

**শারীরিক অপকার সমূহ:** সমকামীতার শারীরিক ক্ষতি সবচেয়ে মারাত্মক। সমকামীতার ফলে পুরুষাঙ্গ তথা সাড়া শরীরেই নানা প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। লিঙ্গের কোষগুলি ঢিলে হয়ে যায় এবং তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে সে যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। নিজের স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। সবচেয়ে বড় অপকার হচ্ছে নানাবিধ যৌন রোগের সংক্রমন। এরা গনোরিয়া, সিফিলিস, হারপিস ইত্যাদির মত জটিল ও ক্ষতিকর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উপরন্তু এরা এইডস এর মত দূরারোগ্য ঘাতক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে ধুকে ধুকে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পাশ্চাত্যের দেশ সমূহ যারা নিজেদেরকে সভ্য জাতি বলে দাবী করে, তাদের মাঝে সমকামীতার হার বেশী বিধায় এইডস এর প্রকোপও সেখানে বেশী। এবং এর সংখ্যা দিন দিন আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত এ মরণ ব্যাধির কোন চিকিৎসা বের করতে সক্ষম হননি। সেখানে এ মরণ ব্যাধির কবলে পড়ে কত শত লোক যে অকালে প্রান হারাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে?

**সমকামিতার শাস্তি:**

সমকামিতার জন্য ইসলামে নির্ধারিত শর'ঈ শাস্তির বিধান রয়েছে। সমকামীতা প্রমানিত হলে পার্থিব শাস্তি হিসেবে হত্যার মত কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ শাস্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"তোমরা যখন কাউকে লূত সম্প্রদায়ের মত কাজে লিপ্ত দেখবে, তখন এর অপকর্মকারীকে এবং যার সাথে এরূপ করা হবে, উভয়কে হত্যা করবে।"**

হাদিস, তিরমিযী শরিফ, নং ১৩৯৬; আবু দাউদ শরীফ, নং ৪৪০৫

শেষ যমানায় এ জাতীয় অপরাধ প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা হয়েছে। একটি হাদিসে উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বলেন যে,

**"কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় এই উম্মতের শেষের লোকেরা এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হবে এবং মানুষ তার স্ত্রী বা দাসীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে। অনুরূপভাবে পুরুষের সাথে পুরুষ কু-কাজে লিপ্ত হবে, যা হারাম এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণ। এ লোকেদের নামাযও আল্লাহর নিকট কবুল হয়না যে পর্যন্ত না তারা তাওবা করে, বিশুদ্ধ তাওবা"** (তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৭ খ-, পৃষ্ঠা-৫৭৩)।

আখিরাতে সমকামীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"যে ব্যক্তি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সংগম করে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ সে লোকের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১১০৪

ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মতে এ হাদিস অনুযায়ী নিজ স্ত্রীর সাথেও মলদ্বারে সংগম করা হারাম এবং অন্য পুরুষ কিংবা স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করার একই পর্যায়ের অপরাধ। তবে তাওবার মাধ্যমে এ অপরাধ থেকে আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর রহমত লাভ করার আশা করা যায়। অতএব, জেনে কিংবা না জেনে যারা এ জাতীয় কুকর্মে লিপ্ত হয়েছেন বা আছেন, তাদের এখনই খাঁটি তাওবা করে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া উচিত।

## সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা
## (Slandering Innocent Women)

চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন মুমিনের কাছে তার নিজের চরিত্রের পাক-পবিত্রতা যতটা মূল্যবান, তেমনি অন্যের বেলায়ও সেটা তদ্রুপ বলে ভাবতে হবে। তাই প্রত্যেকের জন্যই অন্যের চরিত্র সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। বস্ত্ততঃ শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত না হলে একজন মুমিনের অন্য মুমিনের চরিত্র সম্পর্কে সুধারনা পোষণ করা ঈমানী দায়িত্ব। তাই কারো পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, সে অন্যের চরিত্রের উপর অযথা কলঙ্ক লেপন করে। মুমিন মাত্রই তার মনে এ ভাবনা সব সময়েই থাকতে হয় যে, তার নিজের চরিত্রের পূতঃপবিত্রতা নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে অথবা অহেতুক কেউ তার চরিত্রে কালিমা লেপনের প্রচেষ্টা করে, তাহলে সেটা যেমন তার কাছে বিব্রতকর এবং অসহনীয় লাগবে, ঠিক তেমনি অন্যের বেলায়ও তা শতভাগ সত্য। তাই কারো চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের প্রচেষ্টা করার পূর্বে শতবার এ বিষয়টির সাথে এর পরিণতির কথাও ভেবে নেয়া প্রয়োজন। অহেতুক কলঙ্ক আরোপের ফলে একটা জীবন তথা একটা সংসার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। একজন মুমিনা নারীর কাছে তার সতীত্ব অমূল্য সম্পদ। সেখানে কোন অবৈধ হস্তক্ষেপ কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। অকারণে কোন নারীর চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন কোন ভাবেই বরদাশত করার নয়। ইসলামী শরিয়তে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সতী-সাধ্বী নারীর উপর অহেতুক কলঙ্ক লেপনকে কবীরা গুণাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর দলিল হিসেবে একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের বর্ণনা করা হল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

> **"সাতটি ধ্বংসকারী পাপ থেকে তোমরা বেঁচে থাক।"**

জিজ্ঞেস করা হলো,

> **"হে আল্লাহর রাসূল** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! **ঐ গুলো কি?"**

উত্তরে তিনি বললেন,

> **"ঐ গুলো হলো, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, বিনা কারনে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ণ করা এবং সতী-সাধ্বী সরলমনা মুমিনা স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ আরোপ করা।"**

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং-৬৩৮৩

**অপবাদের বিধান:**

বিধানগতভাবে কাউকে অপবাদ দেওয়া তিন প্রকারঃ

১। হারাম: অপবাদটি একেবারে মিথ্যা অথবা বানোয়াট হলে সে ধরনের অপবাদ আরোপ করা সম্পূর্ণ হারাম।

২। ওয়াজিব: কেউ নিজ স্ত্রীকে ঋতুমুক্তাবস্থায় কারোর সাথে ব্যভিচার করতে দেখলো। অথচ সে স্ত্রীর ঐ ঋতুচক্রের পবিত্রাবস্থায় একবারও সহবাস করেনি এবং উক্ত ব্যভিচার থেকে সন্তানও জন্ম নিয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দেয়া তার জন্য ওয়াজিব।

৩। জায়েয: কেউ নিজ স্ত্রীকে কারোর সাথে ব্যভিচার করতে দেখলো। অথচ উক্ত ব্যাভিচার থেকে সন্তান জন্ম নেয়নি। এমতাবস্থায় সে নিজ স্ত্রীকে অপবাদ দিতে পারে বা অপবাদ দেয়া তার জন্য জায়েয হবে অথবা অপবাদ না দিয়ে তাকে এমনিতেই তালাক্ব দিয়ে দিতে পারে।

আমরা এ আলোচনা সঙ্গত কারণেই হারাম প্রকারের অপবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব যেখানে অহেতুক কোন স্ত্রীলোকের উপর চারিত্রিক কলঙ্ক আরোপ করার প্রচেষ্টা করা হয়।

**সতী-সাধ্বী নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার শাস্তি:**

সতী-সাধ্বী নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া একটি সাক্ষাৎ নির্লজ্জতা এবং জঘণ্য অপরাধ। এ নির্লজ্জ অপরাধ দমনের জন্য পবিত্র কোরআনে অপবাদকারীর প্রতি ভীতি প্রদর্শন পূর্বক কঠিন শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

**"যারা সতী-সাধ্বী সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।"**

আল-কোরআন, সুরা নূর(২৪), আয়াত-২৩

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ মুমিনা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপকারীকে লানত দিয়েছেন। এখানে যে পরকালের মহাশাস্তির কথা বলা হয়েছে তা তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা দুনিয়াতে বসে প্রত্যক্ষ করা যাবে না। তবে পার্থিব শাস্তির কথা এখানে উল্লেখ থাকলেও বিধানটি বর্ণিত হয়েছে অন্য একটি আয়তে। আল্লাহ্ পাক বলেন,

**"যারা সতী-সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, এবং চারজন সাক্ষী হাজির করে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই না'ফরমান।"**

আল-কোরআন, সুরা নূর(২৪), আয়াত-৪

উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কারো প্রতি চারিত্রিক কলঙ্ক লেপনের প্রচেষ্টা করা হলে তা প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন। চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত না হলে অপবাদ আরোপকারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং শাস্তি হিসেবে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে। তবে কোন কারনে সে পার্থিব শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেলেও পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না, সেখানে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটাই হল নির্লজ্জতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা।

যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিলো; অথচ তারা নিজেরা ছাড়া এ ব্যপারে অন্য কোন সাক্ষী নেই, সেক্ষেত্রে তাকে নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণের জন্য যা করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

**"আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে অন্য কোন সাক্ষীরও মজুদ থাকে না, সে অবস্থায় এটাই হবে তাদের সাক্ষ্য যে, তারা আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে অবশ্যই সে সত্যবাদী। এরপর পঞ্চমবার বলবে, মিথ্যাবাদীর ওপর যেন আল্লাহ্ তা'আলার লানত হয়। কোনো স্ত্রীর ওপর থেকেও (আনীত অভিযোগের) শাস্তি রহিত করা হবে যদি সেও চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, ব্যক্তিটি হচ্ছে আসলেই মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার সে শপথ করে বলবে যে, নিশ্চয়ই তার (নিজের) উপর আল্লাহর গযব পতিত হোক যদি তার স্বামী এ ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকে। "**

আল-কোরআন, সুরা নূর(২৪), আয়াত-৬-৯

## সুদের লেনদেন করা

## ( Usury / Taking or Paying Interest)

ক্রয়-বিক্রয় এবং সুদের কারবার এ উভয়টিই ব্যবসা এবং সাধারণত অর্থ উপার্জনের একটি পরিচিত মাধ্যম। কিন্তু ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় হালাল বা বৈধ মাধ্যম এবং সুদের লেনদেন হারাম বা বাতিল পন্থার ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত। তবে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মধ্যে সুদের কারবারের প্রচলন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুয়াত প্রাপ্তি এবং কোরআন নাযিলের প্রাক্কালে আরব সমাজে সুদ বা রিবার লেনদেন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। তারা ক্রয়-বিক্রয় ও সুদকে একই ধরনের ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করত। এ সময়ে পবিত্র কোরআনে সুদের আয়াত নাযিল হয় এবং সুদ গ্রহনের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আল্লাহ্ বলেন,

**“আল্লাহ্ তা’আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত- ২৭৫

এ আয়াত অবতীর্ন হলে সাহাবায়ে-কিরাম কোনরূপ সন্ধিগ্ধতা ছাড়াই রিবার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করে নেন এবং সাথে সাথে সুদের লেন দেন বন্ধ করে দেন। কিন্তু মুশরিকগণ সুদের উপর অবিচল থাকে। এর ধারাবাহিকতায় আজকের সমাজেও আমরা সুদের ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাই। সাড়া পৃথিবী জুড়ে চলছে সুদের রমরমা ব্যবসা। অন্যান্যদের মত মুসলিমরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। আরবের মুশরিকদের ন্যায় তাদের ধারনাও এই যে, ক্রয়-বিক্রয় এবং সুদের লেন দেনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। মূলতঃ অজ্ঞতাবশতঃ তারা ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম নন বলেই তারা এমনটি বলে থাকবেন এবং সেই সাথে নিজেদেরকেও সুদের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন বলে মনে হয়। তবে সুদ যে একটি কবীরা গুনাহ্ এ বিষয়ে ওলামাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। পবিত্র কোরআনের সাতটি আয়াত এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদিস দ্বারা সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত। তবে সুদের প্রকার ও প্রকৃতি সম্পর্কে সমাজে নানা প্রকার বিভ্রান্তি এবং মতানৈক্য বিরাজমান। কিন্তু সুদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা একজন মানুষের ঈমানী এবং নৈতিক দায়িত্ব। এর জন্য সর্বাগ্রে সুদ সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা থাকা এবং যথাযথ জ্ঞান অহরণ করা আবশ্যক। সে লক্ষ্যে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুদের মৌলিক বিষয়গুলির উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

**সুদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা:**

আরবী ভাষায় প্রচলিত রিবা শব্দের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে সুদ। সুদ বলতে মূলতঃ রিবা-কেই বুঝান হয়ে থাকে। রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অতিরিক্ত, বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় রিবা বলতে প্রত্যেক এমন অনায়াস লব্ধ অতিরিক্ত আয়কে বুঝান হয়েছে

যেটা কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আসে এবং যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই। প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ইমাম জাস্সাস রিবার অর্থ করেছেন এভাবে, '**এ এমন ঋণ, যা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ শর্তে দেওয়া হয় যে, খাতক তাকে মেয়াদ শেষে মূলধন থেকে কিছু বেশি পরিমান বা অতিরিক্ত অর্থ দেবে**'। ইসলামী দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ উমর চাপড়ার মতে শরি'আয় রিবা বলতে, '**ঐ অতিরিক্ত অর্থকেই বোঝায় যা ঋণের শর্ত হিসেবে মেয়াদ শেষে ঋণগ্রহীতা অতি অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য**'। বিশিষ্ট পন্ডিত ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রিবা সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ অর্থপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মতে, '**রিবা হলো এমন শর্তপূর্ণ ঋণ যেখানে খাতক মেয়াদ শেষে ঋণদাতাকে কর্জের পরিমানের অতিরিক্ত প্রদান করবে**'। এ আলোচনা থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কাউকে ঋণ দিয়ে কোন ঝুঁকি ছাড়াই তার মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্রহণ করাই সুদ বা রিবা। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তৎকালীন আরব সমাজে যে প্রকৃতির লেন-দেনকে রিবা হিসেবে গণ্য করা হত এবং যার বিপরীতে পবিত্র কোরআনে সুদের নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়েছে, সেটাকেই সুদের মূলনীতি হিসেবে বিবেচনায় রাখতে হবে। অন্যথায় মানুষ সুদের মত জটিল বিষয়ে যে কোন ধরনের অপব্যাখ্যার বশঃবর্তী হয়ে সুদের শিকারে পরিণত হতে পারে। জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসীদের সকলেরই রিবা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটার ব্যাপক প্রচলনও ছিল। সে যুগে তারা প্রথাসিদ্ধভাবে ঋণ দিত এবং শর্ত অনুসারে ঋণের উপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ আদায় করত, কিন্তু আসলের পরিমান থাকত অপরিবর্তিত। যখন ঋণের মেয়াদ শেষ হত এবং ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হত তখন সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেয়া হত। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, সে সময় আরব সমাজে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ আদায় করা হত, তেমনি ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত মূলধনের উপরও সুদ গ্রহনের রীতি প্রচলিত ছিল। এ উভয় প্রকার সুদকেই তখন আরবী ভাষায় রিবা বলা হতো এবং পবিত্র কোরআনে এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

**সুদের বৈশিষ্ট্য এবং সুদ ও মুনাফার পার্থক্য:**

তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত রিবার প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সুদ এক প্রকারের অতিরিক্ত অর্জন, যেখানে কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়:

- সুদের উদ্ভব হয় ঋণের ক্ষেত্রে
- সুদ পূর্ব নির্ধারিত শর্তপূর্ণ আয় যা মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে অর্জিত হয়।
- সুদ মেয়াদ ভিত্তিক আয়
- সুদ ঝুঁকি বিহীন আয়
- সুদ শ্রমহীন উপার্জন

আমরা জানি যে সুদ এবং মুনাফা এদু'টোই অতি পরিচিত অর্থ উপার্জনের মাধ্যম। কিন্তু এ দু'এর মধ্যে প্রকৃতিগত বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। অনেকে সুদ ও মুনাফাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করে

থাকেন। ‘সুদ-তো মুনাফার মতই’ একথা বলতে তারা দ্বিধা করেন না। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে শরীয়তের মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই সুদ বা মুনাফা চিহ্নিত হতে হয়। সেক্ষেত্রে যারা নিজের খেয়াল-খুশীর বশঃবর্তী হয়ে কল্পনা প্রসূত খোড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে সুদকে মুনাফা বলে চালিয়ে নেয়ার অপচেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছেন তারা আসলে বোকার স্বর্গে বাস করছেন এবং আপাদমস্তক পাপের পঙ্কিল সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছেন। সে অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে তাই সুদ ও মুনাফার মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্যগুলি জেনে নেয়া আবশ্যক। সুদ বা রিবা এবং মুনাফা বা লাভ এর মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ:

| সুদ | মুনাফা |
|---|---|
| ক) সুদ হলো ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে প্রদেয় মূল অর্থের সাথে অতিরিক্ত অর্থ। | ক) মুনাফা হল উৎপাদন মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য। |
| খ) সুদ পূর্বনির্ধারিত এবং মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে কষিত হয়। | খ) মুনাফা অর্জিত হয় পরে। এটা অনিশ্চিত এবং সুনির্ধারিত কোন হারে হয় না। |
| গ) সুদ কখনই ঋণাত্মক হয় না। | গ) মুনাফা ঋণাত্মক এমনকি শূন্যও হতে পারে। |
| ঘ) সুদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। | ঘ) মুনাফায় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা উভয়ই বিদ্যমান |
| ঙ) সুদ শ্রমবিহীন সম্পদ, কেবলমাত্র সময় বিনিয়োগের ফল। | ঙ) শ্রম, সম্পদ ও সময় বিনিয়োগের ফল। |
| চ) শর্ত আরোপিত আয় | চ) শর্তবিহীন আয় |

www.waytojannah.com

**সুদের কুফল:**

সুদের কারবার একজন সুদ গ্রহীতার জীবনে আপাতঃ স্বচ্ছলতা বয়ে আনলেও এর কোন সুদূর প্রসারী সফলতা নেই। সুদের কারবারের মধ্যে যে উপকার নিহিত রয়েছে তা সাময়িক ও অস্থায়ী। অপরপক্ষে এর ক্ষতিকর দিকটা দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী। প্রকৃতপক্ষে সুদের কারবারের লব্ধ অর্থ বরকতহীন এবং তা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় আয়। আল্লাহ্ তা'আলা নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্র বা হালাল আয় পছন্দ করেন। সুদ হচ্ছে অপবিত্র বা নোংরা আয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেন। তিনি সুদকে ঘাটতি, অকল্যাণ ও দুঃখের আধার বানিয়েছেন। সুদের আয় মানুষের জীবনের সকল শান্তি কেড়ে নেয়। বাহ্যত চর্মচক্ষু দিয়ে কিছু সম্পদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দেখা যেতে পারে; কিন্তু এতে মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও প্রকৃত সমৃদ্ধি আসে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে,

**"আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত- ২৭৬

সুদের কুফল সুদূরপ্রসারী এবং সর্বগ্রাসী। গোটা মানব সভ্যতার জন্য সুদ এক প্রচণ্ড অভিশাপ এবং সাক্ষাৎ বিপদ। সুদী ব্যবস্থার অধীনে মানবতাবোধ এবং কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। সুদী ব্যবস্থায় যেমন রয়েছে ব্যক্তিগত কুফল, তেমনি তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিকুল প্রভাব সৃষ্টি করে। সুদের এ সকল কুফলগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হল:

ক) সুদের নৈতিক কুফলঃ

- সুদ মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তথা দানশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা ও সহানুভূতিকে হ্রাস করে দেয়। সুদ হচ্ছে মানুষের উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক। সুদের কারণে মানুষ চারিত্রিক দিক দিয়ে হায়নার স্তরে এসে পৌঁছায়। এই সুদ মানুষের মধ্যে নৃশংসতা, নির্মমতা, সংকীর্ণতা ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করে। সুদখোরেরা কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হবার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। মোটকথা সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মনোভাব তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়।
- সুদ মানুষকে উদাসীন ও কর্মবিমুখ করে তোলে। বিনাশ্রমে বিনাকষ্টে সুদের আয় হাতে আসে বলে ব্যক্তি জীবনে অলসতা চলে আসে
- সুদ মানুষের দক্ষতা এবং সুস্থ ও সূক্ষ্ম বিবেক বুদ্ধি হ্রাস করে দেয়। ফলে বিভিন্ন আচার-আচরণে তাদেরকে নির্বোধ বলে প্রতীয়মান হয়
- সুদ মানুষের লোভ লালসা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করে দেয়। সুদখোরের আত্মার অপমৃত্যু ঘটে বলে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন অপকর্ম সংঘটিত হয়।

www.waytojannah.com

- সুদ মানুষকে যালিম ও অত্যাচারী করে তোলে। ফলে সে দুর্বলের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না।

খ) সুদের সামাজিক কুফল:

- গোটা মানব সভ্যতার জন্য সুদ এক প্রচণ্ড অভিশাপ এবং সাক্ষাৎ বিপদ। এ ব্যবস্থা সামাজিক অবক্ষয়ের একটি অন্যতম প্রধান কারন। সুদী ব্যবস্থার অধীনে সুস্থ মানবতাবোধ ও কল্যাণকর সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।
- সুদ মানুষের সুস্থ বিবেক বুদ্ধির বিলোপ সাধন করে ও সকল প্রকার সৌভাগ্যের দ্বার রুদ্ধ করে দেয় এবং সামাজিক উন্নয়নের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে দেয়। কেননা সুদ প্রদানের শর্তে ঋণ গ্রহণ করে যে ব্যবসা বাণিজ্য করা হয় তার উদ্দেশ্য কোন জনকল্যাণ নয় বরং অধিক মুনাফা অর্জনসহ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করা।
- সুদী সমাজব্যবস্থায় মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মন মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এক পর্যায়ে মানুষ মানবতাবিরোধী কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।
- সুদ সমাজে পরস্পরের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি ও ঝগড়া ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দেয়।
- সুদভিত্তিক সমাজে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ইত্যাদিসহ যাবতীয় গর্হিত ও অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

গ) সুদের রাজনৈতিক কুফল

- সুদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সমাজে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, সন্ত্রাস, মাস্তানি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তিগত বা সামাজিক নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়।
- সুদের কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

ঘ) সুদের অর্থনৈতিক কুফলঃ

সুদ হলো পুঁজিবাদী অথনীতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে, ধনী আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে সুদ তাদের মধ্যে সেরা। কৌশল, পদ্ধতি, ফলাফল, অর্থনীতির চূড়ান্ত অনিষ্ট সাধন- এ সকল বিচারেই সুদের কাছাকাছি কোন সমাজ বিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। সুদ দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে যে ধ্বংসের প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল:

- সুদ সমাজের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। কাজেই তাদের অনেককেই ঋণ নির্ভর হয়ে জীবন চালাতে হয়।

কিন্তু একসময় সুদের মরণ ছোঁবল তাকে সর্বশান্ত করে দেয়। সুদের অতিরিক্ত বোঝা বহন করা তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে পরে এবং সে সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। এদিকে ঋণদাতা সময়ের ব্যবধানে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং একসময় ঋণ শোধে ব্যর্থ ঋণ গ্রহীতার সহায় সম্বল কেড়ে নেয়া হয়, ফলে সে পথের ভিখেরী হয়ে যায়।

-  সুদ মুদ্রা-স্ফীতি ঘটায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে, কেননা সুদী ব্যবস্থার ফলে গুটিকতক পুঁজিপতির হাতে সমাজ জিম্মী হয়ে যায়। এ অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনের অধিকারী হয়ে যায়। তারা ইচ্ছামত সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি করার পায়তারায় লিপ্ত থাকে এবং উচ্চতর মূল্যে জিনিস বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত করে নেয় এবং সমাজের তথা জাতির গাঁট খালি করে দেয়। যদি গোটা জাতির পুঁজি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালনপালন না করা হতো এবং সবাই ব্যক্তিগত পুঁজিদ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংস্ররাও গোটা ব্যবসা বানিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের সুযোগ থাকলে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার লাভ করতো। এতে করে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে এর নিশ্চিত প্রভাব পরতো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও অর্জিত হত।
-  সুদ সমাজে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করে। গোটা জাতি যখন সুদ নির্ভর গোটাকয়েক বড় প্রতিষ্ঠানের হাতে জিম্মি হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা কেন্দ্র পরিচালনার সাহস হারিয়ে ফেলে। তাই কোন ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কলকারখানা গড়ে উঠে না এবং নিয়োগের নতুন সম্ভাবনারও সৃষ্টি হয় না। এর ফলে বেকার সমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।
-  সুদী ব্যবসা জাতীয় উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। সুদী ব্যবস্থায় ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া দেশের অর্থনীতির জন্য সমুহ ক্ষতির কারণ। এ অবস্থায় জাতির অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাতে অতি উচ্চ হারে আয়কর ও ভ্যাট সহ নানা প্রকার কর ধার্য করা হয়। আবার জাতীয় উন্নয়ণের স্বার্থে চড়া সুদে বৈদেশিক ঋণ নেয়া হয়। শুধু তাই নয় এই ঋণের সাথে জড়িত থাকে নানাবিধ শর্ত যেটা জাতির জন্য কোনভাবেই কল্যণকর নয়। তাকে যে কোন মূল্যে দাতাগোষ্ঠির মুখপানে তাকিয়ে থাকতে হয় এবং একসময় গোটা জাতি পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে ধ্বস নামে।

**রিবা বা সুদের ধরন ও প্রকৃতি:**

সুদের ধরন বা প্রকার ও প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের জন্যই অতি আবশ্যক। কেননা এ বিষয়ে পর্যাপ্ত বাস্তব ধারনা না থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষের পদে পদে সুদের মধ্যে জড়িয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তবে সুদের প্রকার এবং সুদ সম্পর্কিত

বিস্তারিত জানার জন্য প্রথমেই আমাদেরকে তৎকালীন জাহিলিয়াতের যুগে কোরআন নাযিলের সময়কার আরব সমাজে প্রচলিত রিবার লেনদেনের উপর দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কেননা সে সময়ে প্রচলিত রিবার উপর ভিত্তি করেই কোরআনে সুবিদিত সুদের নিষেধাজ্ঞার আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় রিবা বলতে যা বোঝান হতো বা সাহাবাগণ যে অর্থে রিবা বোঝতেন এবং সর্বোপরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিবার যে প্রকৃতি বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটাকেই সুদের মূলনীতি হিসেবে জানতে হবে। ইসলামী শরি'আ অনুসারে রিবা দুই ধরণের:

ক) রিবা-ই নাসাআ
খ) রিবা-ল ফাদ্বল।

রিবা-ই নাসাআ হল বাকীতে ঋণের সুদ অর্থাৎ ঋণের সেই মেয়াদকালকে বলা হয়, যা ঋণদাতা মূল ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমান অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণ গ্রহীতাকে নির্ধারণ করে দেয়। এই প্রকারের রিবাই জাহেলী যুগে সাধারণভাবে আরব সমাজে পরিচিত ছিল। এই সুদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তফসীরবিদগণ প্রায় একই ধরনের বিবরণ দিয়েছেন। ইমান আবুবকর আল জাসসাস 'আহকামূল কোনআন' গ্রন্থে বলেন যে জাহিলিয়াতের যুগে ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া ঋণের মধ্যে রিবার প্রচলন ছিল। ঋণ গ্রহনের সময় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হতো। তাতে স্বীকার করে নেওয়া হতো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধনের উপর একটি নির্ধারিত পরিমান অতিরিক্ত সহ আসল মূলধন ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে। তফসীর ফি যিলালীল কোরআন গ্রন্থে মোজাহেদের উদ্ধৃতিতে বলা আছে যে, জাহেলী জমানায় মানুষে মানুষে ঋণের লেন দেন হত, তখন ঋণদাতা বলত যদি তুমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য বা পণ্য পরিশোধ না কর তাহলে এই পরিমানে বাড়তি মূল্য দিতে হবে, তাহলেই তোমাদের সময় দেয়া যাবে। ঐ একই গ্রন্থে হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর একটি রেওয়াত পাওয়া যায়, তিনি বলেন যে, জাহিলি জমানায় যে রিবা প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য কোন পণ্য বিক্রি করতো তখন সেই নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে ঐ পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিত এবং এইভাবে মূল দ্রব্য বা মূল্য পরিশোধ করার জন্য সময় দিত। প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনু জারীর তার তাফসীর ইবনু জারীর গ্রন্থে বলেন, 'জাহেলী যুগে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ রিবা হল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ গ্রহণ করা।' আরবরা তা-ই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত।

ইমাম রাযী তার তাফসীরে বলেছে যে, আরব সমাজে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাউকে তার সম্পদ দিত এবং শর্ত লাগাত এই বলে যে, প্রতি মাসে সে ঐ ব্যক্তি থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমানের অর্থ নিতে থাকবে। কিন্তু প্রদত্ত মূল অর্থ গ্রহীতার কাছেই রয়ে যাবে। চুক্তির মেয়াদ

শেষ হয়ে গেলে সে মূলটা ফেরত চাইত, দিতে না পারলে বা কোন ওযর পেশ করলে ঋণদাতা পাওনার অংক ও সেই সাথে পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিত। তাফসীর ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা সুদের উপর ঋণ প্রদান করত। ঋণ পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত হতো। ঐ সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা হত। এভাবে চক্রাকারে সুদ বৃদ্ধি করে মূলধণ কয়েক গুণে বৃদ্ধি করা হত। এ প্রকারের সুদের লেন দেনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে পবিত্র কোরআনে একটি আয়াত নাযিল হয়েছে,

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুনের উপর দ্বিগুন সুদ ভক্ষণ করো না। এবং আল্লাহকে ভয় করো যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।**

আল কোরআন, সুরা আলে-ইমরান(৩), আয়াত- ১৩০-১৩১

আলোচ্য আয়াতে চক্রবৃদ্ধি হারে নির্ধারিত সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে যা তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল।

এতক্ষণের আলোচনায় বিভিন্ন তাফসীরবিদগণের মতামতের ভিত্তিতে জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত নাসাআ প্রকারের সুদের প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া গেল, যার সার কথা হলো বাকিতে বিক্রয় বা ঋণ দানের মাধ্যমে সময়ের ব্যবধানে বা মেয়াদের হিসেবে খাতকের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য বা পণ্য গ্রহণ করাই হচ্ছে রিবা-ই নাসাআ। সেই সাথে এটাও পরিস্কার হয়ে গেল যে, সুদ- তা সরল সুদই হোক আর চক্রবৃদ্ধি হারেই হোক, সকল প্রকার সুদ খাওয়াই হারাম।

দ্বিতীয় প্রকারে সুদ রিবা-ল ফাদ্বল-এর উদ্ভব হয় পণ্য সামগ্রী হাতে হাতে বা নগদ বিনিময়ের মাধ্যমে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমানের সাথে বেশী পরিমানের পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমানকে বলা হয় রিবা-ল ফাদ্বল। এ প্রকারের সুদ যদিও সাধারণভাবে আরবের প্রচলিত প্রথা ছিলনা, তবুও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েক রকম জিনিসের বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়কে এ রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এগুলির হাতে হাতে বিক্রী বা বিনিময় প্রাক্কালে কম-বেশী হলে তা সুদ হবে। এ সম্পর্কে সহীহ সনদে বেশ কিছু হাদিস পাওয়া যায়। হাদিসগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল। আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"পরিমানে সমান সমান না হলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রী করো না; বরং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য এবং রৌপ্যেও বিনিময়ে স্বর্ণ যেইভাবে ইচ্ছা বিক্রী কর।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং২০২৭

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

**“দিনারের পরিবর্তে দিনার উভয়টি একটি অপরটির হতে বেশী হতে পারবে না এবং দেরহামের পরিবর্তে দেরহাম উভয়টির মধ্যে একটি অপরটির হতে বেশী হতে পারবে না।”**

হাদিস, সহীহ মুসলীম শরীফ, নং ৩৯২৬

প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবনের বিনিময়ে লবন সমান সমান এবং হাতে হাতে হবে। যে ব্যক্তি বেশী দিয়েছে বা নিয়েছে সে সুদী কারবার করেছে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান।”**

হাদিস, সহীহ মুসলীম শরীফ, নং ৩৯২১

অন্য এক হাদিসে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, একদা বিলাল (রাঃ) রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমীপে কিছু উন্নতমানের খেজুর নিয়ে হাজির হলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

**“তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বেলার (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমাদের খেজুর নিকৃষ্টমানের ছিল। আমি তার দুই ছা ’-এর বিনিময়ে এক ছা’ উন্নতমানের বারমী খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ওহ! এতো নির্ভেজাল সুদ, এতো নির্ভেজাল সুদ। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, তাহলে নিজের খেজুর বাজারে বিক্রী করে তার মূল্য দ্বারা উহা খরিদ করবে।”**

হাদিস, সহীহ মুসলীম শরীফ, নং ৩৯৪০

**আমাদের সমাজে প্রচলিত সুদ:**

পবিত্র কোরআনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘রিবা’-এর প্রচলন শুধু তৎকালীন আরব সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল- তা নয়; যুগ যুগ ধরে পৃথিবীব্যাপী এ সুদের কারবার অতীব সমাদৃত হয়ে আসছে। বর্তমান সময়েও সারা পৃথিবী জুড়ে সুদ, Interrest, Usury ইত্যাদি নামে রয়েছে এর রমরমা ব্যবসা। আমাদের সমাজেও বিভিন্নভাবে এ সুদের সাথে জড়িয়ে আছে দেশের সিংহভাগ মানুষ। তবে এদের মধ্যে অনেকেই জেনে-শুনে সুদের কারবার করছেন, কেউবা না জেনে সুদের সাথে

www.waytojannah.com

জড়িয়ে রয়েছেন আবার কেউবা সুদের অপব্যাখ্যা বা ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে নিজে ডুবছেন এবং অন্যকেও ডুবাচ্ছেন। এই শেষ প্রকারের জটিলতার মধ্যেই বোধকরি সমাজের অধিকাংশ লোক ফেঁসে গেছেন। তবে যারা এ সমাজ বিধ্বংসী জটিলতা তৈরী করছেন তারা সমাজের সাধারণ মানুষদের এ ধারনা দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, সমাজ উন্নয়ন ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় লেনদেন ও ব্যবসা বানিজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মুচিত হয়েছে এবং নতুন নতুন পদ্ধতিতে ব্যবসা বানিজ্য চালু হয়েছে, সেই সাথে জীবন যাত্রার মান বেড়েছে এবং তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও অধুনা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ব্যবসা বানিজ্যে তৎকালীন নিয়ম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এর ভিত্তিতে আজকের দুনিয়ায় সুদ বা রিবা নির্ধারণ করা বাস্তবতা বর্জিত। এ ছাড়াও তাদের অনেকেই কোরআন ও হাদিসে যে রিবার উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ করেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণে দেওয়া ঋণের বিনিময়ে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ বা Usury। এদের মতে, ব্যবসায়িক কাজে লগ্নিকৃত অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় বাড়তি অর্থ বা Interest এ থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন। কেননা এখানে কারো উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না; বরং ব্যবসায়িক লেন দেনের মতই উভয়ের সম্মতিক্রমেই সুদের হার স্থীরিকৃত হয়ে থাকে। তাই তারা ব্যবসায় লগ্নিকৃত অর্থ বা আজকের দিনে বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহ কর্তৃক আদায়কৃত সুদ বা Interest নির্দোষ এবং বৈধ ভাবেন। তবে এ ভাবনা নিয়ে যারা ব্যস্ত রয়েছেন এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে যাচ্ছেন তারা আসলে বোকার স্বর্গে বাস করছেন। তারা একটি বারও ভেবে দেখেছেন কি যে, জাহেলী যুগে ব্যক্তিগত লেনদেনের বাইরেও ব্যবসা বানিজ্যের জন্য রীতিমত পুঁজি লগ্নি করা হত এবং সে জন্য সুদ আদায় করা হত। সে সময়ে অনেকেই আজকের মত ফার্ম খুলে এজেন্ট নিয়োগ করে সুদে পুঁজি খাটাত। তাদের আদায়কৃত সুদকে আরবীতে রিবা-ই বলা হত যা কোরআন দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তাই যারা Interest কে Usury - থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করার মাধ্যমে Interest কে বৈধ ভাবেন বা Interest কে মুনাফা হিসেবে বিবেচনা করেন বা স্বীকৃতি দিতে চান তারা আসলে বিশেষ মন্দ মতলব হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেন। তাদের অবস্থা অনেকটা কাকের ময়ূর সাজার মত ব্যপার। কাকের লেজে ময়ূরের পুচ্ছ লাগালেই যেমন কাক ময়ূর হয়ে যায়না তেমনি Interest আখ্যা দিয়ে সুদকে মুনাফা বলেও চালানো যায়না। বাস্তব কথা হচ্ছে যে তৎকালীন আরবে যা রিবা হিসেবে বিবেচিত ছিল, সেটাকেই সুদের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং এর উপর ভিত্তি করেই বর্তমান জমানার সুদের প্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে। বর্তমান সমাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ের সুদ থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুদী ব্যবস্থার প্রচলন সর্বজনবিদিত। এর অধিকাংশ লেনদেন নাসাআ প্রকারের সুদের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে এর বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হল:

ক) ব্যক্তিগত ঋণের মাধ্যমে সুদ:

এই প্রকারের সুদের লেনদেন হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। এখানে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য শর্তের ভিত্তিতে সম্পদ বা অর্থ ঋণ দান করে। শর্ত অনুযায়ী মেয়াদ শেষে ঋণ গ্রহীতে একটি নির্দিষ্ট পরিমানের বর্ধিত সম্পদ বা অর্থসহ আসল অর্থ ঋণ দাতাকে ফেরত

দিবে। আসলের পরিমান ঠিক রেখে মাসিক বা বাৎসরিক হিসেবেও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করার চুক্তিও হতে পারে। এভাবে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ঋণের মাধ্যমে মূলধনের উপরে সময়ের বিনিময়ে অর্জিত অতিরিক্ত অর্থই সুদ হিসেবে চিহ্নিত। এ ধরনের সুদের কারবার আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন সময় ঋণদাতা চক্রবৃদ্ধি হারেও সুদের দাবী করে থাকেন। সাধারনতঃ সমাজের ধন্যাঢ্য ব্যক্তি বা মহাজন নামে খ্যাত ব্যক্তিগণ এ প্রকারের সুদ ভিত্তিক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকেন। সমাজের বাস্তবতায় দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে বসত বাড়ী কিংবা চাষের জমি বন্ধকী রাখা হয়-যার পরিণতি অনেক সময় ভয়াবহ আকার ধারন করে। সময়মত ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে মহাজন বন্ধকী জমি, ভিটে-মাটি কেড়ে নেয়, ফলে ঋণের দায়ে সর্বস্ব হারিয়ে ঋণগ্রহীতাকে পথে নামতে হয়। ইয়াতিমের বিলাপ, অসহায় বিধবার করুণ আর্তনাদ, শোকাহত আত্মীয়-স্বজনের আহাজারি, এর কোন কিছুই সুদখোরের পাষাণ হৃদয় গলাতে পারে না। এ নিষ্ঠুরতার বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়ত অনেকেরই আছে।

ব্যক্তি পর্যায়ের আরেক ধরনের সুদের লেনদেন আছে যেখানে কোন ব্যক্তি অন্যকোন ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য ঋণ দিয়ে থাকেন এই শর্তে যে, মাসিক অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী ঋণদাতার প্রদেয় আসলের উপরে একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদান করতে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ ‘ক’ লোকটি ‘খ’ লোককে ৫০০০/ টাকা ব্যবসার জন্য ঋণ দিল এই শর্তে যে প্রতিমাসে ‘খ’ আসল টাকার উপরে ১০% হারে মুনাফা ‘ক’-কে প্রদান করতে থাকবে, কিন্তু আসল থাকবে অপরিবর্তিত। এধরনের লেনদেনকে অনেকেই সুদ না ভেবে ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফা ভেবে থাকেন। তবে যারা এমনটি ভাবেন তাদের জেনে নেয়া উচিত যে, এধরনের লেনদেন প্রকৃতপক্ষে সুদের লেনদেনের মধ্যেই গণ্য হয়। তবে এ পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন এনে যদি উভয়ের সম্মতিতে ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফা ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়, তাহলে সেটার বৈধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ব্যবসায়ে লোকসানের ভারটিও যোগানদাতাকে বহন করতে হয় বলে এধরনের লেনদেন অংশীদারিত্বের ব্যবসা হিসেবে পরিচিত এবং এ ব্যবসা শরি'আর দৃষ্টিতে বৈধ প্রমানিত- যাকে আরবীতে মুদারাবা প্রকৃতির ব্যবসা বলা হয়।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের সুদ:

যে ধরনের সুদের লেনদেন সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রচলিত আছে, তা এ প্রকারের সুদী ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকারের সুদের মধ্যে জড়িত আছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, পোষ্ট অফিস এবং এনজিও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু আছে রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান আবার কিছু আছে প্রাইভেট বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের বা আয়ের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এটা যদি হালাল জিনিসের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয় এবং যদি এর কার্যক্রম স্বাভাবিক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এর মাধ্যমে অর্জিত আয় মুনাফা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ আয়কে সুদ বলার ধৃষ্টতা বোধ করি কারও নেই। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানে বাকিতে বিক্রী করে সময়ের ব্যবধানে অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান করার

প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানে এই অতিরিক্ত নেওয়াটা নিঃসন্দেহে সুদ হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু যদি বাকী বিক্রী করে প্রকৃত বিক্রয়মূল্যটি-ই কিস্তিতে বা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আদায় করে, তাহলে সেটা সুদ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

ব্যাংক, বীমা, ডাকঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সরকারী হোক আর ব্যক্তিমালিকানাধীন কিংবা যৌথমালিকাধীন বেসরকারীই হোক, সকল প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি এবং পলিসি প্রায় একই ধরনের। এসব প্রতিষ্ঠান জমানতের টাকার উপরে সময়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়ে থাকে। আবার ঋণের টাকার উপরেও তারা গ্রাহকের কাছ থেকে একইভাবে বা বর্ধিত হারে সুদ গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রচলিত সুদী ব্যাংকিং এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। সুদী ব্যাংকিং এর লেনদেন সবই সুদের সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম এবং শরি’আ মোতাবেক পরিচালিত সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার একটি পরিচ্ছন্ন এবং বৈধ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমানতদার এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উভয়ের লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার পরিচালিত হয়ে থাকে এবং হালাল লভ্যাংশ সবাই মিলে ভাগ করে নেয়া হয়, সেই সাথে লোকসানের ভাগও আমানতদারকে বহন করতে হয়। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত আয় হালাল এবং সুদমুক্ত। তাই দেশের সকল ব্যাংক-ই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শরি’আ মোতাবেক ব্যবসা করার জন্য আগ্রগামী হওয়া উচিত।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নামে এনজিও প্রতিষ্ঠান সমাজের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে। ব্রাক ব্যাংক ও গ্রামীন ব্যাংক এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এরা প্রায় সকলেই সুদের লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এরা ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের নামে এ সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে যাচ্ছে। তারা ঋণের বিপরীতে উচ্চহারে সুদ গ্রহন করে সমাজ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করে চলছে আর এদিকে সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এমনকি কোন কোন পরিবার নিঃস্ব হয়ে পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে। তবে একথা সত্য যে, এনজিও তৎপরতায় কিছুটা ইতিবাচক প্রভাবও সমাজে পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, সমাজ কিছুটা গতিশীল হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কর্মতৎপরতা কিছুটা বেড়েছে। কেননা সুদের অর্থ যোগান দিতে তাদেরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কিন্তু এর উল্টো পিঠের সামাজিক বাস্তবতাও একবার দেখে নেওয়া দরকার। ঋণের সহজপ্রাপ্যতার কারনে সমাজের সাধারণ মানুষের হাতে কিছু কাঁচা পয়সার আমদানি হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে বটে! তবে সেই সাথে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি ব্রেকহীনভাবে অব্যহত রয়েছে। অন্যদিকে শ্রমের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে অধিকাংশ মানুষের জীবন যাত্রায় নাভিঃশ্বাস উঠতে রয়েছে। এ অবস্থা সমাজের জন্য কাম্য নয় এবং কোনভাবেই সুখকর নয়।

**সুদের গুণাহ ও সুদখোরের পরিনতি:**

সুদ শুধু পার্থিব জীবনের কুফল বয়ে আনে তাই নয়, সুদের মধ্যে রয়েছে আখিরাতের অকল্যাণ ও চরম অশান্তি। পবিত্র কোরআনে বহু ধরনের গুণাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং এসবের জন্য কঠিন শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে যত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে অন্য কোন গুনাহের ব্যপারে এমনটি করা হয়নি। সুদের নিষেধাজ্ঞা সহ সুদের গুণাহ এবং এর শাস্তি সম্বলিত পবিত্র কোরআনে সাতটি আয়াত এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদিস রয়েছে। এপর্যায়ে কিছু হাদিস এবং কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলি ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে সুদের গুণাহ এবং সুদখোরের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলোঃ

কিয়ামতের দিন সুদখোরের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

**"যারা সুদ খায় তারা এমনভাবে দন্ডায়মান হবে (কিয়ামতের মাঠে), যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি যার উপর শয়তান আছর করেছে। এটা এ কারণে যেহেতু তারা বলে, ব্যবসা-বাণিজ্যতো সুদের মতোই- অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পূনরায় গ্রহণ করে (সুদ) তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত- ২৭৫

এ আয়াতে প্রথমে সুদখোরের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছণা ও ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সুদখোর লোকেরা হাশরের ময়দানে কবর হতে পাগল বা উম্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জ্বিন দিশেহারা করে দেয়। তারা দাঁড়াতেও পারবে না। তারা শয়তান কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে। অতঃপর বলা হচ্ছে সুদকে হারাম করার পরে যারা সুদের লেনদেন থেকে বিরত হয়েছে এবং তাওবার উপর অটল রয়েছেন তারা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হবেন বলে আশা করা যায় এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের পূণ্যকে বিনষ্ট করবেন না। পক্ষান্তরে যে সুদের উপর অবিচল রয়েছে এবং পূণরায় সুদের কারবারে লিপ্ত হয়েছে, তার এ কার্যে গুণাহ্ হওয়ার কারণে সে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে।

এর পরবর্তী আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ মুমিনদের সম্বোধন করে সুদের উপর যারা অব্যহত রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আরো কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

**"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি**

**তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা  না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত- ২৭৮-২৭৯

এখানে প্রথমেই আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য মোমেনদেরকে সুদের সমস্ত প্রকার বকেয়া লেনদেন ছেড়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ঈমানের দাবীতে কারো জন্যই সুদের লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কোন অবকাশ নেই। পরবর্তী আয়াতে ঐ সব লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জেনে নেয়া সত্বেও ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনানো হয়েছে। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তর গুণাহের কারণে কোরআন পাকে এতবড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি।

হাদিসের বর্ণনায় এসেছে যে, সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"চার শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং তাদেরকে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ উপভোগ করতে দেবেন না। এরা হচ্ছে ১. মদ্য পানকারী ২. সুদখোর ৩. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী এবং ৪. মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান।**

তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৭৪৪

পরকালে সুদখোরের কি প্রকারের শাস্তি হতে পারে সে বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"মিরাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করি, যাদের পেট ছিল গৃহের ন্যায় বিশাল, যার তথ্যে বিভিন্ন রকমের সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা সুদখোর।"**

হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ, নং ২২৭৩

সুদের গুণাহ যে শুধু সুদখোরের উপর বর্তায় তা নহে- সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই সমভাবে এ গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)। তিনি বলেন,

**“রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী এবং সুদের লেখক, সকলেরই উপর অভিসম্পাত করেছেন।”**

হাদিস: আবুদাউদ শরীফ নং ৩৩০১/ তিরমিযী শরীফ নং ১১৪৪

এ হাদিস অনুযায়ী সুদের মারাত্মক গুণাহ এবং এর পরিণতি সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই অবধারিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ওলামাগণ সুদী ব্যাংকে চাকুরী করাকেও না-জায়েয বলেছেন।

প্রিয় পঠকবৃন্দ! সুদের শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করুন এবং সময় থাকতে সুদের সাথে কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা থাকলে তা ছেড়ে দিয়ে আখেরাতের সাফল্য অর্জনে সচেষ্ট হউন।

## শরাব বা মদ্যপান করা

## (Drinking Liquor/ Alcoholic Beverages)

মদ বা শরাব একপ্রকার নেশার বস্তু। মদ হচ্ছে যাবতীয় কু-কর্ম ও গর্হিত কাজের প্ররোচনার উৎস। মদ্যপান মানুষের বিচার বুদ্ধিকে নাশ করে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কোরআন নাযিলের প্রাক্কালে আরব সমাজে মদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পর্যায়ক্রমে মদের উপর নিষেধাজ্ঞার আয়াতগুলি নাযিল করেন এবং সবশেষে মদকে সম্পূর্ণ হারাম করে সুরা মায়িদায় এ আয়াতটি নাযিল করেন,

**"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর এসব ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত- ৯০

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মদ্যপানকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তান তো এটাই চায় যে, মানুষের পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হোক এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফেল থাকুক। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে মদ থেকে দূরে থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। এটা মানুষকে কু-কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার এলাহী ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের সাফল্য। এ আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপান বা মাদক সেবন হারাম হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। হাদিসের মাধ্যমেও মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে ওমর (রাঃ) এর বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যা নেশার উদ্রেক করে তাই মদ। আর নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম।"**

হাদিস, মুসলীম শরিফ, নং ৫০৫১

সকল প্রকার মদ বা মাদকদ্রব্যই হারাম এবং মদ্যপান একটি কবীরা গুণাহ্, এ সম্পর্কে শর'ই বিশেষজ্ঞ ওলামাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং মদ্যপান থেকে প্রত্যেকেরই দূরে থাকা উচিত। এজন্য মদ বা মাদকদ্রব্য সম্পর্কে পুরোপুরি বাস্তব ধারনা থাকাও অতি আবশ্যক।

**মদ কি? এবং মদের প্রকার:**

মদ এক প্রকার নেশার বস্তু যা মানুষের স্নায়ু ও মস্তিস্কের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এর ফলে মানুষের বুদ্ধিমত্তা লোপ পায় এবং নানা প্রকার অস্বাভাবিক আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, মদ হচ্ছে এমন সব নেশার বস্তু যা মানুষের বিবেক-

বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে বা মানুষকে মাতাল করে তোলে। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় বা নাশ করে দেয় এমন সব মাদক দ্রব্যই মদ। এভাবে প্রত্যেক নেশার বস্তুই মদ হতে পারে যদি সেটা মানুষের জ্ঞান এবং বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তিতে লোপ করে দেয় এবং সুস্থ স্বাভাবিক কাজ-কর্মকে ব্যাহত করে ফেলে। এ ধরনের অনেক বস্তুই আছে, সেটা যে নামেই থাকুক, মদ বা মাদকদ্রব্য হিসেবেই সেটা চিহ্নিত হবে। আমাদের সমাজে বিভিন্ন প্রকার নেশার সামগ্রী প্রচলিত রয়েছে, এর মধ্যে সবগুলি মদ না হলেও অধিকাংশ বস্তুই মদের আওতাভুক্ত। মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে এ্যালকোহল, চোলাই মদ, তাড়ি, ভাং, গাজা, আফিম, হেরোইন, মরফিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। উচ্চবিত্ত এবং সভ্য সমাজে পানীয় হিসেবে প্রচলিত শ্যাম্পেন, ব্রান্ডি, হুইস্কি ইত্যাদিও মদ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও মাদকের আরও একটি দিক রয়েছে, সেটা হল ড্রাগ আসক্তি।

**মদ্যপানের কুফল:**

মদ্যপান বা মাদকাসক্তির কুফল সর্বজন বিদিত। মদ মানুষকে সাময়িক উত্তেজনা, স্ফূর্তি বা মানসিক প্রশান্তি দিতে পারলেও এর কুফল সর্বগ্রাসী এবং সুদূরপ্রসারী। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং সর্বোপরি ধর্মীয় কুফল অপরিসীম। ব্যক্তিগত কুফলের মধ্যে রয়েছে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কুফল। মদ একজন মানুষের জীবনীশক্তি হ্রাস করে দেয়। মদের কারনে পাকস্থলী, লিভার, কিডনী এবং মস্তিস্ক সহ দেহের নানা অঙ্গের রোগের সৃষ্টি হয়। সিরোসিস অব লিভার এবং কিডনি অঁকেজো হওয়ার মত জীবন নাশকারী কঠিন রোগের সৃষ্টি হয় মদ্যপানের কারনে। নেশা মানুষকে সাময়িকভাবে মাতাল করে দেয় এবং বিবেক-বুদ্ধিও লোপ করে দেয়। নেশা ছুটে গেলেও তার সুস্থ-স্বাভাবিক চলাফেরা এবং কাজকর্ম ব্যহত হয়। শরাবের প্রভাবে মানুষের চেহারা নষ্ট হয়ে যায়, স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং সামগ্রিকভাবে তার শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অতি অল্প বয়সেই তার শরীরে বার্ধক্যের ছাপ পরে যায়।

মদ্যপান যেমন নিজের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে তেমনি তা তার পরিবার, সমাজ তথা গোটা দেশের জন্য প্রভুত অকল্যাণ বয়ে আনে। শরাবের আর্থ-সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। মাদকদ্রব্য অনেকসময় মূল্যবান হয়ে থাকে, তাই মাদক কিনতে যখন নিজের গাঁট খালি হয়ে যায় তখন সে নেশার জন্য যে কোন অবৈধ পন্থা বেছে নিতে বাধ্য হয়। এভাবে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, হাইজাকিং সহ নানা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং যার ফলে সমাজের সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হয় চরমভাবে। এখানেই শেষ নয়, মাদকের কারনে মানুষ হত্যার মত জঘন্য অপরাধ পর্যন্ত সংঘটিত হতে পারে।

**মদ্যপানের অপরাধ:**

মদ্যপানের অপরাধ গুরুতর। এটা একটি কবীরা গুণাহ। একথা সবারই জানা দরকার যে, হাদিসের পরিভায়ায় প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ আর প্রত্যেক মদ জাতীয় বস্তুই হারাম। নেশা

মানুষের ঈমান নষ্ট করে দেয়। একজন মানুষ মদ্যপ অবস্থায় ঈমানহীন থাকে, কাজেই তার দ্বারা অনেক অপকর্ম সাধিত হতে পারে। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই- এর যথার্থতা প্রমাণিত হয় আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"ব্যাভিচারী যখন ব্যাভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না, মদখোর যখন মদ পান করে তখন সেও মুমিন থাকে না।"**

হাদিস, সুনানু নাসাঈ শরীফ, নং ৫৬৬২

এছাড়াও একজন মদ্যপ ব্যক্তি ধর্ম সম্পর্কে থাকে উদাসীন। যদিও বা সে ধর্মীয় আচার পালন করে, তবুও আল্লাহর কাছে তার সে আমলের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। এ সম্পর্কে সাহাবী আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

**"যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, আল্লাহ্ তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন। ঐ অবস্থায় যদি সে মারা যায়, সে কাফির হয়ে মারা যাবে।"**

তফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৯১৪

একটি হাদিসে মদ্যপানের অপরাধকে মূর্তিপূজার গুণাহের সমতুল্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"শরাবখোর ব্যক্তি (পাপের ক্ষেত্রে) মূর্তিপুজকের সমতুল্য।"**

হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ, নং ৩৩৭৫

এ হাদিসে মদ্যপানকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করে মদ্যপানের অপরাধের ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূর্তিপূজা একটি জঘণ্য শির্ক আর মদ্যপান হচ্ছে ঐ শির্ক সমতুল্য অপরাধ।

মাদকের অপরাধ শুধু মদ্যপায়ীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই অপরাধী এবং সকলের প্রতি আল্লাহর লানত। এ বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে ওমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন,

"**রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **শরাবের উপর দশভাবে অভিসম্পাত করেছেন; স্বয়ং শরাব, তা উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা বহনকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, তার বিক্রেতা, এর মূল্য ভক্ষণকারী, তার ক্রেতা, তা পানকারী এবং তা পরিবেশনকারী - এদের**

সকলেই অভিশপ্ত।”

হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ, নং ৩৩৭৭; তিরমিযী শরীফ, নং ১৮১১

মদ্যপান যেভাবে মানুষের জীবনে সার্বিক অকল্যাণ বয়ে আনে তার একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটিতে। আল্লাহ্ বলেন,

**“শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও নামাজ হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে।”**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত- ৯১

শরাব অপবিত্র বস্তু এবং শয়তানী কাজ। তাই শরাবের প্রতিক্রিয়ায় একজন মানুষ যাবতীয় শয়তানী কাজ-কর্মেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে অতি সহজে। মদের কারণে মানুষের শুভ-বুদ্ধির বিনাশ সাধিত হয় এবং  মানুষ তখন মন্দ থেকে মন্দতর কাজে ধাবিত হয়। মদের প্রভাবে মানুষ পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ-কলহে লিপ্ত হয় এবং মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরী হয়। মদের কারণে মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকে এবং নামাজের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত থেকেও উদাসীন থাকে। মদের প্রভাবে মানুষ নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজ-কর্মে জড়িয়ে পরে অতি সহজে। এভাবে জুয়া, ব্যাভিচার এমনকি হত্যার মত জঘন্য অপরাধ সহ এমন কোন অপরাধ নেই যা তার মাধ্যমে সংঘটিত না হতে পারে। এর স্বপক্ষে একটি ঘটনা পেশ করা যায় ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে। তিনি বলেন,

**“তোমরা শরাব পরিত্যাগ কর। কেননা, তা-ই সকল অনিষ্টের মূল। তোমাদের পূর্বযুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। সে সর্বদা লোক হতে আলাদা থাকত। এক কুলটা রমনী তাকে নিজের ধোঁকাবাজীর জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক চাকরানীকে তার কাছে প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্য দানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করল। যখন সে ঘরে প্রবেশ করলো, তখন ঐ দাসী ঘরের সব ক'টি দরজা বন্ধ করে দিল। এভাবে সে আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা শরাব। সেই নারী আবেদকে বললোঃ আল্লাহর শপথ আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবেন অথবা এই শরাব পান করবেন অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বললোঃ আমাকে এই সরাবের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা শরাবই পান করালো। তখন সে বললোঃ আরও দাও। অবশেষে ঐ আবেদ তার সাথে ব্যাভিচার ব্যতীত ঐ স্থান ত্যাগ করলো না এবং সে ঐ ছেলেকেও হত্যা করল। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ করো। কেননা, আল্লাহর শপথ, শরাব এবং ঈমান কখনো একত্রিত হতে পারে না;**

বরং একটি অপরটিকে বের করে দেয়।”

হাদিস, সুনানু নাসাঈ , নং ৫৬৬৯

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন মদের প্রভাবে একজন ধর্মপ্রান আবেদ লোকও কিভাবে অতি সহজে কাবু হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য। আসলে মদ বা মাদকদ্রব্য সকল অকল্যাণ ও অঘটনের চাবিকাঠী। মদের প্রভাবে মানুষ যাবতীয় অপকর্ম করতে পারে নির্বিঘ্নে। মদ মানুষকে এমন নিম্নস্তরে টেনে নিতে পারে যে, তার দ্বারা অতি সহজেই সকল অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হতে পারে।

মদের অপরাধ শুধু ব্যক্তি কেন্দ্রীক নয় বা ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা গোটা সমাজকে কলুষিত করে। স্বাভাবিকভাবে কোন এলাকায় মদের বহুল প্রচলন ঘটলে তখন পৃথিবীতে স্বভাবতই ভূমি ধ্বস হবে, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি ঘটবে এবং আকাশ থেকে আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হবে।

**মদ্যপানের পরিণাম:**

মদ্যপানের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মদ্যপায়ী সহ মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই সমঅপরাধী এবং এদের সকলেরই উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“যে উপকার করে খোঁটা দেয়, আর যে মাতাপিতার অবাধ্য হয় আর যে সদা শরাব পান করে, এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”**

হাদিস, সুনানু নাসাঈ শরীফ, নং ৫৬৭৫

এরূপ আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু দারদা (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”**

হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ, নং ৩৩৭৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে আর একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

“যে ব্যক্তি মদ পান করে এবং মাতাল হয়- চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হয় না। যদি সে মারা যায়, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তা’আলা তার তাওবা কবুল করবেন। যদি সে পুনরায় মদ পান করে মাতাল হয় তবে তার চল্লিশ দিন নামায কবুল হবে না। যদি সে মারা যায় তবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যদি সে তাওবা করে আল্লাহ্ তা কবুল করবেন, কিন্তু সে পুনরায় শরাব পানে লিপ্ত হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা’আলা অবশ্যই তাকে ‘রাদগাতুল খাবাল’ (অর্থাৎ জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত) পান করাবেন।”

হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ, নং ৩৩৭৭

এখান থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, একজন মদখোর মদ্যপ অবস্থায় মারা গেলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তবে আশার কথা হচ্ছে, মদ্যপানের অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন, তাওবা দ্বারা এ অপরাধ ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। তবে তাওবা হতে হবে খাঁটি তাওবা। একজন মদ্যপ নিজের প্রতি যুলুম স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতে মদ্যপান পরিত্যাগ পূর্বক এর পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করে খাঁটি দিলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

## জুয়া খেলা
## (Gambling)

জুয়া একটি উর্দু শব্দ। বাংলা ভাষাতেও এ শব্দটির বহুল প্রচলন রয়েছে। জুয়ার আরবী পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে 'মাইসার'। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মাইসার শব্দটির বংলা অনুবাদ করা হয়েছে জুয়া। মাইসার অর্থ বন্টন করা। জাহিলিয়াতের যুগে আরবে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তার মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতির একপ্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে ভাগ্য নির্ধারক তীরের মাধ্যমে এর অংশ বন্টন করা হত। এতে কেউ একাধিক অংশ পেত আবার কেউ বঞ্চিত হত। তবে বঞ্চিত ব্যক্তিকেই উটের মূল্য দিতে হত। এটাকে তারা একপ্রকার খেলা হিসেবে নিয়েছিল এবং এ খেলায় অংশ গ্রহণ করাটা ছিল তাদের আভিজাত্য ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। বণ্টনের সাথে সম্পর্কের কারনেই এরূপ জুয়াকে মাইসার বলা হত। পরবর্তীতে এধরনের সকল আচরণই জুয়া হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। শরিয়তের পরিভাষায় জুয়া বলতে প্রত্যেক এমন প্রকারের সম্পাদিত কর্ম বা লেনদেনকে বুঝানো হয় যেখানে হার-জিত বা লাভ-লোকসানের বিষয়টি অস্পষ্ট বা গুপ্ত থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, জুয়া হচ্ছে একপ্রকার শর্ত আরোপিত খেলা যেখানে হার-জিতের সাথে লেনদেনের সম্পর্ক রয়েছে, তবে হার-জিতের বিষয়টি সেখানে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভর থাকে। এখানে সাধারণতঃ একাধিক পক্ষ থাকে এবং প্রত্যেক পক্ষই সম্ভাবনার উপর বাজি লড়ে থাকে। তবে ফলাফলের উপর নির্ভর করে সমস্ত অংশই নির্ধারিত হবে বিজয়ী পক্ষের অনুকূলে আর পরাজিত পক্ষ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। এইভাবে এমন সব কর্ম-কান্ড জুয়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যেখানে অদৃষ্ট বা সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে বাজী লড়ে রাতারাতি কেউ সম্পদশালী হয়ে যেতে পারে আবার কেউ সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে।

**জুয়ার প্রকার বা ধরন:**

জুয়া অনেক ধরনের হতে পারে। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন পদ্ধতির জুয়া প্রচলিত আছে। উল্লেখযোগ্য জুয়ার মধ্যে রয়েছে, লটারী, ঘোড় দৌড়, হাউজি খেলা, পাশা খেলা, দাবা খেলা, তাস খেলা ইত্যাদি। এছাড়াও যে কোন বৈধ খেলাতেও বাজী লড়ার বিষয়টি সংযুক্ত হলে তা জুয়ায় পরিণত হবে। বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের মত হালাল পেশায়ও জুয়ার প্রচলন শুরু হয়েছে।

**লটারী** প্রায় সকল সমাজেই একটি অতি পরিচিত এবং বহুল প্রচলিত খেলা এবং সমাজে প্রচলিত প্রায় সব ধরনের লটারীই জুয়া। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লটারীর বৈধতাও রয়েছে। কিন্তু লটারী বৈধ হওয়া বা অবৈধ হওয়ার বিষয়টি একটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। যে সকল লটারী তৎকালীন আরবে প্রচলিত মাইসার পদ্ধতির অনুরূপ, তা সবই জুয়া হিসেবে বিবেচিত হবে। বিষয়টি আরো পরিস্কার করে এভাবে বলা যায় যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানা এমন শর্তের উপর নির্ভর করে, যাতে মালিক হওয়া বা না-হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে এবং

যার ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ ক্ষতি উভয়টিই হতে পারে- এধরনের সকল প্রক্রিয়াই জুয়া (তফসীর মা’আরেফুল কোরআন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৯২)। তাই উক্ত মূলনীতির আওতাভুক্ত সকল প্রকার লটারীই জুয়ার মধ্যে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সমাজে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বা কোন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত লটারীর অধিকাংশই জুয়ার মধ্যে পড়ে। কেননা সেখানে জনগণের কাছে বিক্রীত টিকিটের মূল্য দিয়ে নামমাত্র কয়েকটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিপুল অংকের অর্থ সংস্থার মালিকানায় চলে যায়। এখানে যদিও মুষ্টিমেয় কিছুলোক আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হন কিন্তু সিংহভাগ জনগণই বঞ্চিত হন। শরিয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের লটারী অবৈধ এবং জুয়ার অন্তর্ভূক্ত। এভাবে যে সকল ক্ষেত্রে পুরস্কার ঘোষণার প্রলোভন দিয়ে টিকেট বিক্রী করা হয় এবং লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্তি নির্ধারণ করা হয়, সে সকল বিষয়ই জুয়া।

আজকাল ব্যবসা- বানিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও জুয়ার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায়ে প্রসার লাভের উদ্দেশ্যে বিক্রীত পণ্যের উপর কুপন সরবরাহ করে থাকেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে লটারীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক ক্রেতাকে নাম মাত্র কিছু উপহার সামগ্রী বা নগদ অর্থ প্রদান করে থাকেন। এধরনের ক্রয়-বিক্রয় জুয়ার মধ্যে শামিল।

জুয়ার মূলনীতির মধ্যে পরে না এমন ধরনের লটারীর বৈধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গৃহ চারজন অংশীদারের মধ্যে সমবন্টন করতে হবে। এখন মূল্য বিবেচনা করে গৃহটিকে সমান চারভাগে বিভক্ত করতে হবে। অতঃপর কে কোন ভাগ পাবে, তা যদি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তবে লটারীর মাধ্যমে প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণ করা জায়েয হবে। এভাবে সম অংশীদারিত্বের যে কোন বিষয় লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে। আবার ধরা যাক, কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন। যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে, তা সর্বমোট একশটি। এ এক্ষেত্রেও লটারীর মাধ্যমে মিমাংসা করা যায় ( তফসীর মা’আরেফুল কোরআন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২০৭)।

**হাউজি খেলাও** একধরণের জুয়া। এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মূল্যমানের সীট বিক্রি করে লোকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করা হয় এবং নামমাত্র কিছু অর্থ অল্পসংখ্যক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করে বাকী সমূদয় অর্থ কর্তৃপক্ষের পকেটস্থ করা হয় কিন্তু অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত থাকে।

**ঘোড়দৌড়ের** মত প্রতিযোগীতায়ও যখন বাজি রাখার বিষয়টি যুক্ত হয়, তখন তা জুয়ায় পরিণত হয়। এ খেলায় নির্দিষ্ট ঘোড়ার উপর বাজি রাখা হয় বড় অংকের টাকা, যেখানে কেউ পুরা লাভবান হয় আবার অন্যরা জামানত হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তাসের জুয়া একটি মারাত্মক নেশা। এ খেলায় নগদ অর্থ ছাড়াও জমা-জমি এমনকি বসত বাড়ী পর্যন্তও বাজি রাখতে দেখা যায়। এখানে কারো হয় সর্বনাশ আবার কারো পোয়া বারো। সাধারণতঃ প্রচলিত তাস খেলার মধ্যেও যদি টাকা-পয়সার লেনদেন থাকে বা বাজি সংযুক্ত হয়, তাহলে সেটা জুয়ায় পরিণত হবে।

**পাশা, দাবা, ছক্কা-পাঞ্জা** ইত্যাদি খেলাগুলোও জুয়ার মধ্যে শামিল। সাধারণতঃ এ খেলাগুলি নেশা সৃষ্টিকারী খেলা হিসেবে বিবেচিত এবং এসব খেলাতেও অনেক সময় টাকা-পয়সার বাজি রাখা হয়। ইদানিং কিছ কিছু আন্তর্জাতিক খেলা, বিশেষ করে ক্রিকেট এবং ফুটবলের মত খেলাকে কেন্দ্র করেও জুয়ার প্রচলন শুরু হয়েছে। এ খেলায় হার-জিতের উপর বিশাল অংকের বাজি লড়ে কেউ কেউ লাভবান হচ্ছে আবার কেউবা সর্বস্ব হারিয়ে ফেলছে। এভাবে যে কোন ধরনের বৈধ খেলাতেও বাজি থাকলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

**বীমা** কার্যকলাপও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে জীবন বীমা, গাড়ী বীমা, বাড়ি বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বীমা, সাধারণ বীমা ইত্যাদি। বীমাগুলিতে ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা প্রাপ্তির আশায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি সাধন হলেই ক্ষতির সমপরিমান টাকা পাওয়া যায়, নতুবা নয় । ক্ষতিপূরণ জমা দেওয়া টাকা থেকে কম হতে পারে বা উহার সমান অথবা অনেকগুণ বেশীও হয়ে থাকে। এরূপ কার্যক্রম জুয়াই বটে।

**জুয়ার অবৈধতা:**

ইসলাম শুধুমাত্র ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নিয়ম-নীতির প্রতিও ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং মানব কল্যাণে নির্ধারণ করা হয়েছে বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিসংগত নানা বিধি-বিধান। মানুষের জন্য অকল্যাণকর বিষয়সমূহ অবৈধ ঘোষণা করে তার উপর আরোপিত হয়েছে শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা। জুয়া, এর মধ্যে একটি অন্যতম নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি অবৈধ কর্ম। জুয়া অবৈধ হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নাতীত এবং সকল মুসলিম মনিষীগণ জুয়া হারাম হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কেননা পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জুয়ার উপর নিষেধাজ্ঞাটি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

**“হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।”**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত- ৯০

**জুয়ার কুফল:**

জুয়া হলো কর্মহীন লোকের অর্থহীন ব্যস্ততা। বেকার লোকেরা বল্গাহীন ভোগের আনন্দে মেতে থাকতে ভালবাসে। কারো কারো নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মশূন্যতা তাদেরকে ক্রমাগত তাড়া করে নিয়ে বেড়ায় এবং অবশেষে জুয়া ও মদের নেশায় নিমজ্জিত করে। কেউ কেউ নিজের জীবন থেকেই পলায়নপর হয়ে মদ ও জুয়ায় ডুবে যায়। জুয়ার মধ্যে কিছুটা উপকারীতা থাকলেও এর ক্ষতির দিকটা অনেক বেশী। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে,

**"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তুমি বলে দাও, এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর কোন কোন মানুষের জন্য উপকারও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ, উপকারীতা অপক্ষা অনেক বড়।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত- ২১৯

যেখানে পবিত্র কোরআন জুয়াকে মহাপাপ বলে আখ্যায়িত করেছে, সেখানে এর যত উপকারীতাই থাকুক না কেন, কোন লোকের পক্ষেই জুয়ার সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখা শোভনীয় নয়। বস্তুতঃ জুয়ার মধ্যে যে লাভ রয়েছে তা সর্বজনবিদিত। জুয়ায় জয়লাভকারী ব্যক্তি অনায়াসেই প্রভুত সম্পদের মালিক হতে পারে- তবে এর সংখ্যা অতি নগন্য। অপরদিকে এর উল্টো পিঠের করুণ চিত্রটি কেউ কখনও তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি। সেখানে জুয়ায় হেরে যাওয়া সম্পদ হারানোদের দল অনেক ভারী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসতে হয়। মুহূর্তের মধ্যে লক্ষপতি ফকির হয়ে যায় আর গোটা পরিবার সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়। এটা হল জুয়ার আর্থিক ক্ষতির দিক। জুয়ার অন্যান্য কুফলের দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অতি সহজে পরে না বলে অনেকের নিকট তা অজানা থেকে যায়। তবে আল্লাহ্ তা'আলা জুয়া মহাপাপ হওয়ার এবং এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপনের পিছনে কারণগুলি ব্যাখ্যা প্রদান করে এ বিষয়ের প্রতি তাঁর বান্দাদের সচেতন করেছেন এভাবে,

**"শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ হতে তোমাদেরকে বিরত রাখতে।"**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত- ৯১

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা এসেছে যে, শয়তান মানুষের চিরশত্রু এবং সে চায় মানুষের ইহকাল ও পরকালের সর্বনাশ সাধন করতে। মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান মানুষে মানুষে দ্বন্দ-কলহ ও পারস্পরিক শত্রুতার বীজ বপণ করে এবং তাদেরকে ধর্ম থেকে বিপথগামী করে ফেলে। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা এবং এটা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, জুয়ার কুফল শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জুয়ার নৈতিক, আত্মিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় কুফলও অপরিসীম।

জুয়া মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটায় এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ডেকে আনে। একজন জুয়ারীর আত্মার অপমৃত্যু ঘটে এবং পরোপকার, সহানুভূতি, সহনশীলতা, স্নেহ-মমতা ইত্যাদির মত মহৎ মানবীয় গুনাবলী তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। জুয়ার নেশা মানুষকে এমনই অন্ধ করে দেয় যে অন্যের সুখ-দুঃখ, কষ্ট-বেদনা তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না এবং অন্যায়ভাবে অপরের অর্থ-সম্পদ আত্নসাত করতেও তার মন টলে না। জুয়া এমনই একটি নেশা যে, একজন বিজয়ী পূনর্বার জিতার স্বাদ গ্রহনের জন্য জুয়া খেলায় রত থাকে, আর একজন হেরে যাওয়া জুয়ারী তার হারের প্রতিশোধ নিয়ে জিতার নেশায় জুয়ায় লিপ্ত থাকে। অনেকসময় জুয়ায় হেরে গিয়ে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। বড় ধরনের হার সামলাতে গিয়ে সে মাদকে আসক্ত হয়ে পরে বা নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াতের মাধ্যমে বড় ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়ে পরে।

জুয়া মানুষকে কর্ম বিমুখ করে ফেলে। জুয়ার মাধ্যমে অনায়াসলব্ধ সম্পদ উপার্জনে অভ্যস্ত হয়ে বৈধ পথে কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে, সে দূরে সরে থাকে। আর সর্বদা এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, অন্যের উপার্জিত সম্পদে কিভাবে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য মারাত্নক হুমকি স্বরূপ। জুয়ার কারনে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। জুয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। একজন পরাজিত জুয়ারী স্বভাবতঃই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ এবং ঘৃণা পোষণ করে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নানাবিধ অপকর্মের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহনের চেষ্টা করে। আবার একজন পরাজিত জুয়ারী সর্বস্ব হারিয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং ইত্যাদি সহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্য-কলাপে লিপ্ত হয়ে পরে।

জুয়া মানুষের ধর্মকে নাশ করে এবং পরকালকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। মানুষ জুয়ার নেশায় নিমগ্ন হয়ে আল্লাহর যিকির এবং নামায সহ অন্যান্য ইবাদত থেকে গাফিল থাকে। এভাবে শয়তানের প্ররোচনায় একজন জুয়ারীর ইহকাল ও পরকাল বরবাদ হয়ে যায়।

## হারাম ভক্ষণ করা

## (Consuming Forbidden Wealth)

হারাম ভক্ষণ বলতে কি বুঝায়? প্রথমেই এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। হারাম একটি আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ বা অবৈধ। শর'ই পরিভাষায় হারাম বলতে বুঝায় এমন সব কর্ম যা করতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল  নিষেধ করেছেন এবং যা করা হলে আল্লাহর অসন্তোস ও রাগের কারন হয়ে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, এবং যা করা থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ্ খুশী হবেন এবং পুরস্কৃত করবেন। কাজেই হারাম কাজ একটি মহাপাপ। মানুষের জীবনের সাথে হারাম শব্দটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এবং যে কারো হারামের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে জীবনের প্রতিটি পদেপদে। একজন মুমিনের ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল ক্ষেত্রে হারাম সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা হলঃ খাদ্য ও পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, ঘর-বাড়ী, যৌনাচার, পেশা, আয়-উপার্জন, লেনদেন, ব্যবসা-বানিজ্য, ইত্যাদি সহ জীবনের সকল কাজ-কর্ম। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈধ এবং অবৈধ- এই দু'টি দিকই রয়েছে। যে ক্ষেত্রে অবৈধতার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা সবই হারাম বলে অভিহিত। দ্বিতীয় শব্দটি হল ভক্ষণ করা। ভক্ষণ শব্দটি দ্বারা যদিও খাদ্যবস্তু বা পানীয় গ্রহণ করা বুঝায়, তবুও শর'ই পরিভাষায় এ শব্দটি শুধু পানাহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অনেক ব্যাপক অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভক্ষণ বলতে যে কোন প্রকারের ভোগ বা ব্যবহার বোঝায়-তা পানাহার, পরিধান কিংবা অন্য কোন প্রকারেই হোক না কেন। প্রচলিত পরিভাষায় এসব ব্যবহারকে খাওয়াই বলা হয়। শর'ই দৃষ্টিকোণ থেকে পানাহার ছাড়াও পানাহারের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় উপায়-উপকরণ, যেমন অর্থসম্পদ আয়, উপার্জন, উৎপাদন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়াদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খাদ্যবস্তুর সাথে যেহেতু অর্থসম্পদের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তাই খাওয়ার সাথে অর্থসম্পদের বিষয়টিও আপনা-আপনি এসে যায়। আর হারামের সাথে যখন খাওয়া যোগ হয়, তখন সেটাই হয় হারাম ভক্ষণ। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল হারাম কর্মের মধ্যে যে সকল বিষয় পানকরা বা খাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তা সবই হারাম ভক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।  হারাম ভক্ষণের মূলতঃ দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছেঃ

- খাদ্যবস্তু ও পানীয়
- অর্থসম্পদ তথা আয়-উপার্জন

### খাদ্যবস্তু ও পানীয়:

মানুষের জীবন ধারনের জন্য খাদ্যবস্তু ও পানীয় অত্যাবশ্যকীয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির সাথে সাথে তাদের রিযিকের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। ইসলামের সর্বপ্রথম মৌলনীতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য যত জিনিসই সৃষ্টি করেছেন, তা সবই হালাল বা বৈধ। শরিয়তের

বিধানদাতার সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত ঘোষণায় যদি কোনটিকে হারাম বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তবে কেবল সেটিই হারাম। কিন্তু কোন বিষয়ে যদি অকাট্য প্রমাণ বা দলীলের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে কোন জিনিসের হারাম হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে জানা না যায়, তবে তা তার মৌল অবস্থায় (বৈধ হওয়ার অবস্থা) দাঁড়িয়ে থাকবে। ইসলামের দ্বিতীয় মৌলনীতি হিসেবে রয়েছে যে, হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের। এ ক্ষেত্রে কোন আলেম, পীর-মোর্শেদ, নেতা বা অন্যকারো আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন কিছু হারাম করার কোন অধিকার নেই। যদি কেউ তা করার দুঃসাহস করে তাহলে বুঝতে হবে যে আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘণ করছে।

**খাদ্যবস্তু হারাম হওয়ার বিধান:** আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, মহান। তিনি মানুষের জন্য খাদ্য হিসেবে পবিত্র বস্তু গ্রহণ করার এবং নাপাক বস্তু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। খাদ্যবস্তু হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য যা হারাম করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে পবিত্র কোরআনে:

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসামগ্রী আহার কর, যেগুলি আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর। তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘণ করা না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।"**

আল-কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-১৭২-১৭৩

অতপরঃ এর ব্যাখ্যা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা আর একটি আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেন,

**"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠ রোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচু স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিংয়ের আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ সেটা ছাড়া। যে জন্তু যজ্ঞ বেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা জুয়ার তীর দ্বারা বন্টণ করা হয়-এসব গুণাহের কাজ। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গুণাহের প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল।"**

আল-কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত-৩

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে উপরের আয়াতটির পূর্ণ ব্যাখ্যা রূপে নিম্নের আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। এ আয়াতদ্বয়ের মর্ম অনুযায়ী এখানে খাদ্যবস্তুর মধ্যে জীব-জন্তু হারাম হওয়া সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ মূলনীতির আওতায় যে চার ধরনের বস্তুকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তা হচ্ছেঃ

- মৃত জন্তু
- রক্ত (প্রবাহিত রক্ত)
- শুকর
- যে সকল জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

এ বর্ণনার আলোকে বোঝা যায় যে, কিছু কিছু বস্তুকে চিরকালের জন্য হারাম করা হয়েছে, যেমনঃ মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকর। আবার কিছু কিছু হালাল প্রাণীও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, নিয়ত এবং প্রক্রিয়াগত কারণে হারাম হয়ে যায়, যেমনঃ হালাল প্রাণীও যদি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যকোন নামে উৎসর্গ করা হয়, তবে সেটা নাপাক হয়ে হারামে পর্যবসিত হবে। এ পর্যায়ে সুরা বাকারার আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত সুরা মায়েদার আয়াতে উল্লেখিত হারামকৃত চারটি খাদ্যবস্তুর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

**মৃত জন্তু:** যে সব প্রাণী হালাল করার জন্য শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যবেহ করা জরুরী, সে সব প্রাণী যদি যবেহ ব্যতীত অন্যকোনভাবে মারা যায়, তাহলে সে গোশত খাওয়া হারাম হবে। এ আয়াতে এভাবে মৃত্যুর কিছু বর্ণনা এসেছে, যেমন অসুস্থতার কারণে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, দম বন্ধ হয়ে, উচু স্থান থেকে পতনের ফলে অথবা কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় যখন কোন প্রাণী মারা যায়, তখন সেটাকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং এর মাংস ভক্ষণ করা হারাম হবে। কিন্তু সামুদ্রিক জীবের বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি, ফলে এগুলো যবেহ ছাড়া এবং মৃত খাওয়া জায়েয। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসের মাধ্যমে সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি এ দু'টির মৃত হালাল করা হয়েছে।

**রক্ত:** দ্বিতীয় হারামকৃত বস্তু হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্তের কথা বলা হলেও অন্য একটি আয়াতে প্রবাহিত রক্তের কথা বলা হয়েছে। তাই, শুধু সে রক্তই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ করলে প্রবাহিত হয়।

**শুকর:** শুকর নাপাক প্রাণী। তাই যবেহ করা হলেও এটা হালাল হয় না। মাংস সহ শুকরের সকল উপাদান মুমিনের জন্য হারাম করা হয়েছে।

**আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকিছুর নামে উৎসর্গকৃত জীব-জন্তু:** যে সকল জীব-জন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকোন সত্তার নামে যবেহ বা উৎসর্গ করা হয়, তা হারাম। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রাণীটি স্বাভাবিক অবস্থায়

www.waytojannah.com

হালাল থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বান্দার নিয়তের কারনে হারাম হয়ে যায়। সাধারণতঃ দু'টি সুরতে এ প্রক্রিয়ায় যবেহকৃত প্রাণী হারাম হয়ে থাকে। প্রথম সুরতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নামেই যবেহ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় যবেহকৃত প্রাণী সর্বাবস্থায় নাপাক এবং হারাম। তৎকালীন আরবের মুশরিকদের মধ্যে এ পদ্বতিটি প্রচলিত ছিল। বর্তমানকালেও অমুসলিমদের মাঝে এ রেওয়াজটি পরিলক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে পুজার যজ্ঞবেদীতে এ নিয়মে পশু বলি দিয়ে থাকে। এ অবস্থায় যবেহকৃত পশুটি মুমিনের জন্য হারাম। দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত প্রণীটি আল্লাহর নাম নিয়েই যবেহ করা। এ রেওয়াজটি কিছু কিছু অজ্ঞ মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত দেখা যায়। অনেকে পীর-আউলিয়া, বুজুর্গ বা মাযারবাসীর সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে যদিও আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয় তবুও যেহেতু বস্তুটি অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত, তাই ফিকাহবিদগণ একেও আয়াতদৃষ্টে হারাম বলেছেন।

**পানীয় হারাম হওয়ার বিধান:** ইসলামে পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত কতিপয় বস্তুকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যে সকল বস্তু পান করা হলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয় এবং যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তা সবই মদ বা মাদকদ্রব্য হিসেবে বিবেচিত। মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে এ্যালকোহল, সুরা, চোলাই মদ, তাড়ি, ভাং, গাজা, আফিম, হেরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। ভদ্র সমাজে প্রচলিত শ্যাম্পেন, ব্রান্ডি, হুইস্কি ইত্যাদিও মদ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও মাদকের আর একটি দিক রয়েছে, সেটা হল ড্রাগ আসক্তি। তবে সকলপ্রকার মদই হারাম এবং মদ্যপান একটি কবীরা গুণাহ। মাদকদ্রব্য বা মদ্যপান সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থের অন্যত্র করা হয়েছে।

### অর্থ-সম্পদ:

মানুষের জীবন ধারনের জন্য অর্থ-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অর্থ-সম্পদের অর্জন, ব্যয় বা ভোগের সাথে সাথে সম্পৃক্ত সকল প্রক্রিয়াই ভক্ষণের মধ্যে শামিল। মানুষ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদের অধিকারী হতে পারে কয়েকটি পন্থায়ঃ

- উত্তরাধিকার সূত্র
- উপহার- উপঢৌকন
- উপার্জন

মানুষের জীবনে অর্থ প্রাপ্তির এই উপায়গুলির মধ্যে হারাম ও হালাল- এ দু'টি পন্থাই খোলা রয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হালাল পন্থায় অর্জিত সম্পদ মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে আর হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ তার জন্য বয়ে আনতে পারে প্রভূত অকল্যাণ এবং

অশুভ পরিণতি। সে জন্য সম্পদ অর্জনের নিষিদ্ধ বা হারাম পন্থাগুলি চিহ্নিত করে তা পরিহার করে জীবন পরিচালনা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ন্যায়সঙ্গতভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ হালাল হিসেবে বিবেচিত। আর এ প্রাপ্ততায় যদি কোন অনিয়ম বা জুলুমের সংমিশ্রণ থাকে, তবে তা হারাম বলে গণ্য করা হবে। উপহার-উপঢৌকনের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। উপার্জনের উপর বিশদ আলোচনা করার অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি। তাই এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হল:

**উপার্জন পর্যায়ে সাধারণ নিয়ম এবং অর্থ উপার্জনের হারাম পন্থা :**

উপার্জন পর্যায়ে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, যে কোন উপায়ে যে কোন পথ ও পন্থায় ইচ্ছামত উপার্জন করতে চেষ্টা করাকে ইসলাম জায়েয করেনি; বরং উপার্জনের জন্য শরিয়তসম্মত পন্থা ও শরিয়ত অসমর্থিত পন্থার মধ্যে পার্থক্য করার নির্দেশ দিয়েছে। এ নীতির মূলকথা হচ্ছে সামাজিক সামষ্টিক কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এ মূলনীতির ঘোষণা দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে,

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বাতিল পন্থায় পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। তোমরা নিজেদের হত্যা করোনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াশীল। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘণ কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে তাকে খুব শীঘ্রই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত- ২৯-৩০

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদগণ বাতিল পন্থা বলতে সম্পদ অর্জনের সকল অবৈধ পন্থাকে বোঝান হয়েছে বলে মনে করেন। তাদের মতে, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, জুয়া, আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, জবরদখল, কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ঠকবাজী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল মিশানো, মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রী করা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় অবৈধ বা বাতিল পন্থার মধ্যে শামিল রয়েছে এবং এসকল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা সম্পূর্ণ হারাম। অন্যদিকে পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পাদিত ব্যবসা ও লেনদেনকে বৈধ বা হালাল করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষ যে সম্মতি দিচ্ছে তা যেন প্রকৃত এবং স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি হয়। কোন মানুষের উপর কোনপ্রকার চাপ প্রয়োগ করে যেন সম্মতি আদায় করা না হয় অথবা কোন প্রকার কুট-কৌশল অবলম্বন করা না হয়। অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের নিষেধাজ্ঞা জারির পরে 'তোমরা নিজেদের হত্যা করোনা' বলার নির্দেশনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কেননা যখনই কোন সমাজে অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ আত্মসাৎ ও ভক্ষণের প্রবণতা বিস্তার লাভ করে, তখন মূলত মানুষের সুস্থ্য বিবেক, সম্ভ্রম, চরিত্র, ধর্ম প্রভৃতি অবিক্রয়যোগ্য জিনিস বিক্রয় করা হয় যা আত্মহননের শামিল। উপরন্তু এ ধরনের আচরণের ফলে সমাজের মধ্যে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে ধ্বংসের পথ তৈরী হতে পারে এবং যা হত্যার মত জঘন্য অঘটনও ঘটাতে পারে। সুতরাং যারা এসব অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছেন

তারা সীমালজ্ঘণের অপরাধ করছেন। আর যারা সীমালজ্ঘনের অপরাধ করবে এবং জুলুম করবে তার জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের অগ্নির শাস্তি এবং এতে তাদেরকে প্রবেশ করান হবে।

**অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন উৎস এবং এগুলির মধ্যে হারামের সংশ্লিষ্টতা:** মানুষের জন্য অর্থোপার্জনের বিভিন্ন উপায় বা পন্থা রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পন্থাগুলি হচ্ছে:

- ব্যবসা-বাণিজ্য
- পেশা
- কল-কারখানা
- শ্রম
- জমা-জমি
- ভাড়ায় লাগানো দালানকোঠা
- অন্যান্য

এ উৎসগুলির মধ্যে কিছু আছে বৈধ আবার কিছু আছে অবৈধ উৎস। অবৈধ উৎস থেকে আহরিত সকল উপার্জনই হারাম। আবার বৈধ উৎস থেকেও অবৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহরিত উপার্জন হারাম হিসেবে বিবেচিত। তবে মানুষকে হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দান করা হয়েছে। সুতরাং উৎসগুলির উপার্জন কিভাবে হারাম হতে পারে তা জেনে নেওয়া সকলেরই কর্তব্য।

**ব্যবসা-বাণিজ্য:**

ইসলামে ব্যবসা হারাম নয় বরং তা একটি সম্মানজনক, প্রশংসিত এবং পবিত্র উপার্জন মাধ্যম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যবসা কাজের জন্য বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছেন। তিনি নিজে কথা ও কাজ দ্বারা এ বিষয়ের ভিত্তি মজবুত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সৎ ব্যবসায়ীরা আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং পরকালে তাদের জন্য দেয়া হবে অশেষ নেয়ামত। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা (আখিরাতে) নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবে।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-১১৪৭

**হারাম ব্যবসা এবং হারাম উপার্জন:** ইসলামে বৈধ জিনিসের ব্যবসাকে যেমন হালাল করা হয়েছে তেমনি কোন নিষিদ্ধ জিনিসের ব্যবসাকে (উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার) সম্পূর্ণ

নিষিদ্ধ বা হারাম করা হয়েছে। ইসলামের মূলনীতি এই যে, যে জিনিস খাওয়া ও ব্যবহার হারাম, সে জিনিসের ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসা হারাম। এ জাতীয় হারাম ব্যবসার মধ্যে রয়েছে:

- সুদের ব্যবসা
- মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা
- শুকর ব্যবসা
- মৃত জীব-জন্তুর ব্যবসা (মৃত প্রানীর গোশত, চামড়া, চর্বি ইত্যাদি)
- গান-বাজনার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা।
- তা'বীজ ব্যবসা
- মূর্তি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য বা অনুরূপ কোন ব্যবসা ইত্যাদি।

এ সকল ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত সকল উপার্জনকে হারাম বলা হয়েছে। এ জাতীয় ব্যবসা হারাম হওয়ার স্বপক্ষে কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে। সুদের লেনদেন হারাম হওয়ার বিষয়ে কোরআনের ঘোষণা হচ্ছে,

**"আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত- ২৭৫

হারাম ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু হাদিস উল্লেখ করা যায়। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

**"আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি কেনাবেচা হারাম করে দিয়েছেন।"**

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

**"ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেওয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত করা হয় আর লোকে তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে।"**

তিনি বললেন,

**"না, তাও হারাম।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ২০৯৪

এ ধরনের আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান,

**"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মদ এবং এর মূল্য গ্রহণকে অবৈধ করেছেন। মৃত জীব-জন্তু এবং এর**

**মূল্য গ্রহণকে অবৈধ করেছেন এবং শুকর ও তার মূল্য গ্রহণকে অবৈধ করেছেন।"**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩৪৫০

আবার ক্ষেত্র বিশেষে বৈধ প্রকারের ব্যবসার উপার্জনও হারাম হতে পারে। বৈধ প্রকারের ব্যবসার সাথে যখন কোন অবৈধ বা অসৎ প্রক্রিয়া সংযুক্ত হয়, তখন সেটাও নিশ্চয়ই হারাম বলে বিবেচিত হবে। তাই যে ব্যবসায় প্রতারণা, জুলুম, সুদ, জুয়া, কালোবাজারী, মজুতদারী, ঠকবাজী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল মিশানো, মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রী ইত্যাদির মত অবৈধ কর্ম-কাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সে উপার্জন বৈধ হতে পারে না, বরং তা হারাম এবং বাতিল পন্থার উপার্জন। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসার ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।

## পেশা:

সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। পেশা উপার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পেশার বিভিন্নতা রয়েছে। তবে সকল প্রকারের পেশাই মুসলিমদের জন্য বৈধ করা হয়নি। শরিয়তে কয়েক প্রকারের পেশাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

**অবৈধ বা হারাম পেশাঃ** শরিয়তে কয়েক প্রকারের পেশাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অবৈধ এবং হারাম ঘোষিত পেশাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

- বেশ্যাবৃত্তি
- গণকবৃত্তি
- সংগীত, নৃত্য ও যৌন শিল্পকর্ম
- ভাস্কর্য, প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি ও ক্রুশ নির্মাণ শিল্প
- মাদক দ্রব্যাদির শিল্প
- পর্ণগ্রাফী ইত্যাদির শিল্প।
- জুয়া ও লটারী

এসব পেশা মানুষের আক্বিদা, বিশ্বাস, চরিত্র, মানসম্মান ও সম্ভ্রমকে কলুষিত করে এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিত এ পেশার সাথে সকল সংশ্লিষ্টতা পরিত্যাগ করা এবং বৈধ কোন পেশায় আত্মনিয়োগ করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান,

**"কুকুরের মূল্য গ্রহণ, গণকবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন এবং যেনাকার নারীর যেনার উপার্জন বৈধ নহে।"**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩৪৪৯

**বৈধ পেশায় হারামের সংশ্লিষ্টতা:** বহু সংখ্যক পেশাকে ইসলামে বৈধতা দেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বৈধ প্রকার পেশার মধ্যে রয়েছে চাকুরী, শিক্ষকতা, ডাক্তারী, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ঠিকাদারী, রাজনীতি ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে প্রতিটি পেশাই সম্মানজনক। ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, আন্তরিকতা আর বিশ্বস্ততার সাথে পরিচালিত হলে এ সকল পেশা থেকে প্রাপ্ত আয় বৈধ এবং হালাল হবে। তবে নৈতিক অবক্ষয় ও অসততার কারনে যে কোন বৈধ পেশাই কলুষিত হতে পারে। তখন সে পেশার উপার্জন হারাম হতে বাধ্য। সাধারণতঃ যে সকল প্রক্রিয়ায় হালাল পেশায় কাজ করলেও উপার্জন হারাম হতে পারে সংশ্লিষ্ট পেশার সাথে সম্পর্কিত তার কিছু বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হলঃ

**চাকুরী:** চাকুরী করে উপার্জন করা শরিয়তে সকলের জন্য জায়েয করা হয়েছে, তা সরকারী চাকুরী হোক আর বেসরকারী বা কোনো এনজিও প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনো চাকুরীই হোক। তবে যে চাকুরীতে মুসলিম জনগণের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতির কোন কারণ নিহিত থাকবে, সে প্রকারের চাকুরীর কোন শর'ই বৈধতা নেই। এ হিসেবে অনেক কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হারাম বলে গণ্য করা হবে, যেমন:

- মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীর চাকুরী
- মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্র তৈরীর কারখানার চাকুরী
- সুদী কারবারের প্রতিষ্ঠান যেমন সুদী ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের চাকুরী
- মদ্য উৎপাদন, বিক্রি বা মদ্য পরিবেশন করার প্রতিষ্ঠানে চাকুরী
- নৃত্যশালা, থিয়েটার এবং যৌন আবেদনমূলক ছায়াছবি নির্মাণ ইত্যাদির চাকুরী।

এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণকারী এই বলে নিস্কৃতি পেতে পারবে না যে, তারা নিজেরাতো হারাম কাজ করছে না। কেননা ইসলামের মৌলনীতি হচ্ছে পাপ কাজের সহায়তা করাও পাপ। কাজেই নিজে পাপ না করেও যে সকল ক্ষেত্রে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে সকল ক্ষেত্রে চাকুরী করাও বৈধ নয়। উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরী করার বৈধতা রয়েছে।

তবে বৈধ প্রকারের চাকুরীতে থেকেও যদি অবৈধ কর্ম-কাণ্ড করা বা না-জায়েয পন্থায় অর্থ উপার্জন করা হয়, তবে সে উপার্জন নিঃসন্দেহে হারাম। আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় সরকারী চাকুরিজীবিদের মধ্যে অবৈধ সম্পদ উপার্জনের জন্য যেন একটা প্রতিযোগীতার মনোভাব সবসময় সচল থাকতে দেখা যায়। অবৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং ফন্দি-ফিকির বের করে নেয়। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত বিষয় হচ্ছে ঘুষ। ঘুষের বাস্তবতা অত্যন্ত করুণ। ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়েনা, প্রমোশন হয়না, বৃদ্ধের পেনশন মেলে না, আরো কত কি! ঘুষের কারনে মানুষ হক এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যোগ্যতার মূল্যায়ণ না করে অযোগ্য

www.waytojannah.com

লোকের নিয়োগ হচ্ছে। ঘুষ ছাড়াও সরকারী অফিসে আরো কিছু অনিয়ম দেখা যায়- এর মধ্যে সময় চুরি, স্বজনপ্রীতি, কর্তব্যে অবহেলা, সরকারী সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করা ইত্যাদি বিষয়গুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ পর্যায়ে বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপার্জণ যেভাবে হারাম হতে পারে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

**বিচারক:** সরকারী চাকুরীজীবিদের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন রয়েছেন বিচারক শ্রেণী। একজন বিচারক ন্যায়ের প্রতীক। সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড সমুন্নত রাখতে তাই বিচারকের দায়িত্ব অপরিসীম। বিচারকদের হাতে মানবতা জিম্মী। কাজেই অতি সন্তর্পণে তাদেরকে পথ চলতে হয় এবং তাদেরকে সকল প্রকার প্রভাব মুক্ত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতে হয়। কারণ স্বজনপ্রীতি, অর্থ, প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা দ্বারা যদি বিচার ব্যবস্থা প্রভাবিত হয় বা প্রভাবিত করা হয়, তাহলে সে সমাজে আর যাই হোক আইনের শাসন বলতে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে দেয় বেতন-ভাতা একজন বিচারকের ন্যায্য পাওনা এবং এ উপার্জন তার জন্য বৈধও বটে। কিন্তু এর বাইরে বিচারকার্যের জন্য অন্যকোন উপায়ে বাড়তি অর্থ গ্রহণ করার কোন বৈধতা নেই। বিচারকার্যের জন্য কোন পক্ষের কারো কাছ থেকে কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা হলে সেটা উৎকোচ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং শর'ই দৃষ্টিতে এটি নিঃসন্দেহে হারাম উপার্জন বলে বিবেচিত হবে। জেনে-শুনে এবং উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ করে অথবা কোন তৃতীয় অপশক্তির প্রভাবে বিচারের ফয়সালায় কোন পক্ষপাতিত্ব করা হলে বা অন্যায় সিদ্ধান্ত দেওয়া হলে অথবা কোনপ্রকার রদবদল করা হলে বা সত্যের বিরুদ্ধে রায় দিলে মানবতা বিপন্ন হয়ে মহাপাপ সংঘটিত হবে। বিচারকের পদটি যেহেতু অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ, সেহেতু এ পদটির স্বত্তাধিকারী যদি পূর্ণ সততা, আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার সাথে এ পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, তবে তার জন্য অপেক্ষা করছে আখিরাতের মহাকল্যাণ। আর যারা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হন অথবা নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরনে দায়িত্ব পালন করেন, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে পরকালীন কঠিন শাস্তি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**“বিচারক তিন ধরনের; তন্মধ্যে এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে। আর অপর দু'ধরনের বিচারক যাবে জাহান্নামে। জান্নাতে যাবে সে বিচারক যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পারল ও সে অনুযায়ী ফয়সালা করল-রায় দিল। কিন্তু যে বিচারক প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও জুলুম করল সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ ভুল বিচার করবে, সেও জাহান্নামে যাবে।”**

হাদিস, সহীহ আবু দাউদ শরীফ, নং ৩৫৩৬

**শিক্ষকতা:** শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। একজন শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে পরিচিত। তার উপর অর্পিত রয়েছে সমাজের পবিত্র আমানত, এ হিসেবে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব অপরিসীম। একদিকে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্যদিকে সমাজ তথা দেশের ভবিষ্যৎ, এ

দুয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা দুরূহ কাজ। তবে সততা আর ন্যায়-নিষ্ঠা থাকলে কাজটি অতি সহজেই সম্পন্ন করা যেতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়। আর কোন প্রকারের অন্যায় এবং অসততা যেমন, স্বজনপ্রীতি বা অর্থপ্রীতির মত অপকর্মের প্রভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। তাই দায়িত্ব এবং কর্তব্যে অবহেলা করা, শিক্ষাদানে ফাঁকি দেওয়া, স্বজনপ্রীতি ও উপরমহলের চাপে কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করে সত্য বিবর্জিত কোন কাজ করা, অনুপযুক্ত শিক্ষার্থীকে পাশের সার্টিফিকেট দেওয়া ইত্যাদি অনাকাঙ্খিত এবং অবৈধ কর্ম-কাণ্ড শিক্ষকতার মত মহান পেশাকে কলুষিত করতে পারে। এ সকল কর্ম-কাণ্ড শরিয়তের দৃষ্টিতেও হারাম বলে বিবেচিত।

**ওকালতি:** ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের স্বপক্ষের লড়াইয়ে যারা ব্রত রয়েছেন, তারা হলেন আইনজীবি। ন্যায়ের স্বপক্ষে যাদের অবস্থান সুদৃঢ় থাকার কথা তাদের কাছ থেকে মানুষ স্বভাবতইঃ কোন অনিয়ম বা অন্যায় আশা করে না। তাই এ পেশায় যারা জড়িত রয়েছেন তাদের ব্রত হওয়া উচিত নির্যাতিত, নিপিড়িত, দুর্বল ও মজলুম জনতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে সকল অন্যায়, অবিচার আর অনিয়মকে বিদূরীত করার প্রচেষ্টা করা। তবে কেউ যদি জেনে-শুনে অন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিতে চেষ্টা করেন, সেটা হবে নিতান্তই দূর্ভাগ্যের বিষয়। কোন আইনজীবি যখন অসত্য ও অন্যায়ের সমর্থনে লড়তে থাকেন তখন সেটা হয় ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সংগ্রাম। আর এর ফলাফল হতে পারে সমাজ থেকে ন্যায়ের বিলুপ্তি এবং ন্যায়ের বনবাস। তবে এ বাস্তবতা আমাদের সমাজে হরহামেশাই পরিলক্ষিত হয়। একজন আইনজীবিকে আনেকসময় জেনে-শুনেই অন্যায়ের পক্ষে লড়তে দেখা যায় শুধুমাত্র অর্থ লোভের বশঃবর্তী হয়ে। এভাবে একজন যালিম, অত্যাচারী, খুনী, সন্ত্রাসী বা ডাকাতের সমর্থনে লড়ে যেতেও তারা কুন্ঠিত হন না- বিনিময়ে তারা অর্জন করে থাকেন প্রচুর অর্থ। তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এভাবে অর্থ উপার্জন শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং পরকালীন অকল্যাণ সহ এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

**ডাক্তারী:** ডাক্তারী পেশাটি অত্যন্ত মহান এবং স্পর্শকাতর পেশা। একজন চিকিৎসক মানবতার সেবায় নিয়োজিত। স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশী। একজন ডাক্তার বৈধভাবেই সেবার বিনিময় আশা করতে পারেন এবং নিয়েও থাকেন। তাদের জন্য মেডিকেল ইথিক্স-এ কিছু নিয়ম বেঁধে দেয়া আছে যা শর'ই বিধানেরও পরিপন্থী নয়। সেক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনের মধ্যে দোষের কিছু নেই। তবে সীমালঙ্ঘণ করা হলে অপরাধ বা পাপ সংঘটিত হতে পারে। বাস্তবতার আলোকে এখনকার সমাজে সীমালঙ্ঘনের অনেক বিষয় হরহামেশাই দৃষ্টিগোচর হয়। এক সময়ে চিকিৎসকগণ ছিলেন সমাজের মধ্যমণি, অনেকে তাদেরকে ফেরেশতা জ্ঞান করত। কিন্তু সে পরম্পরা আজ বিলীন হবার পথে। এক শ্রেণীর স্বার্থণ্বেষী চিকিৎসকের অবৈধ আচরণে সে সুনাম আজ বিনষ্ট প্রায়। তাদেরকে সম্মানের আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হচ্ছে, শুধু তাই নয় লোকেরা ডাক্তারদেরকে চামার আর কসাই

বলতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। কিন্তু এর কারণ কি? তারা কি একবারও ভেবে দেখার চেষ্টা করেছেন যে, এটা তাদের মধ্যে থেকেই সৃষ্ট একশ্রেণীর স্বার্থাণ্বেষী মহলের অপকর্ম কিনা! তবে বোধকরি এর অন্তর্নিহিত কারণ কারো অজানাও নয়। একশ্রেণীর চিকিৎসক অর্থলিপ্সায় মত্ত হয়ে নানা ধরনের অপকর্মের সাথে জড়িয়ে গেছেন এবং তারা সেবার নামে নিরীহ এবং অসহায় রোগীদের সর্বস্ব লুটে নেয়ার পায়তারায় লিপ্ত রয়েছেন, এটাই বোধ করি এর মূল কারণ। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান সমাজে ডাক্তারদের কমিশন গ্রহণের মত একটি অবৈধ কাজ মহামারীরূপে বিস্তার লাভ করছে। অধিকাংশ ডাক্তারগণই বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক থেকে রেফারাল ফি এর নামে কমিশন বাবদ অতিরিক্ত প্রচুর অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। তারা তাদের রোগীদেরকে নিজস্ব সম্পত্তির মত ব্যবহার করে সব রসটুকু নিংড়িয়ে বের করে নেওয়ার প্রচেষ্টায় রত রয়েছেন। তবে হ্যাঁ রোগনির্ণয়ের জন্য রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। আবার সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ হয়ত ভেবে থাকবেন যে, ল্যাবরেটরী রিপোর্টের জন্য নির্ধারিত ফি থেকেই যেহেতু একটি কমিশন নেওয়া হয় এবং এর জন্য রোগীকে কোন অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয় না, তাই এ প্রকার কমিশন নেওয়াতে দোষের কিছু নেই। তাই অধিকাংশ চিকিৎসকগণই কমিশন নামক পাগলা ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন। ফলে বৈধ আয়ের বাইরেও বিভিন্ন ল্যাব থেকে কমিশন হিসেবে চলে আসে বিপুল অংকের অর্থ। তবে কমিশন নেওয়া বৈধ, এ ভাবনা নিয়ে যারা অর্থ গ্রহণে রত রয়েছেন, তারা বোধকরি বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। কেননা তারা একটি অবৈধ বিষয়কে বৈধতা দানের মাধ্যমে পাপের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছেন। বস্তুতঃ কমিশনের উল্টোপিঠে বিদ্যমান থাকা করুণ দৃশ্যটির প্রতি তাদের চোখ পড়ছেনা, এমকি তারা একটিবার ভাববারও অবকাশ পাচ্ছেন না যে, সেখানে থাকতে পারে অসহায় গরীব রোগীর সর্বস্ব হারাবার করুণ আর্তনাদ। চিকিৎসা করাতে এসে ডাক্তার/ল্যাব ইত্যাদির জন্য বিশাল অংকের খরচ মেটানোর সামর্থ্য হয়তো অনেকেরই থাকেনা। আবার কতজনকে এ খরচ মেটাতে জীবনের সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসতে হয়েছে, তার খবর কি কেউ রাখতে পেরেছে? আবার কত অসহায় রোগী যে অর্থ যোগান দিতে না পারায় বিনা চিকিৎসায় তিলতিল করে ধুকেধুকে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে- এ হিসাব কে রেখেছে? না কি নিজের উদরপূর্তির ভাবনায় বেমালুম অন্যের খবর রাখার কথা ভুলে গেছেন তারা? তবে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে, রোগ নির্ণয়ের জন্য ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত অর্থে চিকিৎসকের কোন ভাগ থাকার কথা নয় এবং তাদের কমিশন গ্রহণ সম্পূর্ণ অবৈধ। আবার এই ভাগ নিতে গিয়ে তারা এর থেকেও যে বড় অপরাধটি করে থাকেন তা হচ্ছে এই যে, তারা কমিশনের লোভে অপ্রয়োজনীয় এবং বহু মূল্যমানের পরীক্ষাগুলির পরামর্শ দিয়ে অসহায় রোগীদের উপর যুলুম করেন এবং হয়রানি সহ তাদেরকে অর্থকষ্টে ফেলে দেন। তবে একথা পরিষ্কার মনে রাখা প্রয়োজন যে, মেডিকেল ইথিকস-এ কোথাও ল্যারেটরী ফি-এর উপর তাদের হক ধার্য করা হয়নি। তার চেয়েও কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে যে, শরিয়তে এ প্রকারের উপার্জনকে বৈধতা প্রদান করা হয়নি, বরং এটাকে ঘুষের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সুরা নিসার ২৯ নং আয়াতদৃষ্টে এহেন উপার্জন যুলুম তথা বাতিল পন্থায় অর্থোপার্জনের শামিল। কমিশন প্রথাটি সাধারণ মানুষদের ধোঁকা দেওয়া

এবং প্রতারণা করার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ল্যাব বহির্ভূত আরো অন্যান্য প্রকারের কমিশন গ্রহণের মধ্যে রয়েছে ঔষধের কোম্পানী এবং ফার্মেসী ইত্যাদি থেকে সংগ্রহীত কমিশন। কমিশন ছাড়াও আরো অনেক প্রকার নাজায়েয পন্থা অবলম্বনের মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু চিকিৎসক অবৈধ অর্থের পাহাড় গড়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ভূঁয়া বিশেষজ্ঞ সেজে চিকিৎসা দান করা, শল্য চিকিৎসার নামে ইনডিকেশন ছাড়াই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন করে টাকা কামাই করা বা অস্ত্রপচারের নামে প্রতারণা পূর্বক অপারেশন না করেই বিপুল অংকের অর্থ হাতিয়ে নেয়া ইত্যাদি। ভুক্তভোগীদের জন্য এ বিষয়গুলি বড়ই মর্মান্তিক এবং পীড়াদায়ক। তবে যারা এ অশুভ কাজগুলি করে যাচ্ছেন, তাদের জেনে রাখা উচিত যে এধরনের উপার্জন নিঃসন্দেহে হারাম এবং এর জন্য পরকালে তাদেরকে বহু মূল্য দিতে হবে, কিন্তু মৃত্যুর পরে কয়েক টুকরা কাফনের কাপড় ব্যাতীত অন্য কিছুই সঙ্গে নেয়া যাবে না। আবার পরকালে ঘুষ দেওয়ার কোন সিস্টেমও থাকবে না, তাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করেই এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

**ইঞ্জিনিয়ারিং:** ইঞ্জিনিয়ারিং বিত্তি সমাজের সামগ্রিক অবকাঠামো তৈরিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যে দেশের টেকনোলজি যত উচু মানের, সে দেশটিও তত উন্নত, একথা অনস্বীকার্য। তাই প্রকৌশলী হিসেবে একজন ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব অপরিসীম। এ দায়িত্ব পালনে তাকে হতে হয় সৎ এবং নিষ্ঠাবান। সেই সাথে ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের স্বার্থে তাকে কাজ করতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের কাছে যখন দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়া হয়, তখনই দেখা দেয় বিপত্তি। যার ফলশ্রুতিতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এভাবে দেশের স্বার্থ ক্ষুন্নকারী অনেক ঘটনাই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ঘটে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী প্রকৌশলীদের হাতে আমাদের দেশটি জিম্মি হয়ে আছে। দেশের বিভিন্ন স্থাপনা, যেমন বাড়ী-ঘর, কল-কারখানা, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, পয়ঃ-প্রণালী ইত্যাদি এবং পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেন মুখ থুবরে পড়ে আছে। তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এগুলির সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কি, বা এর জন্য দায়ী কারা? এর জবাবে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষ হচ্ছে ভোক্তা, আর তাদের সুখ-দুঃখ জড়িয়ে আছে এরই মধ্যে। মানুষ বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হচ্ছে উন্নত নাগরিক সুবিধা থেকে। তাই মাথা ব্যাথাটাও তাদের বেশী। তবে এর জন্য সিংহভাগ দায়ী হচ্ছে একশ্রেণীর অসাধু প্রকৌশলী। তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে ঘুষ এবং কমিশনের মত অশুভ প্রভাবের ফলে বিপুল অংকের বরাদ্দ নিঃশেষ হয়ে যায় কাজ শুরুর আগেই। এর ফলশ্রুতিতে কাজের মান নিম্ন হওয়াটইতো স্বাভাবিক। তবে যারা এ প্রকারের অসৎ লেনদেনের সাথে জড়িয়ে আছেন, তারা শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ করছেন। কেননা ঘুষ সহ সকল প্রকার অসাধু লেনদেন ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। রোজকিয়ামতে এসকল অপরাধীকে চরম মূল্য দিতে হবে।

**ঠিকাদারী:** এ পেশাটির সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার একটি সংযোগ রয়েছে। পেশা হিসেবে ঠিকাদারী কাজ একটি বৈধ পেশা। তবে এর শর্ত হচ্ছে সততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে কাজ করা।

যদি কোন প্রকার অসততা এ পেশাকে কলুষিত করে তবে এর মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ পোহানোর মাধ্যমে। পেশী শক্তির ব্যবহার, ঘুষ প্রদান, ও নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার সহ বিভিন্ন অনিয়মের সাথে জড়িত হতে পারে একজন ঠিকাদার। তবে এ সকল অনিয়ম ইসলামে মোটেই বৈধ নয় বরং তা গুণাহের কাজ এবং এ পন্থায় অর্জিত সকল আয়ও অবৈধ। অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ভোগ করা হারাম ভক্ষণের অন্তর্ভুক্ত এবং কবীরা গুণাহ হিসেবে এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

**রাজনীতি:** দেশের সার্বিক উন্নয়নে রাজনীতির একটি মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সমাজ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আবার সুস্থ্য ও স্বাভাবিক সমাজব্যবস্থার জন্য চাই সুস্থ্য রাজনীতির চর্চা, ন্যায়পরায়ণতা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা । রাজনীতিবিদগণ হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দেশ পরিচালনার জন্য দক্ষতার সাথে সাথে সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা একান্ত আবশ্যক। দেশের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার মনমানসিকতা থাকা একজন রাজনীতিবীদের জন্য অপরিহার্য বিষয়। মিথ্যাচার, তালবাহানা আর অসাধু রাজনীতি যেমন দেশের জন্য ক্ষতিকর তেমনি তা তার নিজের জন্যও অকল্যণকর। কেননা রাজনীতির সাথে রয়েছে ব্যক্তির সম্পর্ক আর ব্যক্তিকেই তার সকল কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয় এবং এ সবের জবাবদিহিতাও করতে হয়, এ জীবনে না হলেও পরকালে-তো অবশ্যই। অনেকের ধারনা যে, রাজনীতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই; কিন্তু কথাটি ডাহা মিথ্যা এবং হাস্যকরও বটে। কেননা ইসলাম হল মানুষের পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ধর্মহীন জীবন যেমন অর্থহীন, তেমনি ধর্মহীন রাজনীতিও অচল। সৃষ্টিকর্তা জীবন দিয়েছেন এবং জীবনের সকল বিধানও দিয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রে রাজনীতি ধর্ম বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। তাই ধর্মকে মেনেই রাজনীতি করতে হবে। ধর্মই মানুষকে শিখিয়েছে সৎ-অসৎ আর ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে। তাই রাজনীতিতে ধর্মীয় সকল অনুশাসন মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। ধর্মকে পাশ কাটিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে মানুষ নানাবিধ অবৈধ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়তে পারে। শরিয়তে যা কিছু অবৈধ, তা রাজনীতিকেও কলুষিত করতে পারে। রাজনীতির মূখ্য উদ্দেশ্য যদিও দেশ সেবা করা, তবুও কিছু কিছু রাজনীতিবীদের কাছে এটি গৌণ এবং তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল। তারা রাজনীতিকে সম্পদ গড়ার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে মাত্র এবং অনেকক্ষেত্রে সফলতাও পেয়ে যায়। তারা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় টেণ্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, ঘুষ, সন্ত্রাস সহ পেশী শক্তির ব্যবহার করে নানাবিধ অবৈধ কর্ম-কাণ্ড করে থাকেন এবং এ সকল অবৈধ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকেন। এ সকল কর্ম-কাণ্ড কোন সভ্য সমাজের রাজনৈতিক আচরণ হতে পারে না। বস্তুতঃ এ ধরনের আচরণ সমাজ তথা দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং তা বয়ে আনতে পারে দেশের জন্য প্রভূত অকল্যাণ, এমনকি ধ্বংস পর্যন্ত টেনে আনতে পারে। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে, এ ধরনের কার্য-কলাপের কোন শর'ই বৈধতা নেই; উপরন্তু তা হারাম হিসেবে গণ্য হয়ে ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে

যায়। তাই সুস্থ্য, স্বাভাবিক এবং সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার রাজনীতি কায়েম রা্খা সকলেরই ব্রত হওয়া উচিত।

**বিষয়-সম্পত্তি বা জমা-জমি:**

আমাদের সমাজের সিংহভাগ মানুষই জমা-জমির উপর জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মানুষ বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে বেশ কয়েকটি পন্থায়, যেমন- উত্তরাধিকার সূত্রে, ক্রয় সূত্রে, শ্রমের বিনিময়ে এবং উপহার বা দান সূত্রে। তবে এর সকল প্রকার লেনদেনের মধ্যেই স্বচ্ছতা এবং ন্যায়-নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক। অন্যথায় যে কোন প্রকারের অবৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য ব্যক্তিকে দায়ী থাকতে হবে এবং তার কৃত পাপের জন্য পরকালে তাকে কঠোর সাজা ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**“যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমান জমি অত্যাচার করে নিবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমিন পরিধান করানো হবে।”**

হাদিস, রিয়াদুস সলেহীন, নং- ২০৬

সম্পত্তির হস্তান্তর উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে হোক অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হোক বা অন্যকোন বিনিময় মাধ্যমেই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন লেনদেনের মধ্যে কোন প্রকার ধোঁকাবাজি, ফটকাবাজি, প্রতারণা, আত্মসাৎ বা জবর দখলের মত কোন অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয়া না হয়। বিশেষতঃ এমন কোন দুর্বোধ্যতা, কুট-কৌশল বা কথার মার-প্যাঁচও যেন না থাকে যদ্বারা ভবিষ্যতে ঝগড়া-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, নিজের সম্পদের জন্য যেমন ভালবাসা রয়েছে, তেমনি অন্য লোকেরও তাদের সম্পত্তির জন্য মায়া-মহব্বত রয়েছে। সুতরাং অন্যের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা অবৈধ দখলের পূর্বে নিজের সম্পদ বেহাত হওয়ার বেদনা বা কষ্টের অনুভুতিটুকু একটিবার অনুধাবন করা আবশ্যক, কেননা বিষয়টি নিজের ক্ষেত্রে যেমন কষ্টদায়ক, তা অন্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটি হবে এবং একইভাবে তাদের অন্তরেও বেদনার অনুভুতির সৃষ্টি করে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই নিষ্ঠুর! এ সমাজে জমা-জমির কোন্দল আবহমানকাল ধরে চলে আসছে এবং এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অন্যের জমি জবরদখল, আল ঠেলে নিজের জমির সীমানা বর্ধিতকরণ, অন্যের সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নেয়া, অন্যদেরকে ঠকিয়ে শরীকি সম্পত্তি নিজে ভোগ করা, অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে নিজের নামে লিখিয়ে নেয়া, ইয়াতীম এবং দুর্বলের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, দলীল পরিবর্তন করে নিজের নামে জাল দলিল করে নেয়া, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে একই সম্পত্তি একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে বিক্রয় করা, মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা রুজু করে অন্যের সম্পত্তি হস্তগত করা ইত্যাদি কাজগুলি আমাদের সমাজের কঠিন বাস্তবতা এবং নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। তবে সকলেরই জেনে রাখা আবশ্যক যে, এসকল

www.waytojannah.com

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বান্দার হক নষ্ট করা হয়। অধিকন্তু এ বিষয়গুলি সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি করে। জমা-জমির বিরোধ নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি, হানা-হানি এবং মারা-মারি এক পর্যায়ে তুমুল আকার ধারণ করতে পারে যা হত্যাকাণ্ডের মত বড় অঘটনও সংঘটিত করতে পারে। এসব দিক বিবেচনায় রেখেই জমা-জমি সংক্রান্ত এতসব কর্ম-কাণ্ডকে অবৈধ বিবেচনায় এনে পবিত্র কোরআনে তা স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যারা এসকল অবৈধ আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত খাওলা বিনতে আমের আল-আনসারীয়া (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

**"আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা জনগণের অর্থ-সম্পদের মধ্যে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে।"**

হাদিস, রিয়াদুস সলেহীন, নং-২২১

সুতরাং যে সকল ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে নিজের অধিকারভুক্ত করার পায়তারায় লিপ্ত রয়েছেন, তাদেরকে এখনই সাবধান হওয়া উচিত এবং সকল অবৈধ কর্ম-কাণ্ড পরিহার করে সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠ জীবন যাপনে ব্রত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

## শ্রম:

অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণীর লোককেই শ্রমনির্ভর জীবন যাপন করতে হয়। মানুষ বিভিন্ন প্রকার শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। তন্মধ্যে দিনমজুর, ঘাট শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, মিস্ত্রী, কল-কারখানা শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, ঠেলা শ্রমিক, হকার শ্রমিক প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রম কোন মর্যাদাহানিকর বিষয় নয়। বরং সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ অতি পবিত্র ও উত্তম বলে বিবেচিত। এ বিষয়ে একটি হাদিস এসেছে হযরত রাফি ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,

**"জীবিকার্জনের জন্য কোন পদ্ধতিটি সর্বোত্তম?"**

জবাবে তিনি বলেছিলেন,

**"ব্যক্তির হাতের শ্রম অথবা সমস্ত ধোঁকা-ফেরেবহীন ও সৎ বেচাকেনা।"**

তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৮

www.waytojannah.com

পবিত্র উপার্জন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দনীয় বস্তু এবং তিনি আখিরাতে এর জন্য উত্তম বিনিময় দিবেন। তবে কোন প্রকার অসততা বা অবৈধতা এ উপার্জনের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। তখন তা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। কাজে ফাঁকি দেওয়া, সময় চুরি করা, যুলুম করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা এবং ধোঁকা ফেরেব ইত্যাদি প্রকারের অবৈধ কর্ম শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনকে কলুষিত করতে পারে। সুতরাং কল্যাণার্জনের জন্য এসকল অবৈধ কর্ম-কাণ্ডকে পরিহার করে সৎভাবে জীবনযাপন করাই সকলের ব্রত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

**হালাল খাওয়ার বরকত এবং হারাম খাদ্যের অকল্যাণ:**

ইসলামে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হালাল খাদ্য গ্রহণের ফলে মুমিনের অন্তর আলোকিত হয় যদ্বারা অন্যায় ও অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে হারাম খেলে বদঅভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে, এমনকি এঅবস্থায় তার দোয়াও কবুল হয় না। এ কারেনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন এভাবে,

**"হে রাসূলগণ ! পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী খাও ও নেক আমল কর। তোমরা যা কিছুই কর, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"**

আল কোরআন, সুরা মু'মিনুন(২৩), আয়াত- ৫১

উল্লেখিত আয়াতে পবিত্র বস্তু বলতে হালাল খাদ্যকে বোঝান হয়েছে। কেননা ইসলামী শরিয়তে যে সব বস্তু হারাম করা হয়েছে সেগুলি পবিত্র নয় এবং জ্ঞাণীদের দৃষ্টিতে উত্তম ও কাম্যও নয়। এখানে রাসূলগণকে সম্বোধন করা হলেও বস্তুতঃ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের উম্মতদের এই আদেশের অনুগামী করা। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশংকাই বেশি। এক কথায় দোয়া কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল খাদ্য গ্রহণ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য দু'হাত তুলে ইয়া রব! ইয়া পরওয়ারদেগার! বলে ডাকতে থাকে; কিন্তু তাদের পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছদও হারাম পয়সায় তৈরী, এমতাবস্থায় তার দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?"**

তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৮

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব রয়েছে। হারাম ভক্ষণের ফলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয়না। হারাম খেয়ে যে রক্ত মাংস তৈরী হয় তা অপবিত্র এবং অপবিত্র কেউ বেহেস্তে যেতে পারে না। বরং যাবতীয় অপবিত্রতার স্থান হল দোযখ। হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"সে সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ- বান্দা যখন নিজের পেটে হারাম লোকমা ঢোকায়, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন আমল কবুল হয় না। আর যার শরীরের মাংস হারাম মাল দ্বারা গঠিত, সে মাংসের জন্য তো জাহান্নামের আগুণই যোগ্য স্থান।"**

তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৬

এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যারা প্রতিনিয়ত হারাম কাজ করে যাচ্ছেন আর হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন করে চলছেন, তারা প্রকারান্তে সর্বক্ষণই হারাম ভক্ষণের মধ্যে নিপতিত রয়েছেন। তাই আল্লাহর কাছে তাদের ইবাদত ও দোয়ার কোন গ্রহযোগ্যতা থাকে না এবং এর পরিণাম পরকালীন স্থায়ী জাহান্নাম।

সাধারনতঃ মানুষকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য এবং পরিবার-পরিজনের খুশী ক্রয় করার জন্য গুণাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়। কেননা অর্থ-সম্পদ ব্যতীত এসব প্রয়োজন পুরা করা সম্ভব হয়না। আর সম্পদ আহরণের জন্য তাই মানুষ হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন অবৈধ এবং পাপ-পঙ্কিল রাস্তা বেছে নেয় এবং গুণাহের সাথে জড়িয়ে যায়। এভাবে যারা পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরাম-আয়েসকে প্রাধান্য দিয়ে আখিরাতকে ভুলে থাকছেন, তাদের সঞ্চয় স্পৃহা বোধ করি কখনই অবসান হবার নয়। তারা পাপের রাস্তায় উপার্জন করতেই অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এ জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধ্য করে এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকতে সচ্ছন্দ বোধ করে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, এ অবৈধ লালসার পরিণাম কখনই শুভ হতে পারে না। তবে কিয়ামতের আযাব যখন সামনে আসবে তখন তাদের বোধোদয় হবে, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। তখন মানুষ জগতের সঞ্চিত সমুদয় অর্থ-সম্পদ বিণিময় প্রদান করেও যদি এ আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবুও তা সম্ভব হবে না।

রোজ কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের কাছ থেকেই নিজের ধন-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের হিসাব সহ তার সারা জীবনের সকল কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কোন মানুষই নিজের জায়গা থেকে সরতে পারবেনা যতক্ষণ**

না তার কাছ থেকে চারটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নেয়া হবেঃ (১) সে নিজের জীবন কিভাবে নিঃশেষ করেছে? (২) নিজের যৌবনকে কোন কাজে বরবাদ করেছে? (৩) নিজের ধন-সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে? (৪) নিজের ইলমের উপর কতটা আমল করেছে?”

তফসীর মা’আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৬

অতএব আখিরাতের সে কঠিন সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রত্যেক মানুষকেই দুনিয়ায় যথাযথ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সে প্রশ্নের সঠিক সমাধান করে রাখতে হবে, অন্যথায় সমূহ বিপদ থেকে পরিত্রাণের কোন রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আসুন সবাই মিলে সকল প্রকার হারাম পরিত্যাগ করে হালালের সন্ধানে জীবনকে উৎসর্গ করতে ব্রত হই।

## মিথ্যা কসম বা মিথ্যা শপথ করা

## (Making False Oath)

কসম শব্দের আভিধানিক অর্থ শপথ। এর আরো অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে, যেমন: হলফ, দিব্যি, কিরে, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে কারো সংকল্প বা প্রদত্ত সাক্ষ্য অথবা স্বীকারোক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য শ্রদ্ধার সাথে নিবেদিত আল্লাহ্ তা'আলার নামে এর সমর্থন জ্ঞাপক অনুমোদনের ঘোষণা দেওয়ার নাম শপথ বা কসম। Websters Encyclopedic Dictionary অনুসারে Swearing is a solemn affirmation or declaration, made with a reverent appeal to God for the truth of what is affirmed.

প্রকৃতপক্ষে কসমের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তায়ালাকে কোন বিষয়ের বা নিজের কোন কর্মের সাক্ষী বানিয়ে নেয়। কসমের বিষয়টিকে তাই শরিয়তে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কসম সিদ্ধ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী:

০ **বালেগ হওয়া-** শপথ সিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া জরুরী। নাবালেগের কসম গ্রহণযোগ্য নয়।

০ **মানুসিক সুস্থতা থাকা-** সুস্থ মানুসিকতাও কসম সঠিক হওয়ার জন্য জরুরী। সুস্থ মানুষিকতায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিশুদ্ধ নিয়তে শপথ নেওয়া হলেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। পাগল বা মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তির শপথ সিদ্ধ হবে না। আবার অনিচ্ছাকৃত এবং অতিরিক্ত উত্তেজিত বা মাত্রারিক্ত রাগান্বিত অথবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নেওয়া শপথও বাতিল বলে গণ্য করা হবে। জোরপূর্বক বা বলপ্রয়োগে শপথ নিতে বাধ্য করা হলেও সেক্ষেত্রে এ শপথ পরিত্যাক্ত বলে বিবেচিত হবে।

০ **কাজটি বৈধ হওয়া-** শরিয়তে জায়েয বা মোবাহ কাজের জন্য শপথ নেওয়া সিদ্ধ। যেমনঃ দান-সাদকা করা, দরিদ্রকে খাওয়ানো, নফল রোযা রাখা, নফল সালাত পড়া ইত্যাদি কাজের জন্য শপথ করা সিদ্ধ। তবে শরিয়তের কোন ওয়াজিব বা মুস্তাহাব কাজ করার জন্য কোন শপথ নেই। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত, জুমার সালাত, রমজানের রোযা, যাকাত ইত্যাদি কাজগুলি বান্দার উপর ফরয বা ওয়াজিব বিধায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির জন্য তা সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য। আবার কোন হারাম কাজ করার জন্য কোন শপথ নেই, যেমনঃ মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মদ্য পান করা, চুরি করা, গানের জলসা করা, মাযারে মানত করা ইত্যাদি। তবে এসকল ক্ষেত্রে শপথ করা হলে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ প্রকারের শপথ হিসেবে বিবেচিত হয়ে কবীরা গুনাহের কারণ হবে।

০ **কসম আল্লাহর নামে হওয়া-** কসম করতে হবে একমাত্র আল্লাহর পবিত্র সত্তা বা তাঁর গুণাবলীর নামে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তা বা বস্তুর নামে নেওয়া কসম অবৈধ এবং তা

শির্ক সংঘটিত করে। যেমনঃ বাপ-দাদা, ছেলে-মেয়ে, দেব-দেবী, নবী-রাসূল, ফেরেশতা কিংবা কা'বা, কোরআন ইত্যাদির নামে নেওয়া কসমের কোন বৈধতা নেই।

**০ কসম কোন অসম্ভব বিষয়ের জন্য না হওয়া** - কোন অসম্ভব বিষয়ের উপর কসম করা যায়না বা তা সঠিক কসম বলেও বিবেচিত হয়না। যেমনঃ কেউ যদি পাখি হয়ে আকাশে উড়ার কসম করে, তবে সেটা উপযুক্ত কসম হবে না।

**মিথ্যা শপথ বা মিথ্যা কসম:** কসম করতে হয় সততার ভিত্তিতে। সত্য বর্জিত শপথ বা যে শপথের ভিত্তি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তা মিথ্যা শপথ বা মিথ্যা কসম হিসেবে বিবেচিত। মিথ্যা কসম শর'ই দৃষ্টিতে একটি কবীরা গুনাহ। মিথ্যা শপথ কবীরা গুণাহ্ হওয়ার সপক্ষে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্যতা করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা কবীরা গুণাহ্।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং ৬২১২

তবে শর'ই দৃষ্টিতেই হোক আর সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক, মিথ্যা শপথ যে একটি জঘণ্য পাপ তা সর্বজন স্বীকৃত। মিথ্যা শপথ ব্যক্তির স্বার্থপরতা আর হীন মন-মানসিকতার পরিচায়ক। মিথ্যা শপথ অন্যের অধিকার হরণ করে তাই এটা বান্দার হক নষ্ট করার পাপ সংঘটিত করে। কিন্তু জীবনের বাস্তবতায় অনেককেই মিথ্যা শপথের মত কঠিন অপরাধ করে বসতে দেখা যায়। একটি লোক যখন জানে যে, সে সত্য বলছে না অথচ সে সত্য বলার শপথ করল তাহলে সে মিথ্যা শপথ করল। আবার যখন কেউ কোন বিষয় সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে না, এ অবস্থায় সে তা জানা থাকার কসম করে তাহলে সেটা মিথ্যা কসম। এইভাবে কোন জিনিসের প্রতি নিজের হক না থাকা সত্বেও কেউ যদি কসমের মাধ্যমে সেটাকে নিজের বলে দাবী করে তাহলে সেটা মিথ্যা কসম। এরূপ মিথ্যা কসমের আরো অনেক নমুনা উপস্থাপন করা যায়। তবে মানুষ সাধারণতঃ কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য কিংবা কারো কোন সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য কসম করে থাকে। আবার অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে উন্নতি করার জন্য মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করে থাকে। মিথ্যা শপথের কারণ এবং উপায় যাই হোক না কেন, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। মিথ্যা শপথ সর্বাবস্থায় একটি কঠিন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

**মিথ্যা শপথের পরিণতি:**

মিথ্যা শপথের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে পরকালের কঠিন আযাব। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ মিথ্যা শপথকারীর আখিরাতে করুণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের কঠিন আযাবের হুঁশিয়ারী শুনিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

**“যারা আল্লাহর নামে কৃত এবং স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রী করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতেও তাকাবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।”**

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান, আয়াত-৭৭

উল্লেখিত আয়াতে ‘স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রী করে’-বলতে মিথ্যা শপথের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা নিজ নিজ শপথকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বা মিথ্যা শপথের বিনিময়ে পার্থিব জগতের কিছু উপকার লাভ করে, তাদের জন্য পরকালে কোন কল্যাণ থাকবে না। না আল্লাহ তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন আর না তাদেরকে তিনি পাপ হতে পবিত্র করবেন। উপরন্তু তাদেরকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। সেথায় তারা বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা’আলা বাহানার শপথ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এর জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

**“তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ-দ্বন্দের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদ করবে এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে।”**

আল-কোরআন, সুরা নাহল(১৬), আয়াত-৯৪

এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, কেউ যদি বাহানার কসম খায় অর্থাৎ কসম খাওয়ার সময়েই কসম খেলাপ করার ইচ্ছা রাখে এবং শুধু অপরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক গুণাহ্। এর পরিণতিতে মানুষের ধর্মে অটল থাকার পরেও পদস্খলন ঘটে যাবে এবং ঈমান থেকেই বঞ্চিত হবার আশংকা রয়েছে। ফলে এর দুর্ভোগ তাদেরকেই পোহাতে হবে এবং তাদেরকে ভোগ করতে হবে পরকালের কঠিন আযাব। মিথ্যা শপথের ভয়াবহ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত পূর্বক বেশকিছু হাদিস বর্ণিত আছে। ইমরান ইবনে হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**“যে ব্যক্তি কোন বিচারকের আদালতে বন্দী থাকা অবস্থায় মিথ্যা শপথ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।”**

হাদিস, সহীহ আবু দাউদ শরীফ, নং ৩২২৮

অন্য একটি হাদিসে আবু উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ ( সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“যে ব্যক্তি শপথের দ্বারা কোন মুসলমানের হক নষ্ট করে, তার জন্য আল্লাহ্ দোযখকে অনিবার্য ও বেহেশতকে নিষিদ্ধ করে রেখেছেন।”**

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,

**“ইয়া রাসূল** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**! খুব সামান্য হলেও?”**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

**“কাঁটাযুক্ত বাবলা গাছের শাখা হলেও এই সাজা দেওয়া হবে।”**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ২৫২

আশয়াছ ইবনে কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত আর একটি হাদিসে রয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে অন্যের জমি আত্মসাৎ করে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার হাত পা কাটা হবে।”**

হাদিস, সহীহ আবু দাউদ শরীফ, নং ৩২৩০

মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রেতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কিরূপ ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে,

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, **“তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না এমনকি তাদেরকে গুণাহ থেকে পবিত্রও করবেন না উপররন্তু তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।”**

আবু যর বলেন, **“তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)!”**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, **“যে ব্যক্তি টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রী করে।”**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ১৯৫

www.waytojannah.com

# মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া

## (Giving False Testimony)

সাক্ষ্য বলতে কোন ঘটনা বা বিষয়ের সমর্থনে উপস্থাপিত প্রামাণিক তথ্যকে বোঝায়। সাক্ষ্য প্রমাণের বেলায় মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কিংবা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করা, এ সবই হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া একটি মারাত্মক অপরাধ বা কবীরা গুণাহ। এটি কবীরা গুণাহ হওয়ার দলীল হিসাবে একটি হাদিস উপস্থাপন করা যায়। আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

আমরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন,

> **"আমি কি তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় গুণাহের কথা জানাব না?"**

তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। তারপর বললেন,

> **"সে গুণাহ গুলি হল: ১। আল্লাহর সাথে শরীক করা ২। পিতামাতার অবাধ্যতা করা ৩। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা কিংবা মিথ্যা কথা বলা।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ১৬১

মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইনসাফ তথা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। আবার ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। এর জন্য প্রত্যেককেই ন্যায়-নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে হয় এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ব্রত রাখতে হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে একটি মূলনীতি বিবৃত করেছেন এবং এর ভিত্তিতেই সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, যদিও এটা তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকুল হয় তবুও। যদি সে সম্পদশালী বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত।"**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৩৫

কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেন,

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায্য সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে যাও, কোন গোষ্ঠির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার হতে বিচ্যুত না করে। এটাই তাকওয়ার অধিকতর**

নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।"

আল-কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত-৮

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ মানুষকে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সততার ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা আর স্বজনপ্রীতির প্রশ্রয় না দিয়ে সত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য জোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে। সত্য এড়িয়ে যাওয়া বা কৌশলগতভাবে সত্য পরিহার করা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অধিকন্তু কোন প্রকার শত্রুতা ভয়-ভীতি বা কোন শক্তিশালী মহলের অনাকাঙ্খিত চাপের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে সত্য সাক্ষ্য প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান করা তাকওয়া বা পরহেজগারির পরিচায়ক। আর আল্লাহ্ মানুষের সকল কার্যাবলীই পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

**সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব:**

সাক্ষ্য প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা আগেই বলেছি যে, সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইনসাফ তথা ন্যয়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। তবে বিচার ব্যবস্থা যখন পুরোপুরি সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, তখন ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সত্য সাক্ষ্যও অপরিহার্য এবং এর কোন বিকল্প নেই। সত্য সাক্ষ্য যেমন একদিকে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি, তেমনি মিথ্যা সাক্ষ্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়। সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অতি সহজেই অনুমেয়। সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে নিহিত রয়েছে মূলতঃ দু'টি হক; একটি আল্লাহর হক আর অন্যটি বান্দার হক। আল্লাহর নির্দেশিত মূলনীতির আলোকে সত্য সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে এ দু'টি হক-ই যথাযথ আদায় হতে পারে। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম করে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে দু'টি হক বিনষ্ট করার পাপ সংঘটিত হয়।

**মিথ্যা সাক্ষ্যের অপকার সমূহ:**

মিথ্যা সাক্ষ্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় অশান্তির কারণ হয়ে থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্যের কবলে পড়ে একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে। নিচে সংক্ষেপে মিথ্যা সাক্ষ্যের অপকার সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হল:

ক) মিথ্যা সাক্ষ্য বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। কেননা বিচার ফয়সালা নির্ণীত হয় বাদী এবং বিবাদী পক্ষের সাক্ষীর মাধ্যমে। যে কোন পক্ষের মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে বিচারকের ফয়সালা নিশ্চিত ভুল হতে বাধ্য। আর তখন এর দায়-দায়িত্ব একমাত্র সাক্ষীকেই বহন করতে হবে এবং এর জন্য সে-ই গুণাহগার হবে।

খ) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তার উপর যুলুম করে। কেননা এ দ্বারা সে তার হক নষ্ট করে এবং তার জান-মাল বা সম্মানের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। এ গুণাহের ভার মিথ্যা সাক্ষ্য দাতাকেই বহন করতে হবে।

গ) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তার ওপরও যুলুম করে। কেননা এর মাধ্যমে সে অন্যের হক তার হাতে তুলে দিয়ে তাকে হারাম সম্পদ ভোগের ব্যবস্থা করে দেয়। যা ভবিষ্যতে তার সমূহ অকল্যাণই বয়ে নিয়ে আসে এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, এ অপরাধের দায়-দায়িত্ব সাক্ষ্যদাতা এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের যোগানদাতা উভয়ের উপরে বর্তাবে।

গ) মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অনেক হারাম বস্তুকে হালাল করে দেয়া হয়। অনেক সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা হয়। অনেক মানুষের জীবন বিসর্জন দিতে হয়। এসবের জন্য রোজ কিয়ামতে সাক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের দায়ে মহান প্রভুর বিচারালয়ের কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হবে অপরাধী হয়ে, যেখানে মিথ্যা বলার কোন প্রকার সুযোগ নেই।

ঘ) মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে একজন দোষীকে নির্দোষ এবং নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, সে বাদী কিংবা বিবাদী যে-ই হোক।

ঙ) মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে একটি নিষিদ্ধ সম্পদ, প্রাণ বা সম্ভ্রমের ওপর অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ করে দেয়া হয়।

চ) মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে দোষীকে আরও হঠকারী বানিয়ে দেয়া হয়। কারণ, সে এ ভাবেই কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়। অতএব সে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে নিস্কৃতি পাওয়ার আশায় আরো অপরাধ কর্ম ঘটিয়ে যেতে কোন দ্বিধা করে না।

**শর’ই পরিভাষায় সাক্ষ্যের পরিধি বা ব্যাপকতা:**

প্রচলিত অর্থে সাক্ষ্য বলতে যা বোঝায়, তা শুধু বিচার কার্য পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিচারক বা আদালতের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্যের বিষয়টি আরো ব্যাপক এবং শর’ই পরিভাষায় সাক্ষ্য শব্দটির ব্যাপক অর্থই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখিত প্রকারের সাক্ষ্য ছাড়াও শরিয়তে যে সকল বিষয়কে সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে, তা হল:

ক) মেডিকেল সার্টিফিকেট: কোন ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত ইনজুরি সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ময়না তদন্তের রিপোর্ট ইত্যাদি বা অন্যান্য প্রকারের সার্টিফিকেট এ সবই এর আওতাধীন। সেক্ষেত্রে অসততা বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন সার্টিফিকেট দেওয়া হলে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে কবীরা গুণাহ হবে।

খ) শিক্ষা সংক্রান্ত সনদপত্র: শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নিরূপণ করে পরীক্ষক কর্তক যে মূল্যায়ণ করা হয় এবং তার উপর যে সনদপত্র দেওয়া হয়, সেটিও সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য। এক্ষেত্রেও সততা থাকা জরূরী। ইচ্ছাকৃত কোন প্রকার অসততার আশ্রয় নেওয়া হারাম এবং তা কঠোর পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) ভোট দানের সাক্ষ্য: ভোট একটি আমানত এবং সাক্ষ্যও বটে! আইনসভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও এক প্রকার সাক্ষ্য। এখানেও সততার ভিত্তিতে যোগ্যতার মাপকাঠীতে বাছাই করে ভোট দান করা বাঞ্ছণীয়। কিন্তু কোন প্রকার স্বার্থের খাতিরে বা চাপের মুখে অযোগ্য এবং অসৎ পাত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হলে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়ে কঠোর পাপ হবে। (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০):

**মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার পরিণতি:**

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা কবীরা গুণাহ, তাই এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। মিথ্যা সাক্ষ্যের ভয়াবহতার উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে খুরায়েম ইবনে ফাতিক (রাঃ) হতে। তিনি বলেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফযরের নামায আদায় শেষে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন,

**"মিথ্যা সাক্ষ্যদান আল্লাহর সাথে শির্কসম অপরাধ।"**

হাদিস, সহীহ আবু দাউদ শরীফ, নং ৩৫৬১

পাঠকবৃন্দ! আমরা জানি যে, শির্ক চরম যুলুম এবং এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি। সুতরাং এ হাদিস থেকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার পরিণতি খুব সহজেই অনুমেয়।

## কথায় কথায় মিথ্যাবলা

## (Being a Perpitual Liar)

মিথ্যাবলা মহাপাপ। সকল ধর্মেই এটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষও অনায়াসে স্বীকার করে নেবে যে, মিথ্যাবলা একটি অন্যায়। সত্য বিবর্জিত সকল কর্ম-কাণ্ডই মিথ্যা নামে অভিহিত। মানুষ বাকশক্তি সম্পন্ন জীব। সকল সৃষ্টি থেকে এটা মানুষের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বাকশক্তির ব্যবহার করে জিহবার সাহায্যে মানুষ যখন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে, তখন সেটাকেই মিথ্যাবলা হিসেবে গণ্য করা হয়।

নৈতিকভাবে পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সততা বা সত্যবাদিতা। এটা হল মানুষের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি। বাকশক্তি যখন মানুষের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, তখন এর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাও অত্যাবশ্যকীয়। বাকশক্তিকে সত্যবাদিতার উপর বহাল রেখে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। অপরপক্ষে, মিথ্যাবাদিতা মানুষের মনুষ্যত্বকে বিনাশ করে দেয়। তাই কারো পক্ষে মিথ্যাবলা তার নিজের মনুষ্যত্বকেই বলি দেওয়ার শামিল।

মিথ্যাবলা মানুষের সহজাত বা প্রকৃতিজাত অভ্যাস নয়। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি মানুষকে মিথ্যা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেক কারণেই মানুষ মিথ্যা বলে থাকে। সাধারণতঃ যে সকল কারণে মানুষ মিথ্যা বলে থাকে তা হল:

- অভ্যাসগত মিথ্যাবলা
- গর্ব বা অহংকারবশে মিথ্যাবলা
- স্বার্থ হাসিল করার জন্য মিথ্যাবলা
- অতিরঞ্জিত করার জন্য মিথ্যাবলা
- অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য মিথ্যাবলা
- ক্ষয়-ক্ষতি হতে রেহাই পাওয়ার জন্য মিথ্যাবলা
- ব্যবসায় প্রসার লাভের জন্য মিথ্যাবলা
- ক্ষমতা বহাল রাখার জন্য মিথ্যাবলা
- ভুল করে বা না জেনে মিথ্যাবলা

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মিথ্যা বলার পেছনে অন্তর্নিহিত কারণ যাই থাক না কেন, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো যায়না। আর মিথ্যা বলা একটি না-জায়েয তথা হারাম কাজ।

**মিথ্যাবলার অবৈধতা:**

ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যাবলা একটি কবীরা গুণাহ্। কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা এটা প্রমাণিত রয়েছে। মিথ্যাবাদিতাকে মূর্তিপূজা তথা শির্কের সমপর্যায়ের অপরাধ বিবেচনা করে মিথ্যাভাষণের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। আল্লাহ্ বলেন,

**"তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে।"**

আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-৮২

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র মিথ্যা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে এভাবে,

**"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিওনা এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপণ করো না।"**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৩৫

এ আয়াত থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, সত্য গোপন করাও মিথ্যাবলার শামিল এবং কাউকেই জানা সত্ত্বেও কোন বিষয় গোপণ করার কোন প্রকার বৈধতা দেওয়া হয়নি। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে অবিশ্বাসী কাফির আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

**"মিথ্যা কেবল তারাই রচনা করে, যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"**

আল-কোরআন, সুরা নাহল(১৬), আয়াত-১০৫

মিথ্যা বলা ঈমানী দুর্বলতা তথা ঈমানহীনতার বহিঃপ্রকাশ। একজন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যা বলা দুস্কর। যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না তাদের পক্ষেই মিথ্যা বলা সম্ভব।

হাদিস শরীফেও মিথ্যাবলাকে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"চারটি স্বভাব যার মধ্যে আছে সে প্রকৃতই মুনাফিক। যার মধ্যে এ চারটির একটিও আছে, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। স্বভাবগুলি এইঃ সে কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে অর্থাৎ ওয়াদা করলে খেলাপ করে, যখন তার**

**কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে আর ঝগড়া বাঁধলে অশ্লীল গালমন্দ করে।”**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং-১১৪

**মিথ্যাবলার প্রকার:**

সামাজিক বাস্তবতায় যে সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মিথ্যাবলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হল এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর মিথ্যাবলা অবৈধ হওয়া সম্পর্কিত কোরআন ও হাদিসের দলীল পেশ করার প্রচেষ্টা করা হল।

১) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করা:

কোরআন ও হাদিসের দলীল ছাড়া কোন তথ্য বা সত্য বিবর্জিত কোন কথা আল্লাহ্ সম্পর্কে বলা মানুষের ইখতিয়ার বহির্ভূত। কেননা সেটা বস্তুতঃ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করার শামিল। আর এটা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করা জঘণ্যতম পাপ। তৎকালীন আরবের কাফির ও মুশরিকগণ আল্লাহ্ সম্পর্কে অনেক অসত্য ও অবান্তর কথা প্রচলিত করেছিল। আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা মুনাফিক, মুশরিক এবং কাফিরদের কাজ। কোন মুমিন ব্যক্তির এর সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে না। তবে এ যুগেও যারা দলীল প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কে নানা অসত্য ও অমূলক কথা প্রচার করার পায়তারায় লিপ্ত রয়েছেন, তারা মূলতঃ ঐ বিধর্মীদের ন্যায়-ই আচরণ করছেন এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন সময়। আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, হালাল-হারাম সহ অন্যান্য বিধানে পরিবর্তন আনা, শরিয়তের মধ্যে মনগড়া নিয়ম-কানুন তৈরী করে তা আল্লাহর্ বিধান হিসেবে চালিয়ে নেয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে যারা মিথ্যা তৈরী এবং এর উপর আমল করে তারা কখনই কৃতকার্য হতে পারে না, বরং পরকালে তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন,

**“যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি তাদের আবাস নয়?”**

আল-কোরআন, সুরা আনকাবূত(২৯), আয়াত-৬৮

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করাও সমপর্যায়ের অপরাধ। জাল বা মনগড়া হাদিস তৈরী করে তা রাসূলের নামে ব্যবহার করা নিকৃষ্ট অপরাধ। এ অপরাধ সহ রাসূলের উপর যে কোন মিথ্যা আরোপের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন দোযখে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে লয়।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-২৬৫৯

২) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া:

মহান আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে একটি মূলনীতি ঘোষণা করেছেন এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে মানুষকে নির্দেশ দান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, যদিও এটা তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকুল হয় তবুও। যদি সে সম্পদশালী বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত।"**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৩৫

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অবৈধ এবং কঠিন পাপ। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে এ গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩) ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা বলা:

ক্রয়-বিক্রয়ে বা লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সততা থাকা অত্যাবশ্যক। সততার আড়ালে মিথ্যার আশ্রয়ে যে কোন প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন নাজায়েয এবং তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। পারস্পরিক লেনদেন মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। তাই সকলের কল্যাণের স্বার্থে লেনদেন হওয়া উচিত সততার ভিত্তিতে। এটি মানুষের গুরুত্বপূর্ণ একটি হক। কারো পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে অন্যের হক নষ্ট করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকারে লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি স্মরণ রাখা এবং এর প্রতি যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। জীবনের বাস্তবতায় মানুষকে অনেক প্রকার লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। যেমন, ব্যবসা-বানিজ্যের লেনদেন, পারিবারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লেনদেন, আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স এবং জমা-জমির লেনদেন ইত্যাদি। এসকল লেনদেনে যেভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হতে পারে তার কিছু নমুনা পেশ করা হল - জেনেশুনে নিকৃষ্ট মালকে ভাল বলে চালিয়ে দেওয়া, কমদামে কেনা সামগ্রী বেশী মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে বলে শপথ করে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করা, ধার বা বাকী শোধ না করেও তা শোধ হয়েছে বলে দাবী করা, পুরাতন বা বকেয়া জিনিসকে নতুন বলে চালিয়ে দেওয়া, নিজের সম্পত্তি মিথ্যা বলে একাধিকবার ভিন্নভিন্ন লোকের কাছে বিক্রি করা, মিথ্যা দাবীর ভিত্তিতে শরিকী সম্পত্তি অন্যের কাছে বিক্রী করা ইত্যাদি প্রকারের আচরণ এবং আরো অন্যান্যভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া এই গুনাহের মধ্যে শামিল।

ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা থেকে সকলকেই দূরে থাকতে হবে। কারণ এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

> **“তিন ব্যক্তির সাথে রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ পাক কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।”**

আবু যর জিজ্ঞেস করলেন,

> **“ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কারা?”**

তিনি বললেন,

> **“তারা হলো, যে ব্যক্তি টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়ে, যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রি করে।”**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং-১৯৫

৪) মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা:

সমাজের কিছু কিছু মানুষ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে মানুষের কাছ থেকে ফায়দা আদায় করার প্রচেষ্টা করে থাকে। অনেকে মিথ্যা স্বপ্ন বলার মাধ্যমে বুজুর্গ সাজার চেষ্টা করে এবং ধর্মের নামে ব্যবসা শুরু করে দেয়। বর্তমানে নতুন নতুন মাজার তৈরীর এটা এক ধরনের পুঁজি। কোন পীর-বুজুর্গের নাম-গন্ধও নেই অথচ মাজার ওঠার অলীক স্বপ্ন আওড়িয়ে নতুন নতুন মাজার তৈরী করা হচ্ছে। এটা দু'দিক থেকে না-জায়েয এক তো মাজার উঠানো তা আবার মিথ্যা স্বপ্নের ভিত্তিতে। কিন্তু মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করাও মিথ্যা বলার সমান অপরাধ। এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে পরকালীন অকল্যাণ। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

**“যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন বর্ণনা করে যা সে আদৌ দেখেনি, তাকে দু'টি যবের দানার মধ্যে গিট লাগাতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনও তা পারবে না।”**

হাদিস, বোখারীর রেওয়াতে রিয়াদুস সলেহীন, নং-১৫৪৫

৫) শোনা কথা বলে বেড়ানো:

মানুষ যা কিছু শোনে এর মধ্যে সত্যও থাকতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। তাই কারোপক্ষে এর সত্যতা যাচাই না করে শোনা কথা বর্ণনা করা ঠিক নয়। কেননা শোনা কথার মধ্যে যতটুকু মিথ্যা রয়েছে তা বলে বেড়ান প্রকারান্তে মিথ্যা বলারই নামান্তর। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণিত আছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে। । তিনি বলেন যে, হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**“মানুষের পাপের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তাই অপরের কাছে বলে বেড়ায়।”.**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং-৪৯০৯

৬) ঠাট্টাচ্ছলে মানুষ হাসাতে মিথ্যা বলা:

ঠাট্টাচ্ছলে মানুষ অনেক সময় মিথ্যার অবতারণা করে থাকে। এভাবে মিথ্যা বলাতে কোন পাপ আছে বলে তারা মনে করে না। বাঙ্গালী ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ১ এপ্রিল এভাবে মিথ্যা বলে মানুষকে বোকা বানিয়ে মজা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১ এপ্রিল পালন করা ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী এবং সেটা অবৈধ। মিথ্যা বলা হারাম, সেটা ঐকান্তিকতার সাথে করা হোক কিংবা নিছক মজা করার জন্য করা হোক। এ বিষয়ে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। বাহায ইবনে হাকীম (রঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“যে ব্যক্তি মানুষকে নিছক হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে, তার পরিণাম খুবই খারাপ! তার পরিণাম খুবই মন্দ।”**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং-৪৯০৭

৭) শিশুদের মন ভোলাতে মিথ্যা বলা:

মানুষ অনেক সময় শিশুদের মন ভোলাতে নানা প্রকার শিশুতোষ মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিশুদের অর্থহীন বা ভুয়া আশ্বাস দেওয়াও এক প্রকারের মিথ্যাবলা। এ বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত আছে আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে,

একবার আমার মা আমাকে ডাকেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমার মা আমাকে বলেন,

**“তুমি এখানে এস আমি তোমাকে দেব।”**

তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাকে জিজ্ঞেস করেন,

**“তুমি তাকে কি দিতে চাচ্ছ?”**

মা বললেন,

**“আমি তাকে খেজুর দেব।”**

এ কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান,

**“তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার জন্য একটা পাপ লেখা হত।”**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং-৪৯০৮

**বৈধ প্রকারের মিথ্যা:**

সাধারণভাবে মিথ্যাবাদিতা বড় গুণাহ্ হিসেবে বিবেচিত হলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। ইসলামী শরি'য়ায় বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যাবলার বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে এ বৈধতা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে:

-  যুদ্ধ ক্ষেত্র
-  স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক
-  মানব কল্যাণ

এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণিত আছে ইবনে শিহাব (রহঃ) হতে। তিনি বলেন,

**"তিনটি স্থান ছাড়া কোন ব্যপারে রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমি শুনি নাই। যথাঃ যুদ্ধক্ষেত্র, মানুষের মধ্যে বিবাদ মিটানোর উদ্দেশ্যে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা চলাকালে।"**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং-৬৩৯৭

**মিথ্যাবলার পরিণামঃ**

মিথ্যাবলা চরম অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যাবলা একটি নিন্দনীয় কাজ এবং সর্বজন স্বীকৃত একটি কবীরা গুণাহ। তাই এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়ানক। রোজ হাশরের দিনে মিথ্যাবলার জন্য মিথ্যাবাদীকে কৈফিয়ত তলব করা হবে। কিন্তু তারা পলায়নের কোন পথ খুঁজে পাবেনা এবং তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন,

**"অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।"**

আল-কোরআন, সুরা আন-আম(৬), আয়াত-৯৩

কোরআনের অন্যত্র মিথ্যাবাদীর সম্পর্কে বলা হয়েছে,

**"তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের জন্য।"**

আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-১০

হাদিসের মাধ্যমেও মিথ্যাকে পরিহার করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং মিথ্যার পরিণতি জাহান্নাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তোমরা অবশ্যই মিথ্যা ত্যাগ করবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন বান্দা সদা মিথ্যা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার প্রতি ঝুঁকে থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে ডাহা মিথ্যাবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।"

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-১৯২১

www.waytojannah.com

## অহংকার করা
## (Being Arrogant)

অহংকার হচ্ছে সত্যবিমূখতা, স্বেচ্ছাচারিতা আর আত্মম্ভরিতার সংমিশ্রনে সৃষ্ট এক প্রকার অন্তরের অনুভুতি যার প্রতিফলন ঘটে মানবিক আচার-আচরণের মাধ্যমে। নিজের সম্পর্কে সুউচ্চ ধারনা পোষণ করা এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার মন-মানসিকতা থেকেই অহংকারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে অহংকার করতে নিষেধ করেছেন এবং তা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। অহংকার একটি কবীরা গুণাহ্ তাই এ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সকলেরই অহংকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা থাকা আবশ্যক।

**অহংকারের পরিচয়:**

অহংকারের পরিচয় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি হাদিসের মাধ্যমে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,

একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করল,

> **"মানুষ সুন্দর পোষাক কামনা করে, সুন্দর জুতার প্রত্যাশা করে, এটাও কি অহংকাররূপে গণ্য?"**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

> **"আল্লাহ সুন্দর। তিনি সুন্দরকে প্রিয় মনে করেন। অহংকার হলো দম্ভের সাথে সত্য ও খাঁটিকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ করা।"**
>
> হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং-১৬৭

এখান থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা কোন দোষের কিছু নয় এবং অহংকার প্রদর্শনের কোন উপাদানও নয়। এ হাদিসের মর্মানুযায়ী অহংকারের সাথে দু'টি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা প্রতীয়মান হয়:

১) সত্যকে অস্বীকার করা

২) মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

প্রথমতঃ হককে অস্বীকার করা: আল্লাহ্ তা'আলা চিরসত্য। ঈমানের দাবীতে এ সত্যকে মেনে নেওয়া জরুরী। আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর কর্তৃত্ব, আল্লাহর মহত্ব ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়া এবং সেই সাথে আল্লাহর সকল হুকুম-আহকাম নির্দ্বিধায় পালন করা ঈমানের পরিচায়ক। এ হাদিস অনুসারে চিরসত্য আল্লাহকে অস্বীকার করা অর্থাৎ তাঁর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা,

প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং তাঁর অনুগ্রহকে তুচ্ছ জ্ঞান করা- এ সবই অহংকার প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট নমুনা। এভাবে আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করা এবং ইবাদত বিমুখ থাকাও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে নিজের যশঃ, খ্যাতি, প্রভাব, প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি আল্লাহর হাত ছাড়া নিজের ক্ষমতাবলে প্রাপ্ত বলে দাবি করলে নিজেকে অতিমূল্যায়িত করা হয় এবং প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। এভাবে আল্লাহকে হীন মূল্যায়িত করে নিজেকে অতিমূল্যায়িত করা অহংকারের অন্তর্ভূক্ত। অহংকার করার অধিকার কেবলমাত্র তারই আছে, যে কারো মূখাপেক্ষী নয়। একমাত্র আল্লাহ্-ই অমূখাপেক্ষী, এছাড়া সবকিছুই তাঁর মূখাপেক্ষী। তাই অহংকার করার দাবিদার একমাত্র আল্লাহ্। অহংকার মানুষকে সীমালঙ্ঘনকারী বানিয়ে ফেলে। কিন্তু আল্লাহ্ দাম্ভিক সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না। তার জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি। পবিত্র কোরআনে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যেখানে অহংকারীদের শাস্তি বিধানের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম অহংকার প্রদর্শনের ঘটনাটি ঘটেছিল মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে। ইবলিস শয়তান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে মাটির সৃষ্ট আদম (আঃ)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করে অহংকার করেছিল। তার এই অহংকারের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ ইবলিসকে চির অভিশপ্ত করে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাকেসহ তার অনুসারীদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে চির জাহান্নামী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে,

**“এবং যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সিজদা করল; সে অগ্রাহ্য করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।”**

আল-কোরআন, সূরা বাকারা(২), আয়াত-৩৪

এর পরে পৃথিবীতে অহংকার প্রদর্শন করে আল্লাহর রোষানলে নিপতিত হয়েছিল যারা তাদের মধ্যে ফেরআ’উন, হামান, কারূন প্রমূখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের অহংকারের কাহিনী পবিত্র কোরআনে বিষদভাবে বিবৃত রয়েছে। প্রত্যেকেই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি এ দুনিয়াতেও ভোগ করেছে এবং আখিরাতেও আল্লাহ্ এদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

অহংকারী লোক শয়তানের দোসর। তারা শয়তানের আনুগত্য করে প্রকৃত সত্যকে বেমালুম ভুলে যায়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দাম্ভিক ও অহংকারী আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে পারে না। ঈমানের রোকনসমূহের যে কোনটিকে অস্বীকার করা বা অসত্য বলে ধারনা করা নিশ্চিত অহংকার। এভাবে কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে পার্থিব জীবন নিয়ে ব্যাস্ত থাকা এবং দম্ভভরে পৃথিবীতে বিচরণ করা অহংকারের পরিচায়ক। কিয়ামতে অস্বীকারকারী দাম্ভিকের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন,

**"তোমাদের মা'বুদ এক মা'বুদ; সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী। আল্লাহ্ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"**

আল-কোরআন, সূরা নাহল(১৬), আয়াত-২২,২৩

আল্লাহর ইবাদত বিমুখতা সবচেয়ে বড় অহংকার। আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই তো আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন,

**"আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"**

আল কোরআন, সুরা যারিয়াত(৫১), আয়াত-৫৬।

কাজেই সকলেরই উচিত এই মহাসত্যকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে এক আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা। তবে যারা আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফিল রয়েছেন তাদের একথা জেনে নেয়া উচিত যে, তারা এ চির সত্যকে অস্বীকার করে অহংকারী হয়ে ঐ অবাধ্য অভিশপ্ত শয়তানেরই দলভুক্ত হয়ে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা: মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণের মাধ্যমেও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ থাকতে পারে। পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে অবমূল্যায়ণ করা, তাদের অবজ্ঞা করা, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা গরীব ও মিসকীনদের ঘৃণা করা ইত্যাদি আচরণ অহংকার প্রকাশ করে। এ সম্পর্কে হযরত লোকমানের স্বীয় পুত্রের উদ্দেশ্যে হেকমতপূর্ণ উপদেশগুলি পবিত্র কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

**"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করোনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না, কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"**

আল-কোরআন, সূরা লোকমান(৩১), আয়াত-১৮

নিজেকে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা আর অন্যদেরকে নিজের তুলনায় ক্ষুদ্র ও অধম মনে করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা - এ সবই অহংকার প্রকাশের লক্ষণ। পৃথিবীতে দর্পভরে বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করা উদ্ধত ও অহংকারী লোকের অভ্যাস। আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারীকে পছন্দ করেন না এবং তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অহংকার করতে নিষেধ করেছেন।

মানুষের সাথে মানুষের অহংকার প্রকাশের অনেকগুলি দিক রয়েছে। অহংকার থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাই সে সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ পর্যায়ে মানুষের আচার-আচরণে যেভাবে অহংকার প্রদর্শিত হয়ে থাকে তার কিছু বাস্তব চিত্র উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করা হল:

- মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করা, তুচ্ছ করা, অবজ্ঞা করা ও মানুষকে ঘৃণা করা। মানুষের গুণের থেকে নিজের গুণকে বড় মনে করা। কারো কোন কর্মকে স্বীকৃতি না দেয়া, কোন ভাল গুণকে মেনে নেয়ার মানসিকতা না থাকা - এ সবই অহংকার প্রকাশের নমুনা।
- একজন বিত্তশালী ব্যক্তি যখন সম্পদের প্রাচুর্যে অন্ধ হয়ে দরিদ্র, মিসকীন তথা সাধারণ মানুষদের অবজ্ঞার চোখে দেখে বা ঘৃণা করে, তাহলে সে অহংকার করল।
- একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যখন ক্ষমতার দম্ভে অন্যদেরকে হেয় ভাবতে থাকে এবং তাদের পরোয়া না করে, তাহলে সে অহংকার করল।
- একজন উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তি যখন অন্যদেরকে মূর্খ বলে গালি দেয় বা তাদের অসম্মান করে, তাহলে সে অহংকার করল।
- একজন ধর্মীয় আলেম যখন নিজেকে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক ও সমৃদ্ধশালী মনে করে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ও বেপরোয়া ভাব দেখায়, তাহলে সে অহংকার করল।
- দলীল বিহীন যারা কোরআন ও হাদিস নিয়ে অন্যের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তারা অহংকারী বটে।
- নামী-দামী গাড়ী চড়ে দম্ভে যাদের মাটিতে পা পড়েনা আর মাটির মানুষের সাথে মিশতে যারা ঘৃণা বোধ করে তারা অহংকারী।
- বিলাসবহুল অট্টালিকার উঁচু তলায় বসে নিচুশ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনা নিয়ে যারা উপহাস করে তারা তো অহংকারী।
- মূল্যবান পোষাকের বাহাদুরী দেখিয়ে চাল-চলনে আত্মম্ভরিতার ভাব প্রকাশ করা এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করা অহংকার।
- বড় মানুষী প্রকাশের জন্য টাকনুর নীচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে পরিধান করে কাপড় হেঁচড়িয়ে চলা অহংকার।

**মানুষ যে সব জিনিস নিয়ে অহংকার করে তার বর্ণনা:**

মানুষ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অহংকার করে থাকে। কারণ আল্লাহ্ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা ও গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেন। সবার মধ্যে সব গুণ ও যোগ্যতার সমাহার নাও থাকতে পারে। যার যা আছে তাই নিয়ে সে অহংকার করে। এভাবে এক একজন মানুষ এক একটি নিয়ে অহংকার করে। সাধারণতঃ মানুষ যে সব নি'আমত নিয়ে অহংকার করে, নিম্নে তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হল:

**১. ধন-সম্পদ:** মানুষ যখন ধন-সম্পদ লাভ করে তখন সে বড়াই বা অহংকার করে থাকে। সে মনে করে এ তো তার যোগ্যতার ফসল। সে তার বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞান দিয়েই ধন-সম্পদ লাভ করে। আসলে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। সে এও জানে না যে, তাদের ধন-সম্পদ কোথা থেকে আসে। বস্তুতঃ ধন-সম্পদ আল্লাহ্-ই মানুষকে দান করেন এবং তাদের জন্য এটা একটি পরীক্ষা মাত্র যে এগুলি পেয়ে কে সত্য বিমুখ হয়ে যায়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"যখন আমার পক্ষ থেকে নি'আমত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, এটা তো আমার জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে দেয়া হয়েছে। না, বরং এটা এক পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"**

আল-কোরআন, সূরা যুমার(৩৯), আয়াত-৪৯

ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে মানুষ যে অহংকারী হয়ে যায় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে কারূন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন। কিন্তু সে প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করল এবং নিজ জ্ঞানবলে সম্পদের অধিকারী হয়েছে বলে অহংকার করল। কারূন সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

**"কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, "দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তদ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।" কারূন বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোন দল ছিলনা, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না।"**

আল-কোরআন, সূরা কাসাস(২৮), আয়াত-৭৬-৭৮,৮১

এভাবে কারূন প্রকৃত সত্যকে পাশ কাটিয়ে নিজেকে অতিমূল্যায়ণ করে নিজ জ্ঞানবলে অগাধ সম্পদের মালিক হয়েছে বলে অহংকার প্রকাশ করল। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তার অহংকারের শাস্তিস্বরূপ তাকে তার সম্পদ সহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেন।

বর্তমান যমানায়ও খুঁজে দেখলে কারূনের মত এমন অনেক অহংকারী লোকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তবে এ যমানার কারূনদের এ ঘটনায় বিবৃত কারূনের শেষ পরিনতি থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। তাদের অন্তরে এ ধারনা বদ্ধমূল থাকা উচিত যে, ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা এবং তিনি চাইলে যে কোন মুহূর্তে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে পারেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

**২. ইলম বা জ্ঞান:** অহংকারের অন্যতম একটি কারণ হল ইলম বা জ্ঞান। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, আলেম, ওলামা, তালেবে ইলম ও তথাকথিত পীর মাশায়েখদের মধ্যে অহংকার খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, শয়তান তাদের পিছনে লেগে থাকে এবং চেষ্টা করে কিভাবে তাদের ধোঁকায় ফেলা যায়। এ কারণেই বর্তমানে আমরা দেখতে পাই আলেমদের মধ্যে ফেতনা-

ফ্যাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ খুব বেশী। প্রত্যেকেই নিজেকে বড় আলেম ভাবেন এবং অন্যের মতামতের একেবারেই মূল্যায়ণ করেন না বিধায় সমাজে এ ধরণের সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে অহংকার আর এটা হচ্ছে অহংকারের লড়াই। কিছু কিছু আলেম আছেন যারা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অন্য আলেমদেরকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। ইলম বা জ্ঞানের ব্যাপারে নিজেকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবা এবং অন্যকে স্বল্প জ্ঞানী, নিকৃষ্ট বা নিরেট মুর্খ ভেবে তাদের কোন প্রকার পাত্তা না দেওয়া নিশ্চিত অহংকার প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ। বস্তুতঃ সমাজের তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানী সম্প্রদায় নিজের জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং নিজেকে গর্বিত মনে করেন। কিন্তু তারা কেহই প্রকৃত সত্যকে অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা পর্যন্ত করছেন না। এ ধরনের স্বভাব একজন আলেম বা জ্ঞানীর জন্য যে কতটা জঘন্য এবং ক্ষতিকর তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর এক প্রকারের অহংকারী আলেম আছেন যারা মনে করেন কোরআন, হাদীস তথা শরীয়তের উপর তাদেরই একচেটিয়া অধিকার। সেখানে সাধারণ মানুষের কোন অধিকার নেই। তারা যেটা বলবেন সেটাই গ্রহনযোগ্য হবে যদিও বা তা কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন। একজন সাধারণ মানুষও যে কোরআন হাদিস পড়ে শরীয়তের জ্ঞান হাসিল করতে পারে এটা মেনে নিতে তাদের গাত্র দাহ হয়। বস্তুতঃ এটাও ঐ সমস্ত আলেমদের মাঝে বিদ্যমান থাকা এক প্রকার অহংকার। তবে সত্যিকার ইলম একজন বান্দার মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং বিনয়ের সৃষ্টি করে, অহংকার সৃষ্টি করে না। তাই যারা প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী তারা কখনো অহংকার প্রকাশ করতে পারেন না। যাদের মধ্যে অহংকার বিরাজমান তারা অন্যের কথা সত্যি হলেও তা আমলে নেন না বা তার কথার মূল্যায়ন করেন না; উপরন্তু তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তারা আসলে সত্যিকারের ইলম হাসিল করতে ব্যার্থ হয়েছেন এবং তারা আলেম নামের কলঙ্ক।

**৩. আমল ও ইবাদত:** অনেকেই তাদের ইবাদত ও আমল নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে। সে মনে করে মানুষের কর্তব্য হল, তারা তাকে সম্মান করবে, সব কাজে তাকে অগ্রাধিকার দিবে এবং তার বুজুর্গি নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করবে। আর সে মনে করে সব মানুষ ধ্বংসের মধ্যে আছে, শুধু সে একাই নিরাপদ। এখানে যে দোষণীয় বিষয়টি তা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে মানুষকে নিকৃষ্ট জেনে, নিজেকে তাদের উপর প্রাধান্য দেয়, আর তাদের মন্দ মনে করে এবং তাদের উপর বড়াই করে এ ধরণের আচরণ করে। বর্তমানে অনেক আলেমকেই তার বুজুর্গী নিয়ে অহংকার করতে দেখা যায়। সে মনে করে যে, সে এবং তার পথ অবলম্বীরাই কেবল শুদ্ধ আর অন্যেরা বিপথগামী। কাউকে সহীহ হাদিসের উপর আমল করতে দেখলেও সেটা যদি তার মত ও পথের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সেটা সে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। অথচ তার উচিত ছিল তাহকিক করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে তা যতই তার নিজের মতের বিরুদ্ধে যাক না কেন, সেটার উপর আমল করা। এটা করতে না পারা তার ভিতরে বিদ্যমান থাকা এক প্রকারের অহংকারের বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু নয়।

**৪. ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি:** ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অহংকার প্রদর্শনের অন্যতম একটি কারণ। ক্ষমতার দম্ভ মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মানুষ অনেক সময় প্রকৃত সত্যকে ভুলে যায় এবং বিপথগামী হয়ে যায়। তখন সে এহেন কোন অবৈধ কর্ম নেই যা না করতে পারে। ক্ষমতাহীন এবং দরিদ্র মানুষদের অবজ্ঞার চোখে দেখা, মানুষকে নানাভাবে অত্যাচার করা, পৃথিবীতে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে আরম্ভ করে আপনজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা পর্যন্ত তারা করে থাকে নির্দ্বিধায়। এসব সম্ভব হয় শুধুমাত্র ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে সৃষ্ট অহংকারের কারণে। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

**“ ক্ষমতায় অধিষ্ঠত হলে সম্ভবতঃ তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ এদেরকেই লানত করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিহীন।”**

আল-কোরআন, সুরা মুহাম্মদ(৪৭), আয়াত-২২,২৩

ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যে মানুষকে অহংকারী করে তোলে তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে মুসা (আঃ)- এর আমলের ফেরআউন। ক্ষমতার দম্ভে সে ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করল এবং মহা সত্যকে অস্বীকার করে বসল। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে,

**“ফিরআ’উন বললঃ হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা।”**

আল কোরআন, সুরা কাসাস(২৮), আয়াত-৩৮।

বর্তমান যমানায়ও যে এধরণের ফেরআউনের অস্তিত্ব একেবারে নেই এ কথা হলফ করে বলা যায়না। তবে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মহাসত্য আল্লাহ্ তা’আলার বিধান কে অস্বীকার করেন বা তাঁর নাফরমানী করে বসেন তারা যে প্রকারান্তে ঐ অহংকারী ফেরআউনেরই দলভুক্ত সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**৫. বংশ:** কতক লোক আছে যারা উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে অন্যদের উপর বংশ ও আভিজাত্য নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে। সে অহংকার বশতঃ মানুষের সাথে মিশতে চায়না, তাদের সাথে কথা বলা অপছন্দ করে এবং মানুষকে ঘৃণা করে। উচ্চ বংশের লোকেরাই অহংকার বশতঃ সমাজে উচু-নীচু, বড়-ছোট আর ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান জিয়িয়ে রেখেছে।

**অহংকারের পরিণতি:**

প্রবাদ আছে “অহংকার পতনের মূল”। এ প্রবাদটি সকলেরই স্মরণ রাখা চাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে যারা অহংকার করেছে তাদের সবারই পতন হয়েছে। বস্তুতঃ অহংকারীকে আল্লাহ্ মোটেই পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ যেখানে অহংকারীকে ভালবাসেন না সেখানে অহংকারীর পতন তো অবশ্যম্ভাবী। অহংকার একটি শয়তানী কর্ম। কাজেই দুনিয়াতে যারা অহংকার করে তারা শয়তানের দোসর। আর শয়তানের দোসরদের সমুচিত শাস্তিও আল্লাহ্

নির্ধারণ করে রেখেছেন। পোশাকে-আসাকে ও বোলচালে যতই ধার্মিক ভাব-ভঙ্গি দেখান হোক না কেন; কিংবা মহাজ্ঞানী, পীর সাহেব, হুজুর, হাজী সাহেব, জজ-ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার হিসেবে যতই নাম-ডাক ছড়িয়ে পরুক না কেন- অন্তরে অহংকার দানা বাঁধলে কিন্তু সবই বৃথা। এমনকি প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী হলেও নিস্তার নেই। লোক দেখানোর জন্য মুখে লম্বা দাঁড়ি, মাথায় টুপি আর হাতে তসবি ঝুলিয়ে পার পাওয়া যাবে না। আর স্যুট পড়ে কশে টাই বেঁধে, হাতে সোনার ঘড়ি, আঙ্গুলে হিরের আংটি ও গলায় মতির লকেট ঝুলিয়েও অহংকারে যতই দু'দিনের দাপাদাপি করা হোক- এসব করে সাময়িকভাবে একালে যতই খ্যাতি বা প্রতিপত্তি জুটে যাক না কেন-পরকালের খাতায় একজন অহংকারীর প্রাপ্তিটা কিন্তু বড়ই নাজুক এবং মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে। অহংকারের কারণে অতীতে পৃথিবীতে অনেক জাতিকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছেন। পরকালেও তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কঠিন আযাব। অহংকারবশতঃ যারা আল্লাহর ইবাদত করে না তারা পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। এসম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমূখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"**

আল-কোরআন, সূরা মু'মিন(৪০), আয়াত-৬০

অহংকার প্রকাশের শাস্তির নমুনা আমরা পবিত্র কোরআন থেকেই জানতে পারি। মুসা (আঃ)-এর আমলে ফেরআউন ক্ষমতার বলে অহংকার প্রকাশ করেছিল। তার এই ঔদ্ধত্ব ও হঠকারীতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাকড়াও করেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা পার্থিব শাস্তি হিসাবে তাকে তার সংগীদের সহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন,

**"ফিরআ'উন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল, ওরা ধরে নিয়েছিলো, ওদের কখনো আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে না। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ যালিমদের পরিনাম কি ভয়াবহ হয়ে থাকে।"**

আল কোরআন, সুরা কাসাস(২৮), আয়াত:৩৯-৪০।

শুধু পার্থিব শাস্তি নয় পরকালেও ফেরআউন ও তার সঙ্গী সাথীদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠোর আযাব।

অহংকারের বশবর্তী হয়ে যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে, তাদের জন্য জান্নাত হারাম করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"**

আল-কোরআন, সূরা আল আরাফ(৭), আয়াত-৪০

www.waytojannah.com

কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ অহংকারীদের সম্পর্কে বলেন,

**"অতএব, জাহান্নামের দরজা সমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট।"**

আল-কোরআন, সূরা নাহল(১৬), আয়াত-২৯

অহংকারের পরিণতি এবং এর শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক হাদিস রয়েছে। কিয়ামতের দিন অহংকারীদের অবস্থার বিবরণ দিয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"কিয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিঁপড়ার আকারে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে বুলাস নামক জাহান্নামের জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। প্রজ্জলিত অগ্নি তাদের মাথার উপরে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ এবং প্রস্রাব-পায়খানা খেতে দেয়া হবে।"**

তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৩

অন্য একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেনঃ

**"মান সম্মান আমার ভূষণ এবং গর্ব-অহংকার আমার চাদর। যে ব্যক্তি আমার সাথে এই ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে, তাকে আমি শাস্তি প্রদান করব।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৬৪৪৩

অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের অধিকার পাবে না। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে। তিনি বলেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যার অন্তরে অণু পরিমানও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।**

হাদিস, রিয়াদুস সলেহীন, নং-৬১৩

পোশাকের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করা এবং তার পরিণতি সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত আছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**“অতীতকালে কোন এক ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরিধাণ করে আত্মম্ভরিতার সাথে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই গর্বিত মনে করছিল। সে চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রকাশ করে চলছিল। হঠাৎ-ই আল্লাহ্ তাকে ধ্বসিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নীচে ধ্বসতে থাকবে।**

হাদিস, রিয়াদুস সলেহীন, নং-৬২০

পরিধেয় বস্ত্র টাকনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়া অহংকার প্রকাশের একটি লক্ষণ এবং এর জন্য পরকালীন আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস বার্ণত আছে। এরূপ একটি হাদিসে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“পায়ের গিঁটদ্বয়ের (টাকনু) নিচে পরিধেয় কাপড় ঝুলিয়ে দিলে দোযখের আযাব ভোগ করতে হবে।”**

**হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-২২৩৮**

কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে অহংকারের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানা গেল। কাজেই সর্বাবস্থায় অহংকার পরিত্যাগ করা সকলের জন্য বাঞ্ছণীয়। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, অহংকার নয় বরং বিনয়-ই মানুষকে মহানুভব করে এবং পরকালীন মুক্তি এনে দেয়।

# চুরি করা
# (Stealing)

'চুরি করা মহাপাপ' এ প্রবচনটি সর্বজনবিদিত। তবে চুরি কি? এ বিষয়টি সর্বাগ্রে জেনে নেয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞগণ চুরির আভিধানিক এবং পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপন করেছেন এভাবেঃ **'অন্যের সম্পদ বা মাল তার অনুমতি ব্যতিরেকে হেফাযতের জায়গা থেকে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে চুরি বলা হয়।'** শর'ই পরিভাষায়ও একেই চুরি বলা হয়।

**চুরির শাস্তি:**

চুরির অপরাধের দু'টি দিক রয়েছেঃ

- এক. চোর অন্যায়ভাবে অপরের মাল নিয়ে যায়। ফলে মালিকের প্রতি জুলুম করা হয় এবং তার হক নষ্ট করা হয়।
- দু'ই. সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহর হক বিনষ্ট হয়।

অপরাধদৃষ্টে দু'দিক দিয়েই চুরির শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। প্রথম দিক দিয়ে এ শাস্তি মজলুমের বা মালিকের হক হওয়ার কারণে সে ক্ষমা করে দিলে মাফ হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় দিক দিয়ে আল্লাহর হক বিনষ্ট করার কারণে মালিক ক্ষমা করে দিলেও শাস্তি মাফ হবার নয়-যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা না করবেন। শরিয়তের পরিভাষায় একেই হদ বলা হয়। শর'ই বিধানে চুরির উপর হদ প্রযোজ্য। চুরির পার্থিব শাস্তিস্বরূপ চোরের হাত কেটে দেয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কোরআনে,

**"যে পুরুষ  চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। এ সাজা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাময়।"**

আল-কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত-৩৮

এ আয়াতে চুরির জাগতিক শাস্তি হিসেবে পুরুষ কিংবা মহিলা চোরের হাত কেটে দেওয়ার বিধান জারি করা হয়েছে। শর'ই দৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে চুরির হদ। তবে কি পরিমান মাল চুরি হলে হদ প্রযোজ্য হবে সে ব্যাপারে কোরআনে কিছুই বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়টি পুরাপুরিভাবে সুন্নার উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

**"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক দীনারের এক চতুর্থাংশ এবং এর অধিক পরিমান মূল্যের মাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটে দিতেন।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৪২৫৩

www.waytojannah.com

আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

**“রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন। ঢালটির মূল্য ছিল তিন দিরহাম”**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৪২৬১; তিরমিযী শরীফ, নং ১৩৮৬

উপরোক্ত হাদিস দুটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা সে সময়ে এক দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) সমান ছিল ১২ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) । সে হিসেবে এক চতুর্থাংশ দীনার তিন দিরহামের সমানই হয়। আমাদের দেশের প্রচলিত স্বর্ণের মাপ অনুযায়ী এক চতুর্থাংশ দীনারের সমান হয় ১ গ্রামের সামান্য কিছু বেশী ওজনের স্বর্ন। এই পরিমান স্বর্ণের মূল্যের সমান বা তার অধিক মূল্যের মালামাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটার নির্দেশ রয়েছে।

তবে চুরির হদ তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সন্দেহাতীতভাবে চুরির অপরাধ প্রমাণিত হবে অর্থ্যাৎ শরিয়তের বিধি অনুযায়ী যখন অপরাধ ও প্রমাণ উভয়টিই পূর্ণতা লাভ করবে এবং তাতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতা থাকবে না। চুরির সংজ্ঞাদৃষ্টে শর’ই বিশেষজ্ঞগণ চুরি প্রমাণের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী মনে করেনঃ

- প্রথমতঃ মালটি কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের মালিকাধীন থাকতে হবে।
- দ্বিতীয়তঃ মালটি হেফাযতের যায়গায় থাকতে হবে অর্থাৎ তালাবদ্ধ গৃহে অথবা চৌকিদারী পাহাড়ায় থাকতে হবে।
- তৃতীয়তঃ মালটি মালিকের বিনা অনুমতিতে নিতে হবে।
- চতুর্থতঃ মালটি গোপণে নিতে হবে।

উপরোক্ত সকল শর্তগুলির উপস্থিতিতে চোরের নিজস্ব স্বীকারোক্তি অথবা গ্রহণযোগ্য দু’জন সাক্ষীর মাধ্যমে চুরি প্রমাণিত হলে হদ প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ভাবে কাজী বা বিচারক হদ এর ফয়সালা জারী করবেন এবং তা রাষ্ট্রীয়ভাবেই কার্যকর করা হবে। কিন্তু কোন শাসক বা বিচারক, এর কোন রদবদল করতে পারবে না বা ক্ষমাও করতে পারবে না। এমনকি মালের মালিক অর্থাৎ যার চুরি যায়, সে ক্ষমা করে দিলেও হদ রদ করা যাবে না। কেননা এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং এর ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা কারো নেই। তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা বা বিচার ব্যবস্থার বাইরে ব্যক্তিগতভাবে হদ জারী করার কোন অধিকার কারো নেই। আরো উল্লেখ্য যে, অপরাধ প্রমাণে বা উপরোক্ত শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ রহিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, যেখানে চুরির কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে হদ প্রয়োগ করা হয় না, সেটা চুরি নয় বা সে চুরি শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয রয়েছে। এক্ষেত্রে হদ রদ হলেও চোর অবাধে ছাড়া পেয়ে যাবেনা বরং সেক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ড দেয়া হবে।

আবার শর’ই বিশেষজ্ঞদের মতে চোর চুরি করার পর গ্রেফতারের পূর্বে অথবা পরে আত্নসমর্পন করে ক্ষমা চাইলেও তার জাগতিক শাস্তি হদ অর্থাৎ হস্ত কর্তন মওকুফ হবার নয় (তফসীরে মা’আরেফুল-কোরআন, ৩য় খন্ড, পৃ:১১৮)। তবে চোরাই মাল ফেরত দিয়ে বা মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গুণাহ্ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যহতি লাভ হতে পারে।

## ডাকাতি করা
## (Robbery)

ডাকাতি একটি জঘন্য অপরাধ। ডাকাতির সাথে জড়িত থাকে নৃশংসতা, দুর্বৃত্ততা, নিষ্ঠুরতা, অসততা আর  অরাজকতা সহ নানাবিধ অপকর্ম। তাই এটা মহাপাপ। সাধারণ পরিভাষায় ডাকাতির সংজ্ঞা নিরূপন করা হয়েছে এভাবেঃ

**'সংঘবদ্ধ দল, দুর্বৃত্ত বা দস্যু কর্তৃক কারো ব্যক্তিগত সম্পদ তার কাছ থেকে বা তার উপস্থিতিতে তার ইচ্ছার বিরূদ্ধে নৃশংসভাবে অথবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে জোর পূর্বক কেড়ে নেওয়াকে ডাকাতি বলা হয়।'** Webster's Encyclopedic dictionary অনুসারে ডাকাতি হচ্ছে 'the felonious taking of property of another from his person or in his immediate presence, against his will by violence or by intimidation.'

ডাকাতির সংজ্ঞাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে প্রকাশ্যে মানুষের সম্পদ হরণ করা হয়। তবে ডাকাতির বাস্তবতা আরো ভয়াবহ হতে পারে। কখনও কখনও সম্পদ হরণ করার সাথে শারীরিক নির্যাতন, মারপিট ও রক্তপাত সহ হত্যা এবং শ্লীলতা বা সম্ভ্রম হানির মত বর্বরতাও যোগ হতে পারে। এর ফলে জন নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয় এবং সমাজে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। ডাকাতি একটি নৈতিকতা বিবর্জিত সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় এবং আল্লাহর আইন পরিপন্থী কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

**ডাকাতির শাস্তি:** ডাকাতির অপরাধের দু'টি দিক রয়েছেঃ

- এক. ডাকাত অন্যায়ভাবে অপরের মাল নিয়ে যায়। ফলে মালিকের প্রতি জুলুম করা হয় এবং তার হক নষ্ট করা হয়।
- দু'ই. সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। এর ফলে আল্লাহর হক বিনষ্ট হয়।

অপরাধদৃষ্টে দু'দিক দিয়েই ডাকাতির শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। প্রথম দিক দিয়ে এ শাস্তি মজলুমের বা মালিকের হক। দ্বিতীয় দিক দিয়ে আল্লাহর হক বিনষ্ট করার কারণে মালিক ক্ষমা করে দিলেও শাস্তি মাফ হবার নয়, যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা না করবেন। শরিয়তের পরিভাষায় একেই হদ বলা হয়। শর'ই বিধানে ডাকাতির উপর হদ প্রযোজ্য। ডাকাতি যেহেতু সংঘবদ্ধ দল কর্তৃক সংঘটিত হয়, কাজেই এ হদ দলের সকল সদস্যদের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। ডাকাতির পার্থিব শাস্তির বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে:

**"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে, অথবা**

**তাদের বিপরীত দিকের হাত ও পা কেটে দিতে হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এটা তাদের পার্থিব লাঞ্ছণা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তবে তোমরা তাদেরকে গ্রেফতারের পূর্বে যদি তারা স্বেচ্ছায় তাওবা করে নেয় তাহলে যেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। "**

আল-কোরআন, সুরা মায়েদা(৫), আয়াত-৩৩-৩৪

.

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, **'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার'** অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাঁদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করা। মুমিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনকারী প্রকারান্তে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণাকারীরূপে বিবেচিত। **'পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়'** বলতে বোঝায় হত্যা ও সম্পদ অপহরণের মাধ্যমে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। এ জাতীয় অপরাধ মূলতঃ সংঘটিত হয় বিদ্রোহী দল কর্তৃক ডাকাতি ও রাহাজানির প্রাক্কালে। ডাকাতির ক্ষেত্রে যেহেতু উপরোক্ত প্রকারের অপরাধ সংঘটিত হয়, তাই সকল তফসীরবিদগণের ঐক্যমতে এ আয়াতে বর্ণিত সকল শাস্তি ডাকাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অপরাধের মাত্রার তারতম্য অনুসারে শাস্তির প্রকার নির্ধারণ করতে হবে। ইমাম আতিয়ারের মতে, **যে ডাকাত হত্যা ও সম্পদ হরণ এ দু'টি অপরাধ করবে তাকে হত্যা করা হবে এবং এরপর শুলেও চড়ান হবে। যে ডাকাত সম্পদ কেড়ে নেবে কিন্তু কাউকে হত্যা করবে না, তাকে শুধু হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। যে ডাকাত শুধু রক্তপাত করবে কিন্তু সম্পদ হরণ করবে না তাকে হত্যা করা হবে। আর যে হত্যাও করবে না এবং সম্পদও হরণ করবে না, কিন্তু অস্ত্র নিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।** এতো গেল পার্থিব শাস্তির বর্ণনা; কিন্তু পরকালে আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি। তাই পরকালের কঠিন আযাবের কথা চিন্তা করে কারো পক্ষেই এক মুহূর্তের জন্যও ডাকাতি, রাহাজানি বা সন্ত্রাসের মত জঘণ্য অপরাধের সাথে জড়িত থাকা সমীচীন নহে। তবে যারা না জেনে এ ভুলপথে পরিচালিত হয়েছেন তারা যদি তাদের উপর আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে তাওবা করে নেয় এবং যাদের সাথে এ আচরণ করা হয়েছে তাদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেয় তাহলে তাদের উপর হদ প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ তাদের উপর উল্লেখিত পার্থিব শাস্তির কোনটাই আর কার্যকর করা হবে না। তারা মুক্তি পেয়ে যাবে। সর্বোপরি খাঁটি তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে পাপ মোচনের আর্জি পেশ করে আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করা হলে পরকালীন আযাব থেকেও নিস্কৃতি পাওয়ার আশা করা যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

www.waytojannah.com

## জুলুম/ অত্যাচার করা

## (Committing Oppression)

জুলুম ও অত্যাচার সমার্থবোধক শব্দ। অন্যায়, অবিচার, নিপিড়ণ, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা আর অবৈধতার সমাহার জুলুম। জুলুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অন্যের উপর অন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা আর অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগের মত নিষ্ঠুর আচরণ। Webster Encyclopedic Dictionary অনুসারে জুলুম হচ্ছে "The exercise of authority or power in a burdensome, cruel or unjust manner" অর্থাৎ নৃশংস, দুর্বহ অথবা অবৈধ উপায়ে অধিকার খাটানো বা ক্ষমতার অপব্যবহারের নাম জুলুম। অন্যভাবে বলা যায়, যে কারো উপর নিষ্ঠুরতার সাথে অবৈধ পন্থায় বা অন্যায়ভাবে নিজের অধিকার খাটানো বা ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রচেষ্টাই হল জুলুম। জুলুম সীমালঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটিত করে আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। জুলুম তাই কবীরা গুণাহ্।

**জুলুমের প্রকার:** ক্ষেত্রভেদে জুলুম বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন:

**ক) আল্লাহর সাথে জুলুম করা:** আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং অফুরন্ত জীবনোপকরণ দান করেছেন। তাই সকলেরই উচিত এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। কিন্তু তা না করে, কেউ যদি আল্লাহর এহসানের বদলায় তাঁকে অস্বীকার করে বা তাঁর শরীক স্থাপন করে বা তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর ইবাদত থেকে গাফিল থাকে, তবে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"নিশ্চয়ই শির্ক বড় জুলুম।"**

আল-কোরআন, সুরা লুকমান(৩১), আয়াত-১৩

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

**"ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালিম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।"**

আল-কোরআন, সুরা হুদ(১১), আয়াত-১৮

যদিও বাহ্যত শির্ক করা কিংবা কুফরী করা আল্লাহর সাথে জুলুম করা হয় বলে প্রতিয়মান হয়, তবুও প্রকারান্তে সেটা নিজের উপর জুলুম করার শামিল। কেননা আল্লাহ্ কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হন না। উপরন্তু জুলুমের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে জালিমকেই বহন করতে হয়।

**খ) নিজের উপর জুলুম করা:** আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত শরীয়তের সকল হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে পালন করা। কেননা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার মুক্তি।

কিন্তু তা না করে শরীয়তের হুকুম-আহকাম উপেক্ষা করে নিজের খেয়াল-খুশী মত জীবন পরিচালনা করার অর্থ আখিরাতের শাস্তি ক্রয় করে নেওয়া এবং সেটা নিশ্চয়ই নিজের উপর জুলুম বৈ কিছু নয়। তাই যে কোন অন্যায় করা বা পাপকাজ করা বস্তুতঃ নিজের উপর জুলুম করারই নামান্তর। আল্লাহর হুকুম অমান্য করা যে নিজের উপর জুলুম করার শামিল তা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তখন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছেন। অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে এই বলে ক্ষমা প্রর্থনা করেছিলেন,

**"হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"**

আল-কোরআন, সুরা আরাফ(৭), আয়াত-২৩

**গ) মানুষের উপর জুলুম করা:** মানুষ সমাজবদ্ধ বিবেকসম্পন্ন জীব। এখানে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সুসম্পর্ক ও সদ্ভাব বজায় থাকা জরুরী। মানুষের প্রত্যেকটি আচার-আচরণের একটা বৈধ সীমা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘিত হলে জুলুম এর মত অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যে কোন মানুষের হক নষ্ট করা জুলুম। জুলুম বিভিন্নভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। সমাজে সর্বাধিক প্রচলিত জুলুমের মধ্যে রয়েছে:

- জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বা দখল করা।
- চাঁদাবাজি করা বা জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা।
- অবৈধভাবে মানুষ হত্যা করা।
- বিনা উস্কানিতে কারো উপর আক্রমণ করা।
- মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা।
- বিনা কারণে রক্তপাত করা।
- মানুষকে গালাগাল করা।
- অন্যের অধিকার হরণ করা।
- মানুষের মর্যাদা হানি করা।
- দস্যুবৃত্তি করা।
- দুর্বলের উপর নৃশংসতা চালানো।
- অন্যের জমি দখল করা।
- অন্যের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা।
- কারো হক নষ্ট করা।
- পাওনাদারের প্রাপ্য পরিশোধ করতে অস্বীকার করা।
- মানুষকে ধোঁকা দেয়া বা ঠকানো।

- কারো উপর ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ চাপানো।
- শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করা।
- স্বামী/স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা
- চাকর/চাকরাণীর প্রতি রুক্ষ ও অসদাচরণ করা।
- সরকার কর্তৃক জনগণের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো অথবা জনগণের সাথে প্রতারণা করা ইত্যাদি।

**জুলুমের নিষিদ্ধতা:** জুলুম বা অত্যাচার একটি মহাপাপ এবং এর উপর শরীয়তের কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী রয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"কোন মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের ধন, প্রাণ এবং মান-সম্ভ্রম নষ্ট করা হারাম।"**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং- ৬৩১১

একটি হাদিসে কুদসীতে আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ বলেনঃ

**"হে আমার বান্দাগণ ! আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের উপরও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের প্রতি জুলুম করো না।"**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং-৬৩৪০

**জুলুমের পরিণতি:**

জুলুম বা অত্যাচারের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'আলা জুলুমবাজদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কখনও উদাসীন নন। তিনি এদেরকে শুধু একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং অবশেষে তিনি তাদের পাকড়াও করেন। তাঁর পাকড়াও সম্পর্কে কাউকে নিরাপদ মনে করার কোন কারণ নেই। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"জুলুমবাজরা তাদের জুলুমের পরিণতি সহসাই জানতে পারবে।"**

আল-কোরআন, সুরা শু'আরা(২৬), আয়াত-২২৭

অতীতে বহু জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে জুলুমের কারণে। জুলুমের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কত জনপদকে যে ধ্বংস করেছেন তার সাক্ষী বহন করে চলছে ইতিহাস। জুলুম করে কোন জনপদের অধিবাসীরা নিস্কৃতি পেতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারী ও অন্যায়মূলক আক্রমনকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখেরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত

আছেই। আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং কঠিন হয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে কোরআনে বর্ণিত আছে,

**"তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন যখন তারা জুলুম করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন।"**

আল-কোরআন, সুরা হুদ(১১), আয়াত-১০২

কেউ কেউ কোন জালিমকে অনায়াসে মানুষের উপর জুলুম করতে দেখলে এ কথা ভাবে যে, হয়তো বা সে ছাড় পেয়ে গেল। তাকে আর কোন শাস্তিই দেয়া হবে না। না, ব্যপারটা কখনই এমন হতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের দিনের কঠিন শাস্তির অপেক্ষায় রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

**"তুমি কখনো মনে করনা, এ জালেমরা যা করে যাচ্ছে তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা গাফেল রয়েছেন। বরং তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। যেদিন সবার চক্ষু হবে স্থির বিস্ফারিত। সেদিন তারা ভীত-বিহব্বল হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছুটোছুটি করবে। তাদের চক্ষু এতটুকুর জন্যও নিজের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে একেবারেই আশা শূন্য।"**

আল-কোরআন, সুরা ইব্রাহিম(১৪), আয়াত-৪২-৪৩

যারা আল্লাহর সাথে জুলুম করে আর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করে কিংবা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত দ্বীনকে অস্বীকার করার মত সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধ সংঘটিত করে তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহ আযাব। আল্লাহ্ বলেন,

**"আমি জালিমদের জন্য জাহান্নামের এমন এক আগুণ প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনি তাদের পুরোপুরিই পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি, যা তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে। এটা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং সে জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!"**

আল-কোরআন, সুরা কাহফ(১৮), আয়াত-২৯

মানুষের উপর যারা জুলুম করে তাদের জন্যেও কিয়ামতের দিনে প্রস্তুত রাখা হয়েছে কঠিন শাস্তি। সে শাস্তি থেকে কোন জালিমই পার পেয়ে যেতে পারবে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে**

অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি ”

আল-কোরআন, সুরা শুরা(৪২), আয়াত-৪২

কিয়ামতের দিন জালিমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং তারা ভোগ করবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**“জেনে রেখ যে, জালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।”**

আল-কোরআন, সুরা শুরা(৪২), আয়াত-৪৫

কিয়ামত দিবসের কথা মাথায় রেখে সকল জুলুমবাজদের উচিত জুলুম বা অত্যাচার পরিত্যাগ পূর্বক তাওবা করে নেয়া। অন্যথায় তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**“যারা মুমিন  পুরুষ এবং নারীকে নির্যাতন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।”**

আল-কোরআন, সুরা বুরূজ(৮৫), আয়াত-১০

জুলুমের পরিণতি যে জাহান্নাম সে সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**“তোমরা কি বলতে পার অভাবগ্রস্ত কোন ব্যক্তি?”**

তারা বলল,

**“আমাদের মধ্যে যার নিকট অর্থ সম্পদ নেই সেই তো অভাবগ্রস্ত।”**

তখন তিনি বললেন,

**“আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে ব্যক্তি রোজ কিয়ামতে নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে একে গালি দিয়েছে, ওর অপবাদ করেছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, ওকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তির নেক আমল হতে ঐসমস্ত লোকদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত পাওনাদারের হক তার নেক আমল হতে পূরণ করা না গেলে তার ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের অংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।”**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং-৬৩৪৫

www.waytojannah.com

জুলুমের ক্ষেত্রে জুলুমের সহযোগীতা ও জালেমের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করাকেও ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জালিমের সহায়তা করাও জুলুম সম অপরাধ এবং এর জন্যও একই ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**“আর জালিমের প্রতি ঝুঁকে পড়োনা; অন্যথায় তোমাদের দোযখের আগুন স্পর্শ করবে।”**

আল-কোরআন, সুরা হুদ(১১), আয়াত-১১৩

এ আয়াতের মর্মার্থ আনুযায়ী বোঝা গেল যে, জালিমের সাথে আপোসকামী হওয়া বা তাদের কার্যকলাপ খুশীমনে মেনে নেওয়া বা তাদেরকে জুলুম করতে সহায়তা করা ইত্যাদি আচরণও অপরাধ সংঘটিত করে এবং তাদেরকেও জালিমের ন্যায় একই পরিণাম ভোগ করতে হবে।

## আত্মহত্যা করা
## (Committing Suicide)

'আত্মহত্যা মহাপাপ' এ প্রবচনটি সর্বজনবিদিত। আত্মহত্যা বলতে বিশিষ্টজনরা যা বুঝিয়েছেন, তা হলঃ **ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন ধ্বংস করা বা স্বেচ্ছায় নিজেকে হত্যা করা।** Webster Encyclopedic Dictionary অনুসারে আত্মহত্যা হচ্ছেঃ 'Intentional taking of one's life.'

মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্ট জীব। মানুষের জন্ম ও জীবন যেমন সত্য তেমনি তার মৃত্যুও অবধারিত সত্য। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সকলের মৃত্যু দিয়ে থাকেন। জীবন ও মৃত্যুর যাবতীয় বিষয় তাঁরই নিয়ন্ত্রাণাধীন। সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। তাই নিজের জীবন বিপন্ন করার অধিকারও কারো নেই; বরং স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা হারাম করা হয়েছে। জীবন-মৃত্যুর এ রহস্যের খেলায় সকলেরই উচিত আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ন আত্মসমর্পন করা। তাই কারো জন্য এটা সমীচীন নয় যে, সে নিজের জীবন বলি দেয় বা আত্মহত্যা করে। জীবনে যত প্রতিকুল অবস্থাই আসুক না কেন, কোন অবস্থাতেই কাউকে আত্মহত্যা করার কোন বৈধতা শরিয়তে দেয়া হয়নি; বরং তা মহাপাপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে আত্মহত্যার মত অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়। আত্মহত্যার পিছনে বিভিন কারণ থাকতে পারে। সাধারণত যে সকল কারণে মানুষ আত্মহত্যার মত নির্মম সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে তার কিছু বাস্তবতা তুলে ধরা হল:

- পিতামাতা ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে মনোমালিন্য
- দাম্পত্য কলহ
- পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া
- দূরারোগ্য ব্যধি বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ যন্ত্রণা
- অভাবের তাড়না
- প্রেমে ব্যর্থতা
- শ্লীলতাহানি
- ব্যবসায় বিফলতা বা আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি
- চাকুরী হীনতা বা বেকারত্ব
- বিষন্নতা ইত্যাদি

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আত্মহত্যার আরো অনেক কারণ থাকতে পারে। মুলত যে অবস্থায় মানুষ জীবনের প্রতি সকল আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে বা নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দুনিয়া ও জীবন যখন তার কাছে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, সে অবস্থায় মানুষ আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। শয়তান তার এ

সিদ্ধান্তে প্ররোচনা দেয় এবং ইন্ধন যোগায়। এক পর্যায়ে শয়তানের আকাঙ্খাকে পূরণ করে সে আত্মহত্যার মত নির্মম কাজটি করে বসে। তবে পরিস্থিতি বা পরিবেশ যতই অসহনীয় হোক না কেন, সকল অবস্থাতেই মানুষকে ধৈর্য অবলম্বন করে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে নিজের হাতে নিজের জীবনকে শেষ করে দেওয়া কারো জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। কেননা আল্লাহর দেয়া মূল্যবান জীবনকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন করে দেওয়ার অধিকার কাউকে প্রদান করা হয়নি; এ কথাটি মনে রাখা সকলের জন্য আবশ্যক।

এত কিছুর পরেও সমাজে আত্মহত্যার মত নির্মম ঘটনা থেমে নেই। বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে পরিলক্ষিত হয় এ ঘটনা। আত্মহত্যার জন্য মানুষ বিভিন্ন পন্থা বেছে নেয়। সাধারণতঃ যে সকল পন্থায় আত্মহত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে, তা হলঃ

- আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে
- ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে
- বিষপান করে
- ঘুমের ঔষধ খেয়ে
- পানিতে ঝাপ দিয়ে
- পাহাড় বা উচুস্থান থেকে লাফিয়ে পড়ে
- গলায় ফাঁস লাগিয়ে
- আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে
- ট্রেন লাইনে বা চলন্ত গাড়ীর নিচে আত্মাহুতি দিয়ে।
- আত্মঘাতি বোমা হামলা করে
- ইলেকট্রিক শক

আত্মহত্যা যে প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতিতে এবং যে কারণেই করা হোক না কেন, সকল অবস্থায়ই আত্মহত্যা হারাম এবং কবীরা গুণাহ।

**আত্মহত্যার পরিণাম:**

মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার অমোঘ বিধান। তবে বিধিসম্মত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মানুষের মৃত্যু হওয়াটাই সকলের জন্য বাঞ্ছণীয়। কিন্তু আত্মহত্যার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মৃত্যুকে নিজের হাতে নিয়ে নিজেই নিজেকে শেষ করে ফেলা হয়। এ কারণে এটি একটি গর্হিত কাজ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তা মোটেই পছন্দ করেন না। এ কাজ থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কঠোর নির্দেশ দান করেছেন এবং এ নির্দেশ অমান্যকারীদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করার ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন,

"তোমরা নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। আর সীমা

**অতিক্রম করে ও জুলুম করে যে এ কাজ করে, নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।”**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-২৯,৩০

আল্লাহ তা'আলা আত্মহত্যাকারীর জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্ত দিয়ে আত্মহত্যা করল আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে সে বস্ত দিয়েই শাস্তি দিবেন। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“যে ব্যক্তি কোন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সেই অস্ত্র তার হাতে থাকবে। দোযখের মধ্যে সেই অস্ত্র দ্বারা অবিরাম নিজেকে আঘাত করতে থাকবে। এভাবে সে চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর যে বিষপান করে আত্মহত্যা করবে সে দোযখের আগুণের মধ্যে থেকেই সেই বিষ পান করতে থাকবে। এভাবে সে চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি অবিরত পাহাড় থেকে নিজেকে দোযখের আগুণে নিক্ষেপ করতে থাকবে। এভাবে সে ব্যক্তি চিরকাল সেখানে কাটাবে।”**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং-২০১

আল্লাহর দেয়া প্রাণ ও আয়ুস্কাল মানুষের জন্য একটি বিরাট নিয়ামত। এটা সুখময় আখিরাত হাসিলের জন্য সীমিত অবকাশ মাত্র। এ স্বল্পকালীন সময়ে পার্থিব লোভ-লালসা আর অবৈধ মোহমায়ার জালে আবদ্ধ না হয়ে শরীয়তের সকল হুকুম-আহকাম সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় জীবন পরিচালনা করাই সকলের ব্রত হওয়া উচিত। পার্থিব সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, অপমান-লাঞ্ছণা আর যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তি পেতে যারা আত্মহত্যার মত অবৈধ পন্থা বেছে নেয়, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের অমঙ্গল নিজেই ডেকে আনে। প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত যে, জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে মুক্তি লাভ করা যায়না বা তাতে দুঃখ-কষ্টের অবসানও হয়না, বরং তা চিরস্থায়ী আখেরাতের জীবনের জন্য বয়ে আনে প্রভূত অকল্যাণ এবং দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা। কেননা আল্লাহর দেয়া এ অবকাশকে যারা স্বহস্তে ধ্বংস করে তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

**আত্মহত্যা থেকে বেঁচে থাকার উপায়:**

আত্মহত্যা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। আত্মহত্যার পাপ থেকে তাওবা করারও কোন সুযোগ থাকে না বলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সে কারণেই আত্মহত্যার অপরাধ প্রবনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। যে সকল বিষয় মানুষকে আত্মহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করে সে বিষয়গুলি জানা থাকলে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলতে পারলে সমাজ থেকে আত্মহত্যার প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেতে পারে বলে আমাদের ধারণা। আত্মহত্যা করার মত কঠিন আবস্থার যাতে

সৃষ্টি না হয় সে ব্যপারে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। যে সকল আচার-আচরণে কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব হতে পারে বলে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, সে সকল কাজ পরিহার করে চলাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। আত্মহত্যার সম্ভাব্য কারণগুলি বিবেচনায় রেখে এ ধরণের অনভিপ্রেত ঘটনার সূত্রপাতের পূর্বেই প্রতিষেধক হিসেবে সকলের জন্য যা করণীয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হল:

১. **নিষ্ঠার সাথে পিতামাতার দায়িত্ব পালন করা:** পিতামাতা সন্তানের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে সন্তান কুলাঙ্গার হয়ে যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে। সন্তান-সন্ততির সাথে পিতামাতার নির্মম আচরণ অথবা অতিরিক্ত স্নেহ বাৎসল্য এ উভয়টিই সন্তানের আত্মহত্যার কারণ হতে পারে। আবার অবাধ্য কুলাঙ্গার সন্তানের ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে পিতামাতার অত্মহত্যার ঘটনাও ঘটতে পারে। এ অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে তাই শুরু থেকেই পিতামাতাকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পিতামাতার কাজ হবে সন্তানকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা এবং অযথা উত্তেজিত হয়ে তাদের সাথে নির্মম ব্যবহার না করা। অকারণে ধমক দেয়া বা অনর্থক তিরস্কার করা পরিহার করতে হবে। যখন তাদেরকে শাসন করার প্রয়োজন হয় তখন স্বাভাবিক শাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা চাই। চরমপন্থী মনোভাব নিয়ে শাসনের সীমালঙ্ঘন করে এমন নির্মমভাবে শাসন করা ঠিক নয় যেটা সন্তানের চরম মনকষ্টের কারণ হয়ে আত্মহত্যার মত অনাকাঙ্খিত কাজটি করতে উদ্বত হতে পারে। প্রত্যেক বাবামাকেই সন্তানের বাল্যকাল থেকেই তাকে সার্বক্ষণিক নজরদারীতে রাখা আবশ্যক। শুরু থেকেই তাদের ছোটখাট ভুল-ত্রুটিগুলি স্নেহের শাসন দ্বারা মিটিয়ে ফেলতে হবে। আদর দিয়ে তাদেরকে মাথায় তোলা যাবে না এবং তাদের প্রতি এমন উদাসীন হওয়া যাবে না যাতে তারা লাগামহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাহলে এক সময় তারা উশৃংখল হয়ে যাবে এবং আবেগের বশে এমন সব অপকর্ম করে বসবে যেটা সামাল দেওয়া পিতামাতার পক্ষে কঠিন হয়ে দাড়াবে। এ অবস্থায় হঠাৎ করে অতিরিক্ত শাসন যে কোন কুফলই বয়ে আনতে পারে। এ পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না হয় সে জন্য সন্তান লালন-পালনে তাদের শৈশব থেকেই পিতামাতাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলামী আকিদা বিশ্বাস সহ ধর্মীয় অনুশাসন ও ইসলামী সংস্কৃতির সাথে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যাতে সে গুণাহের কাজগুলি চিহ্নিত করে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালিত করতে পারে। তাহলেই সমাজ থেকে আত্মহত্যা সহ সকল বড় ধরনের অপরাধ প্রবনতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

২. **দাম্পত্য কলহ নিরসন:** স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মধুময়। তবে সংঘাতময় এ জীবনে মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হবে- এটা তো স্বাভাবিক। দোষগুণ নিয়েই তো মানুষ। কারো মধ্যে সব গুণের সমাহার বিরল। স্বামীর যেমন কিছু গুণ থাকে তেমনি

কিছু দোষও থাকে। স্ত্রীর ব্যাপারেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তাই উভয়কেই সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে হবে। নিজেদের মধ্যে সংলাপ-সহযোগীতা-সমঝোতা-সহমর্মিতা থাকতে হবে। উভয়কে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। উত্তেজিত হয়ে কারো পক্ষেই সীমালঙ্ঘনকারী কোন আচরণ করা ঠিক নয়। প্রত্যেককেই আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করে তা পরিত্যাগপূর্বক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অঙ্গীকার করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর কেউ উত্তেজিত হলে অন্যজনকে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। একে অপরের দোষ-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সর্বোপরি উভয়কেই তাদের সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৩. **অসুস্থতায় ধৈর্যধারণ:** মারাত্মক ও কষ্টকর অসুখে পড়লে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে রোগমুক্তির প্রার্থণা করতে হবে।

৪. পরীক্ষা এসে গেলে ছাত্রদের মাঝে মাঝে নফল নামাজের সিজদায় গিয়ে জ্ঞান বুদ্ধির জন্য দোয়া করতে হবে।

৫. ব্যবসায় ক্রমাগত ক্ষতি হলে ফরযের পাশাপাশি নফল নামাজ আদায় করা এবং সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে গরীবি ও হীনতা থেকে আশ্রয় চাইতে হবে।

৬. অবৈধ প্রণয় ও ভালবাসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হবে। ইসলামী আদব-কায়দা মেনে চলতে হবে।

৭. আত্মহত্যার কথা মনে আসলে এ বিপদ থেকে রক্ষাকল্পে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং সিজদায় গিয়ে বিনীতভাবে আল্লাহর দয়া ও সাহায্য কামনা করা প্রয়োজন।

মোটকথা যখনই নিজেকে অসহায় ও আশাহত মনে হয় এবং আত্মহত্যার চিন্তা মনে আসে তখনই মনে করতে হবে এখন শয়তান এসেছে। তাই শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে।

মহান আল্লাহ্ সকল নর-নারী ও সন্তান-সন্তুতিকে আত্মহত্যার মত মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকার মত সুবুদ্ধি ও চেতনা এবং তওফিক দান করুন।

## ঘুষের লেনদেন
## (Engaging in Bribery)

ঘুষ বা উৎকোচ একপ্রকারের অবৈধ লেনদেন। ঘুষ বলতে যা বোঝায় সে সম্পর্কে তফসীরে বাহারে মুহীতের ভাষায় বলা যায়ঃ যে কাজ কারো দায়িত্বে অর্পিত, তা করার জন্য অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার কর্তব্য তা করার জন্য বাড়তি কিছু গ্রহণ করাকে ঘুষ বলা হয়। আবার অনেকের মতে, প্রভাব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারো স্বপক্ষে রায় দেয়া বা তার প্রতিপক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেয়া কিংবা যা তার ন্যায্য অধিকারভুক্ত নয় তেমন কোন কাজ তাকে পাইয়ে দেয়া বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত কিংবা অসফল করে দেয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্যে যে অর্থনৈতিক লেনদেন করা হয় তাই ঘূষ। এক কথায় বলা যায়, অবৈধভাবে নিজ স্বার্থ লাভে প্রদত্ত গোপণ পারিতোষকই ঘুষ।

মূলত বাতিল উপায়ে ও অন্যায়ভাবে লোকদের ধনমাল ভক্ষণ করার একটি পন্থা হচ্ছে ঘুষ। ঘুষ-দুর্নীতি এক ধরনের ধোঁকাবাজী যা মানুষের হক বা অধিকার নষ্ট করে এবং প্রকৃত হকদার প্রতারিত ও উপেক্ষিত হয়। এ কারণেই ইসলামে ঘুষ হারাম এবং কবীরা গুণাহ হিসেবে বিবেচিত।

ঘুষ সব সময় টাকা-পয়সা হয়না। টাকা-পয়সা ছাড়াও ঘুষ হতে পারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা বস্তু ও বিষয়-সম্পত্তি। অনেক সময় ঘুষ আসে উপহার-উপঢৌকনের নামে নানা সামগ্রী। সুতরাং যেভাবেই হোক আর যে নামেই হোক তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।

ঘুষ হচ্ছে অর্থোপার্জনের একটি না-জায়েয বা অন্যায় পন্থা। ঘুষের উপার্জন কোনভাবেই হালাল নয়। তাই ঘুষ সম্পদের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে। যদিও ঘুষের লেনদেন সাধারনতঃ লোকচক্ষুর অগোচরে বা গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে তবুও অনেক ক্ষেত্রেই তা আর গোপন থাকে না। ঘুষের বিষয়টি সম্পর্কে সমাজের প্রায় সকলেই কম-বেশী অবহিত আছেন। তবে প্রচলিত সবরকম ঘুষের লেনদেনই হারাম- যদিও তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে। পবিত্র কোরআনে সরাসরি ঘুষের কথাটি কোন আয়াতে উল্লেখ না থাকলেও কিছু কিছু আয়াতের মর্মার্থে ঘুষও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে সকল তাফসীরবিদগণ একমত পোষণ করেছেন। যেমন, আল্লাহ বলেন,

**“তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত- ১৮৮

এ আয়াতে অন্যায়ভাবে বলতে তফসীরবিদগণ সকল প্রকার অবৈধ, ভ্রান্ত, বাতিল বা না-জায়েয পন্থাকে বুঝিয়েছেন এবং তাদের মতে ঘুষ একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য না-জায়েয পন্থার লেনদেন। ঘুষের লেনদেনকে তাই ওলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন,

**"তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিণিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না।"**

আল কোরআন, সুরা নাহল(১৬), আয়াত- ৯৫

এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা দুনিয়ার লোভকে বোঝানো হয়েছে এবং 'আল্লাহর অঙ্গীকার' বলতে প্রখ্যাত তফসীরবিদ ইবনে আতিয়্যারের মতেঃ যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা কারো জন্য ওয়াজিব, কারো কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এভাবে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ঘুষকেই প্রধান্য দেয়া হয়েছে এবং প্রচলিত সব রকম ঘুষকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ঘুষের লেনদেনের প্রতি শর'ই নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মানুষ ঘুষের পিছনে জীবন বরবাদ করে দিচ্ছে, কেউ হয়ত না জেনে ঘুষ নিচ্ছে আবার কেউ বা হয়ত অপরাধ জেনেও ঘুষের লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত থাকছে। কিন্তু, কেন মানুষ ঘুষ খায়? প্রশ্নটি খুব ছোট্ট হলেও এর উত্তর ততটা সহজ নয় বলেই আমাদের ধারনা। যদিও এটা মনে হতে পারে যে, মানুষ সহজ পন্থায় কিছু বাড়তি আয়ের সংস্থানের জন্য এ কাজটি করে থাকে, তবুও এর অন্তর্নিহিত কারণটাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কেননা এর মধ্যে থেকেই সমাজের একটি বাস্তব চিত্র উন্মোচিত হতে পারে। ঘুষ খাওয়ার পেছনে অনেক কারণই থাকতে পারে, কেউ ঘুষ খেতে বাধ্য হচ্ছে আবার কেউ বা শখের বশে ঘুষ খাচ্ছে। তবে সামাজিক বাস্তবতায় দেখা যায় যে, মানুষের শ্রেণীভেদের সাথে ঘুষ খাওয়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণতঃ নিম্মবিত্তের লোকেরা ঘুষ খায় পেটের দায়ে। সীমিত আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে তারা বাধ্য হয়ে ঘুষের মত নোংরা জিনিসের স্মরণাপন্ন হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঘুষ খায় স্ট্যাটাস বজায় রাখতে। সমাজের অন্য সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রতিযোগীতায় শামিল হতে গিয়ে ঠুনকো আভিজাত্য রক্ষা করার মানসে তারা এ পাপের পথটি বেছে নেয়। সবশেষে বলা যায়, উচ্চবিত্তের ঘুষ স্বপ্নবিলাস। স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে তারা আসমান ছুঁতে চায়। বিলাসবহুল জীবন যাপন সহ আভিজাত্যের চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তারা ঘুষের মত সহজ কিন্তু পাপ-পঙ্কিল পথকে বেছে নিতেও দ্বিধা করছে না। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঘুষ খাওয়ার পিছনের এ কারণগুলির জন্য ঘুষ বৈধতা পেতে পারে না। ঘুষের পেছনে কারণ যাই থাকুক না কেন, ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম।

**ঘুষের বাস্তবতা এবং সামগ্রিক অকল্যাণ:**

সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জীবন যাত্রার মানও বেড়েছে। সভ্যতার মেকী রং মেখে সভ্যতার মুখোশ পরে মানুষ নিজের আভিজাত্য জাহির করার কাজে ব্যস্ত থাকছে সারাক্ষণ। তবে তথাকথিত সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। উন্নত জীবন যাত্রায় নিজেকে শামিল করার জন্য যে সামর্থ্যের প্রয়োজন তার যোগান দিতে গিয়ে তাকে বেছে নিতে হয় নানাবিধ অবৈধ এবং পাপ-পঙ্কিল পন্থার আশ্রয়। ঘুষ হচ্ছে এমনই একটি পাপের রাস্তা যার মাধ্যমে অতি সহজে শ্রমহীন এবং ঝুঁকিবিহীনভাবে প্রচুর অর্থ সমাগম হতে পারে। তাই সমাজের কিছু সংখ্যক লোক ঘুষের মত সহজ আয়ের পন্থাটাই বেছে নিয়েছে অতিরিক্ত উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে। বস্ততঃ সমাজে এদের সংখ্যা দিন দিন আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধিও পাচ্ছে। কেননা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঘুষ একটি ব্যাধি হয়ে মহামারি রূপ ধারণ করেছে। ঘুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। অফিস আদালত এবং দৈনন্দিন জীবনে মানুষের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যে সকল কর্মের সাথে যে প্রকারের ঘুষের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়, তার কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হলঃ

- **অফিস-আদালত এবং চাকুরী ক্ষেত্র:** রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সর্বত্রই আজ ঘুষ-দুর্নীতির মহোৎসব চলছে। এটি একদিনের ব্যপার নয়। বহুকাল থেকে এটি পরিপুষ্ট হয়ে আজ মহামারী আকার ধারন করেছে। অধিকাংশ মানুষই তার কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়তি কিছু পাওয়ার আশা করে থাকে। তাই নিয়ম-নীতি আর আইনের তোয়াক্কা না করে নিজ স্বার্থে অবৈধ সম্পদ অর্জনে মানুষ যেন পাগলপ্রায়। ধর্মীয় চেতনা কিছু সংখক সৎ মানুষকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে বটে তবে অধিকাংশ লোকই দুর্বল ঈমানের কারণে অতি সহজেই কাবু হয়ে যায় এবং ঘুষের মত নোংরা জিনিসের কাছে হার মেনে নেয়। বিভিন্ন সরকারী অফিস-আদালতে ঘুষের প্রচলন তাই এখন একটি সাদামাটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘুষের মাত্রা বা পরিমান নির্ভর করে ঘুষ গ্রহীতার সামাজিক অবস্থান এবং কাজের গুরুত্বের উপর। চাকরীতে নিয়োগ, বদলী, পদায়ণ, প্রমোশন, পেনশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন ঘুষ-দুর্নীতির অবাধ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়, তেমনি সেবার বিনিময়ে চাকুরীর বেতন ছাড়াও জনগণের কাছ থেকে নেয়া হয় অতিরিক্ত অর্থ। উৎকোচের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং ফন্দি-ফিকির বের করে নেয়। ঘুষ ছাড়া অফিসের ফাইল নড়েনা। আজ এটা, কাল ওটা, এমনি আরো কত কি অজুহাত দিয়ে ফাইল বন্দী করে রাখা হয় অনির্দিষ্টকাল, তবে ঘুষের অর্থ পেলে ফাইল আবার সচল হয়ে ওঠে, এ অভিজ্ঞতা কম-বেশী সমাজের অনেকেরই রয়েছে বলে মনে হয়।
- **বানিজ্য ব্যবস্থা ও আমদানী রফতানী:** আমদানী রফতানীর ক্ষেত্রে দেখা যায় শুভঙ্করের ফাঁকি। সরকারী পর্যায়ের আমদানী-রফতানীতে নিযুক্ত একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী উৎকোচের বিনিময়ে নিম্ন মানের স্বল্পস্থায়ী, অকার্যকর এবং ত্রুটিযুক্ত মালামাল

ক্রয় করে নিচ্ছেন। ফলে সরকারী বরাদ্দের সিংহভাগই লোপাট হয়ে যাচ্ছে আর জনগণ হচ্ছে প্রতারিত।

-  **লাইসেন্স, পারমিট, টেণ্ডার:** এগুলির মাধ্যমে যোগ্য লোকদের বাদ দিয়ে অযোগ্য লোকদের প্রশ্রয় দেওয়ার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে প্রচুর অংকের ঘুষের অর্থ।
-  **শিক্ষাক্ষেত্র:** শিক্ষায়তনের মত পবিত্র স্থানও আজ ঘুষের অপবিত্রতা দ্বারা কলুষিত করা হচ্ছে। ভর্তি-বানিজ্যের দুর্নীতির বিষয়ে হয়ত অনেক অভিবাবকের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আবার ঘুষের বিনিময়ে পরীক্ষা পাশ, ভুঁয়া সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদির মত ঘটনাও অনেকের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকবে।
-  **আদালত এবং বিচার ব্যবস্থা:** মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে বিচারালয়। দেশের বিচার ব্যবস্থা কলুষিত হোক, এটা কারো কাম্য হতে পারে না। তবে সেখানেও যদি অর্থের বিনিময় চলে আর তার জন্য অপরাধী মুক্ত হয়ে যায় এবং নিরপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়, তবে সেটা হবে চরম দুঃখজনক ঘটনা। বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সরকার থেকে বেতন-ভাতাদি পেয়ে থাকেন। কিন্তু বিচার কার্যকে প্রভাবিত করার জন্য যদি তারা কুট-কৌশল অবলম্বন করে পার্টির কাছে থেকে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে ঘুষ বলেই বিবেচিত হবে।
-  **আইন-শৃংঙ্খলা ব্যবস্থা:** এ সংস্থা দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংঙ্খলার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার অতন্দ্র প্রহরী। আইনের লোক হয়ে বে-আইনী কাজ করা কারো জন্য সমীচীন নয় বা সেটা কারো কাম্যও নয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা যখন অর্থের কাছে বিক্রী হয়ে যায়, তখন এর চেয়ে দুখঃজনক বিষয় আর কি হতে পারে! অর্থের বিণিময়ে নানা টাল-বাহানা করে যখন অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া হয় বা ধরা না হয় এবং অপরাধী যখন প্রবল প্রতাপে সমাজে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায় আর অপরাধ চালিয়ে যায়, তবে সেটা কোন অদৃশ্যের খেলা? নিশ্চয়ই ঘুষের প্রভাব।
-  **সরকারী বরাদ্দ:** কাজ না করে বা নিম্নমানের কাজ করে সরকারী বরাদ্দের বিপুল অংকের অর্থ ভাগাভাগি করা বা লুট করাও  ঘুষ-দূর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।
-  **সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:** সড়ক ও জনপদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যে বিপুল পরিমান অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সার্বিক তদারকি করা এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাজ। নিম্ন মানের কাজ করে বা কোন প্রকার অনিয়ম করে ভাগাভাগী করে অর্থ লোপাট করা হলে, তা ঘুষের অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে।
-  **নির্বাচন:** নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা একটি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ভোট হচ্ছে জনগনের কাছে একটি আমানত। এর সদ্ব্যবহার করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও

কর্তব্য। কিন্তু যদি ভোট প্রদাণের জন্য অর্থ বা কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেটাও ঘুষের মধ্যে শামিল হবে।

- **রাজনীতি:** রাজনীতিতে ঘুষের প্রচলন থাকার কথা নয়। তবে একশ্রেণীর অসাধু রাজনীতিবিদ অনেক সময় এ অপরাধটি করে থাকেন বিভিন্নভাবে। তারা রাজনীতির ছত্র-ছায়ায় চাঁদাবাজি সহ বিভিন্ন অফিসের টেণ্ডার, কোটেশন ইত্যাদিতে বা কোন তদবীরের বিনিময়ে মোটা অংকের অর্থ গ্রহণ করে থাকেন, যেটা ঘুষ বৈ কিছু নয়।

ঘুষের ক্ষেত্র এবং তা গ্রহণের প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন, ঘুষের বাস্তবতা অত্যন্ত করুণ। ঘুষের করাল গ্রাসে সমাজ আজ ক্ষতবিক্ষত। ঘুষ আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। ঘুষ হচ্ছে সমাজদেহে নীরব মরণ ব্যাধি। এ হচ্ছে এক মরণ ভাইরাস যা আমাদের সকল ব্যবস্থাপনাকে নাজেহাল করে দিচ্ছে। সকল নীতি-নৈতিকতা, সমস্ত আইন-কানুন, বিধি-বিধানকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার জন্য ঘুষ নামক এই ভাইরাসই দায়ী। ঘুষের কারণে মানুষ তার হক বা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যোগ্যতার মূল্যায়ণ না করে অযোগ্য লোকের নিয়োগ হচ্ছে। এর পরিণতি অনেকসময় ভয়াবহ রূপ ধারণ করতেও দেখা যায়। ঘুষের কারণে সমাজে দুঃখ-দুর্দশা এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপঃ শিক্ষিত দরিদ্র যুবক ঘুষের সংস্থান করতে না পারায় চাকরীবিহিন বল্গাহীন জীবন-যাপন করছে। এক সময় বেকার যুবক সংসারের হাল ধরতে না পারা এবং পরিবারের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো আহার তুলে দিতে না পারার বেদনায় বিষন্নতায় ভুগে ভুগে হয় আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে অথবা অপরাধের জগতে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। আবার অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবি ঘুষ দিতে অপারগ বিধায় পেনশনের টাকা তুলতে পারছে না। বছরের পর বছর অতিবাহিত হলেও শত অনুরোধ সত্বেও সে টাকা তার হস্তগত হয়না। বিনা চিকিৎসায় রোগ-শোকে ধুঁকে ধুঁকে এক সময় পৃথিবীকে শেষ বিদায় জানাতে হয় অধিকার বঞ্চিত অবস্থায়। কেউ কি দেখেছে সে পরিবারের বিধবা বৃদ্ধার করুণ দীর্ঘশ্বাস আর না পাওয়ার বেদনার তীব্র দহন অথবা ইয়াতিম সন্তানদের কঙ্কালসার জীবনের আহাজারি আর দীর্ঘশ্বাস! তবে এ ঘটনা একটি পরিবারের নয়, এটাই আমাদের সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। ঘুষের প্রভাবে মানুষ অনেকসময় ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। ঘুষের কারণে অপরাধী ছাড়া পেয়ে যেতে পারে, আবার নিরাপরাধীও সাজা পেয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় তাকে অন্যের সাজা নিজের কাঁধে বয়ে বেড়াতে হয় দিনের পর দিন। এভাবে তার জীবন-যৌবনের মূল্যবান সময়টি অতিবাহিত হতে পারে কারা অভ্যন্তরের অবর্ননীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগের মধ্যে দিয়ে। এ নিষ্ঠুর বাস্তবতার উদাহরণ সমাজে বিরল নহে। আবার এ বাস্তবতার উল্টোপিঠে রয়েছে ভিন্ন চিত্র। অপরাধী ছাড়া পেয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়ায় আর খোলাখুলিভাবেই নানা অপরাধ করে বেড়ায় সমাজের অভ্যন্তরে। তারা থেকে যায় সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এসব ক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের অদৃশ্য হাত থাকে না একথা হলফ করে বলা যায়না। এভাবে ঘুষের সহায়তায় সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে বিপুলভাবে।

ঘুষের কারণে সমাজের সার্বিক উন্নয়ণ ব্যাহত হতে পারে। দেশীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের টেণ্ডার, ইনডেন্ট, আমদানী-রফতানী ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় যখন উৎকোচের বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকে তখন তো কাজের গুণগত মান নিম্নস্তরে নামতে বাধ্য, ফলাফল- সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ। বিদ্যুত, গ্যাস আর জ্বালানী ক্ষেত্রেও একই কথা প্রাযোজ্য। সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ যদি প্রজেক্ট শুরুর আগেই লোপাট হয়ে যায়, সেখানে কাজের মান কি হতে পারে, সেটা অতি সহজেই অনুমেয়। এর ফলাফলও যা হবার তাই- অব্যাহত লোড শেডিং, কলকারখানা অচল ইত্যাদি। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দৃশ্যমান। দেশের উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেখানেও যদি ঘুষের প্রভাব পড়ে, তাহলে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ইত্যাদির উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রেও যদি বরাদ্দের সিংহভাগ অর্থই কর্মকর্তাদের পকেটে ঢুকে যায়, তাহলে কোন মতে জোড়া-তালি দিয়েইতো কাজ শেষ করতে হয়। এখানেও ফলাফল শূণ্যের কাছাকাছি। রাস্তার মেরামত কাজ শেষ না হতেই তা ভাঙ্গনের কবলে পড়ে যায়। সাধারণ জনগণের ভাল রাস্তায় চলাচলের সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায় অতিদ্রুত। তবে জনদুর্ভোগের বিষয়টি মনে হয় কারো মাথা ব্যাথার সৃষ্টি করে না, বরং নিজের উদর পূর্তির ভাবনায়-ই সবাই ব্যস্ত থাকে।

ঘুষের কারণে যেভাবে সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, সেটা বোধ করি কারো দৃষ্টি এড়ায় না। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহ সার্বিক উন্নতির প্রতিবন্ধক এই ঘুষ নামক অপকর্মটি। দেশের রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজের বেহাল অবস্থা, জন-নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিদ্যুত-পানি ও গ্যাসের করুণ অবস্থা, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি ইত্যাদি সব কিছুর পেছনেই কোন না কোনভাবে ঘুষের সম্পর্ক রয়েছে।

**ঘুষখোর এবং ঘুষদাতা উভয়ে সমঅপরাধী:**

এখানে আমাদের আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঘুষ গ্রহীতা যেমন ঘুষ নেওয়ার অপরাধে অপরাধী তেমনি ঘুষ দাতাও ঘুষ দানের অপরাধে দোষী অর্থাৎ ঘুষদাতা এবং ঘুষখোর উভয়ে সমঅপরাধী। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

**“রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতার উপর লানত করেছেন।”**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং-৩৫৪৩

যেহেতু ঘুষগ্রহীতা অবৈধভাবে ঘুষ নিয়ে থাকে, সেজন্য অবৈধ কাজ এবং যুলুম করার জন্য সে অপরাধী। ঘুষদাতাও যখন একটি না-জায়েয কার্য সিদ্ধ করার জন্য ঘুষ দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ঘুষ দেওয়া অপরাধ হবে। তাই কোন যুলুম করার বা অন্যের অধিকার হরণ করার

মানসে ঘুষ প্রদান করাও কবীরা গুনাহ। কিন্তু, ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম এবং কবীরা গুনাহ।

ঘুষকে বৈধতা দেওয়ার মত কোন দলীল আমাদের জানা নেই। তবে ঘুষ দাতার প্রতি শরিয়ত কিছুটা শিথিলতা এনেছে। যদি কেউ ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত হওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোন জালিমকে ঘুষ দিতে বাধ্য হন, তবে তিনি অপরাধ মুক্ত থাকবেন কিন্তু ঘুষ গ্রহীতা এক্ষেত্রেও অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে বলে শরিয়তের সিদ্ধান্ত রয়েছে।

ঘুষের লেনদেনের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ পৃথিবীতে অন্যায় করে ঘুষের বিনিময়ে পার পাওয়া গেলেও আখেরাতে পার পাওয়ার কোন রাস্তা পাওয়া যাবে না। কেননা রোজ-কিয়ামতে প্রত্যেককেই ঘুষ সহ তার সকল কৃতকর্মের জবাবদিহিতা করতে হবে এবং সেখানে বিচারক থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা। সেখানে কোন অর্থ-কড়ির বিনিময় বা ঘুষের কারবার থাকবে না। বান্দাকে তার নেক আমলের বিনিময়ে মুক্তি পেতে হবে অথবা কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে।

# গীবত
## (Backbiting)

কবীরা গুণাহসমূহের মধ্যে সমাজে বহুল প্রচলিত কবীরা গুণাহ্ হচ্ছে গীবত। সমাজের অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন ভাবে এ গুণাহের সাথে জড়িত হচ্ছেন। তবে গীবত সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারনা না থাকাটাই এর প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত। তাই গীবত সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদি জেনা নেয়ার প্রতি প্রত্যেকেরই সচেষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়।

**গীবত কি?**

শাব্দিক অর্থে গীবত হচ্ছে পরনিন্দা বা পরচর্চা। তবে সব পরনিন্দাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই গীবতের সংজ্ঞা নিরূপণ করা অতি আবশ্যক। শরিয়াতের পরিভাষায় গীবত হচ্ছে এই, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন সব দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়। এ বিষয়ের উপরে একটি হাদিস উপস্থাপনের মাধ্যমে গীবতের সুস্পষ্ট এবং সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হয়,

> **“হে আল্লাহর রাসূল** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**! গীবত কি?”**

উত্তরে তিনি বলেন,

> **“তোমার ভাই সম্পর্কে তার অসাক্ষাতে তোমার এমন আলোচনা, যা সে অপছন্দ করে।”**

আবার প্রশ্ন করা হয়,

> **“আমি যা বলি তা যদি বাস্তবিকই তার মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে আপনার কি মত?”**

জবাবে তিনি বলেন,

> **“তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে। তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।”**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-১৮৮৪; আবু দাউদ শরীফ, নং-৪০০০

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরোক্ত বাণীর আলোকে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ গীবতের শরিয়াতসম্মত যে সংজ্ঞা প্রদান করেন তা হচ্ছেঃ

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, **“গীবতের সংজ্ঞা এটাই যে, তুমি তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করলে যে, তা যদি তার কানে পৌঁছে তবে সে তা অপছন্দ করবে।”**

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন, **"গীবত এটাই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে চিন্তাগ্রস্ত হবে- তা সত্য হলেও। অন্যথায় সে কথা মিথ্যা হলে তা হলো অপবাদ।"**

ইমাম নববী (রহঃ)- এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, **"নিস্প্রোয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে গীবত।"**

উল্লেখিত ইসলামী বিশেষজ্ঞ পন্ডিতগণ হাদিসের আলোকেই নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন এবং প্রত্যেকের বক্তব্যে ভাষাগত ব্যবধান থাকলেও মূল বক্তব্যে কোন ব্যতিক্রম নেই এবং শরিয়ত প্রনেতা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসের সাথে তা সাংঘর্ষিকও নয়।

**গীবত সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান একটি ভুল ধারনা এবং তার অবসান:**

গীবত সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে স্পষ্ট বক্তব্য থাকলেও অনেকের কাছেই এ বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার নয় এবং তাদের মধ্যে কিছু ভুল ধারনা বিদ্যমান আছে বলে প্রতীয়মান হয়। তারা মনে করে যে, কারো মধ্যে যে দোষ নেই তা তার প্রতি আরোপ করাকে গীবত বলে এবং কারো সত্যিকারের দোষ বর্ণনা করলে তা গীবত হবে না। আবার কিছুলোক মনে করে যে, যে দোষ অন্যের জানা নেই সে বিষয়ের দোষ বর্ণনা করাই গীবত। কিন্তু কারো এমন দোষ বর্ণনা করা গীবত হবেনা, যা সকলে জানে। এদেরকে যদি বলা হয়, তুমি কেন গীবত করছ? তারা বলে এটাতো গীবত নয়, কারণ যে দোষ আমরা বর্ণনা করছি তা তো গোপন নয়, সকলেরই জানা। বস্তুতঃ উপরোক্ত দু'টি ধারনাই ভ্রান্ত। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে দোষ কারো মধ্যে বিদ্যমান আছে, তা সকলের জানা থাকলেও তার অনুপস্থিতিতে তা আলোচনা করা বা বর্ণনা করা হলেই তার গীবত করা হবে। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসটির মধ্যেই রয়েছে গীবতের সঠিক এবং যথার্থ সংজ্ঞা। এর কোন ব্যতিক্রম করা অথবা কারো মনগড়া বা অনুমানভিত্তিক সংজ্ঞা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; উপরন্তু সেটা শরিয়াতের বরখেলাপ এবং অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

**গীবতের প্রকারভেদ:**

গীবতকে অনেকভাবেই ভাগ করা যায়। প্রকাশ মাধ্যমের ভিত্তিতে গীবত কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমন: মুখ ও জিহবার গীবত, কানের গীবত, অঙ্গ-প্রতঙ্গের গীবত, লেখনীর মাধ্যমে গীবত এবং অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত।

১. **মুখ ও জিহবার গীবত:**

   মানুষের মনের ভাব বা মনের কথা প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম মুখ ও জিহবা। মুখের কথার মাধ্যমেই তাই গীবত করার প্রবণতাও সর্বাধিক। মুখের ভাষাতেই সচারাচর মানুষ একে অন্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে থাকে।

২. **কানের গীবত:**

গীবত শুনে আনন্দিত হওয়াও গীবতের মধ্যে গণ্য। কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাঁধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ প্রতিবাদ না করে চুপচাপ গীবত শ্রবণ করা প্রকারান্তে গীবতকারীকে সহযোগীতা করার শামিল এবং এটাও নিজে গীবত করার মতই সমপর্যায়ের অপরাধ।

৩. **অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত:**

নিজের হাত, পা, চোখ ইত্যাদির ইশারায় অন্য লোকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটির বর্ণনা করা হলো অঙ্গ-প্রতঙ্গের গীবত। উদাহরণস্বরূপঃ কাউকে খাঁটো করার উদ্দেশ্যে হাতের ইশারায় তার দৈহিক কাঠামোর দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে লোকটি বেঁটে, ল্যাংড়া, স্থূল, হেংলা বা রোগা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা অথবা চোখের ইশারায় কার কোন দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এধরনের গীবতের অন্তর্ভুক্ত। আবার সরাসরি নাম উল্লেখ না করে এমন কিছু ইঙ্গিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা হলে লোকেরা যদি বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তাহলে এটাও গীবত হবে।

৪. **লিখনীর মাধ্যমে গীবত:**

কোন ব্যক্তিকে অযথা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠি লেখা বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদিও এক প্রকার গীবত।

৫. **অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত:**

কারো সমালোচনার উদ্দেশ্যে তার চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করে দেখানও এক প্রকারের গীবত।

**গীবতের অবৈধতা:**

গীবত একটি মারাত্নক বদ-অভ্যাস এবং পাপাচার। গীবত হারাম এবং অবৈধ। এর অবৈধতার উপর মুসলিম উম্মার ইজমা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে এবং কঠোর ভাষায় গীবতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

**“তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই কর।”**

আল-কোরআন, সুরা হুজুরাত(৪৯), আয়াত-১২

উল্লেখিত আয়াতটির মাধ্যমে গীবতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং গীবতের নিষেধাজ্ঞাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের জন্য একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমতূল্য বলা হয়েছে। বস্তুতঃ কোন মানুষের পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, সে মানুষের গোশত ভক্ষণ করে।

www.waytojannah.com

অধিকন্তু মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণ করা যে কতটা ঘৃণার ব্যপার তা বলাই বাহুল্য। গীবতের মাধ্যমে একজন মুসলমানের বেইজ্জত ও অপমান করা হয়, তাই গীবতকে তার মাংস খাওয়ার সমতূল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের কথা বলার মধ্যেও একটা বিশেষত্ব রয়েছে। কারণ কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে তার বদনাম করা বা বেইজ্জত করা হলে সেটা জীবিত মানুষের মাংস টেনে টেনে ছিঁড়ে খাওয়ার শামিল। এক্ষেত্রে জীবিত মানষের পক্ষে এর প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু একজন মৃত মানুষের যেমন প্রতিবাদের ক্ষমতা থাকেনা তেমনি কোন মানুষের অনুপস্থিতিতে তার পশ্চাতে বদনাম করা বা কষ্টদায়ক কথা-বার্তা বলা হলেও সেটার প্রতিবাদ করা যায়না। তাই গীবতকে মৃত মুসলমান ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমতূল্য বলা হয়েছে। সুতরাং কোন মানুষের পক্ষেই এটা শোভণীয় নয় যে, সে গীবত করে। মৃত ভাইয়ের গোশ্ত ভক্ষণ করার ঘৃণা থেকেও গীবত করাকে অধিকতর ঘৃণা করা উচিত এবং সর্বাবস্থায় গীবত পরিহার করে চলা উচিত।

**বৈধ প্রকারের গীবত:**

সকল গীবতই অবৈধ বা হারাম নয়। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে গীবত জায়েয এবং তা কোন কোন ক্ষেত্রে পূণ্যের কাজও বটে! যেমন কোন প্রয়োজন ও উপযোগীতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল হয় না, তবে প্রয়োজন ও উপযোগীতাটি শরিয়াত সম্মত হতে হবে (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১১)। এক্ষেত্রে অভিন্ন বিষয় এই যে, কারও দোষ-ত্রুটি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে তাকে হেয় করা এবং নিছক মজা করা না হওয়া চাই; বরং প্রয়োজনের তাগিদেই হওয়া চাই। এসব বিচারে শরিয়াত বিশেষজ্ঞগণ গীবতের কয়েকটি বৈধ পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলির অধিকাংশই নবী ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে এজমার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। শরীয়তে বর্ণিত যে প্রকারের গীবত বৈধ হতে পারে তা একটি মূলনীতির আওতায় আনা যায়। মজলুমের ফরিয়াদ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সাক্ষ্য প্রদান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং সর্বোপরি ইসলাম বিরোধী কার্য-কলাপ দূরীকরণের ক্ষেত্রে কারো সম্পর্কে তার কু-কর্ম বা দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা বা আলোচনা করার বৈধতা রয়েছে। এর বাইরে সর্বক্ষেত্রে গীবত হারাম এবং কবীরা গুণাহ। ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম মণীষিদের বক্তব্য অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে গীবতের বৈধতা রয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল:

**এক. অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিপক্ষে আবেদন উপস্থাপন করা:**

কারো অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদের বা প্রতিবিধানের জন্য বিচারকের কাছে বা লোকের কাছে সে জুলুমের কাহিনী বর্ণনা করার বৈধতা রয়েছে এবং সেটা গীবতের আওতাভুক্ত হবেনা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে**

www.waytojannah.com

**থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৪৮

এ আয়াতে কারীমার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায় তবে তা অবৈধ গীবতের আওতায় পড়বে না।

**দুই. ইসলাম বিরোধী কার্য-কলাপ প্রতিরোধ করা:**

একজন ব্যক্তি কোন পাপাচারে লিপ্ত থাকলে এবং ইসলাম বিরোধী কার্য-কলাপে জড়িত থাকলে সে সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে অবহিত করা গীবত হবে না, যে তাকে বারণ করতে পারবে, উপদেশ দিতে পারেবে বা তার উপর প্রভাব খাটিয়ে তাকে সংশোধন করতে পারবে। কারণ এ ধরনের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপকার সাধিত হয়। সুতরাং মানুষকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অথবা কোন পাপাচারী সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার কার্য-কলাপ মানুষকে অবহিত করা, এ উভয় ক্ষেত্রেই গীবত শুধু বৈধই নয় বরং পাপাচারীর সংসর্গ থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ঈমানী দায়িত্বও বটে! উদাহরণস্বরূপ কোন বিদ'আতী ব্যক্তির বিদআতী কার্য-কলাপের গীবত করার বৈধতা আছে। কেননা সমাজকে বিদ'আত মুক্ত করার প্রচেষ্টায় সকলেরই ব্রত থাকা উচিত। একজন বিদ'আতি ব্যক্তি নিজে যেমন বিদআত করে থাকে, তেমনি অন্যদেরকেও বিদ'আত শিখায়। সুতরাং সমাজকে বিদ'আত দূষণ থেকে মুক্ত করতে সে ব্যক্তির গীবত করা জায়েয।

**তিন. কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া বা মাসআলা জানতে চাওয়া:**

কোন আলেম বা মুফতির নিকট মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে তার প্লট তৈরী করার জন্য কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক তার কৃতকর্মের ঘটনা বর্ণনা করাতে কোন দোষ নেই। তবে এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সরাসরি নাম উল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে ঘটনার বর্ণনা দানের মাধ্যমে এর উপর শরিয়তের বিধান জানতে চাওয়াটা যদিও উত্তম পন্থা তবুও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করাতেও দোষের কিছু নেই, সে প্রকারের গীবতও বৈধ। এর পক্ষে একটি হাদিস রয়েছে। হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা (রাঃ) নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলেন,

**"আবু সুফিয়ান অধিক কৃপণ ব্যক্তি। সে আমার ও ছেলে-মেয়েদের সংসার খরচ প্রয়োজন মত দেয় না। তবে আমি তার অজান্তে তা নিয়ে প্রয়োজন পুরা করি।"**

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

**"স্বাভাবিকভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই নিতে পার।"**

হাদিস, রিয়াদুস সলেহীন, নং-১৫৩৬

www.waytojannah.com

**চার. উপদেশ বা পরামর্শ দান:**

কারো মঙ্গল কামনার্থে উপদেশ দান বা পরামর্শ দান করতে গিয়ে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যেতে পারে। এভাবে কোন ব্যাপারে কারও সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে চাওয়া হলে বা পরামর্শ চাওয়া হলে, পরামর্শদাতার কর্তব্য হল প্রকৃত তথ্য প্রদান করা। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গীবত করারও বৈধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে, কারো সাথে অংশীদারীত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে, আমানত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে, কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ক্ষেত্রে অন্য পক্ষ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বা পরামর্শ চাওয়া হলে পরামর্শদাতার তথ্য গোপন না করে বরং নসিহতের নিয়তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মন্দ দিকসমূহ উল্লেখ করা উচিত। এ সকল ক্ষেত্রে পরনিন্দা করা হলেও সেটা বৈধ প্রকারের গীবত। এর স্বপক্ষে একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) হতে বর্নিত। তিনি বলেছেন,

আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে গিয়ে বললাম,

**“আবু জাহাম ও মুয়াবিয়া আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেছে।”**

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

**“মুয়াবিয়াতো গরীব ব্যক্তি, তার কোন সম্পদ নেই। আর আবু জাহাম, সে তো মেয়েলোক পিটাতে ওস্তাদ।”**

হাদিস, রিয়াদুস সলেহীন, নং-১৫৩৪

**পাঁচ. হাদিস বর্ণনা এবং সাক্ষ্যদান:**

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন হাদিস বর্ণনাকারীর মধ্যে যে সব গুণাবলী থাকা দরকার, তা যদি তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে অথবা তার মধ্যে যদি কোন অসৎ গুণ বা দোষ-ত্রুটি থাকে তাহলে যাচাই বাছাই করে তা বলে দেওয়া প্রয়োজন। শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা শুধু জায়েযই নয় বরং ওয়াজিবও বটে! তাই মুহাদ্দিসগণ হাদিসের রাবীদের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কোন কোন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, সে ডাহা মিথ্যাবাদী, তার স্মরণশক্তি দুর্বল, সে মনগড়া হাদিস বর্ণনা করে, সে মুনকার রাবী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও একজন সাক্ষ্যদাতার বদগুণ বা দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া বৈধ প্রকারের গীবত।

**ছয়. প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদ'আতী কাজ করা:**

কোন ব্যক্তি যখন নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে বেড়ায়, যেমন প্রকাশ্যে শরাব পান করা, মানুষের উপর অত্যাচার করা, কারো ধন-সম্পদ জোড়পূর্বক হরণ করা, জনসাধারণের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে চাঁদা আদায় করা, ইত্যাদি অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তখন এ ধরনের লোকের গীবত করা বৈধ। তবে তার কৃত কু-কর্ম ছাড়া অন্য

কিছু বর্ণনা করা বৈধ নয়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি গোপণে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অপরের কোন ক্ষতি না হলে, তার গীবত করা বৈধ নয়।

**সাত. সংশোধনের লক্ষ্যে:**

ধর্মীয় নেতার নিকট কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা যে, তিনি তাকে উপদেশ দান করবেন, ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে, গীবতের এ প্রকারের পন্থাও বৈধ। তবে মনে রাখতে হবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপমান বা অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে গীবত করা যাবে না।

**আট. পরিচয় দেওয়া:**

কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হলে এবং এর মধ্যে তার কোন দোষের প্রতি ইংগিত থাকলেও তাকে সেভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়াতে কোন দোষ নেই। যেমন, রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা, কালা ইত্যাদি বিশেষণের মাধ্যমে কারো পরিচয় দেয়া বৈধ। কারণ ঐ উপাধিতে তার পরিচয় না দিলে লোকেদের তাকে চিনতে কষ্ট হবে। তবে কাউকে হেয় করা বা অবজ্ঞা এবং অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এভাবে ডাকা বা কারো পরিচয় দেওয়া হারাম।

**নয়. অনির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত:**

কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে তার গীবত করা বৈধ। তবে কেউ নাম উল্লেখ না করে এমন ভাষায় বা ভঙ্গিমায় তার গীবত করল যাতে শ্রোতারা বুঝে ফেললো যে, সে কার সম্পর্কে গীবত করছে, এ অবস্থায় বর্ণনাকারী গীবতের মধ্যে শামিল রয়েছেন বলে বিবেচিত হবে, কারণ বাহ্যত সে গীবত পরিহার করলেও মূলত গীবতেই লিপ্ত রয়েছেন।

**গীবতের পরিণতি:**

গীবত একটি অতি মন্দ আচরণ এবং কবীরা গুনাহ্। তাই এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ হতে পারে সেটা অতি সহজেই অনুমেয়। গীবতের মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তওবা করা হলেও যার গীবত করা হয় তার কাছ থেকে মাফ নেওয়া জরুরী, অন্যথায় তওবা কবুল হয় না। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) এর রেওয়াতে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

> **"গীবত ব্যাভিচারের চাইতেও মারাত্মক গুনাহ্।"**

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন,

> **"এটা কিরূপে?"**

তিনি বললেন,

> **"এক ব্যক্তি ব্যাভিচার করার পর তাওবা করলে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে তার গুনাহ্ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হবে না।"**

তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১০

www.waytojannah.com

গীবত মানবদেহে ক্ষত সৃষ্টিকারী রোগের চেয়েও মারাত্মক। কেননা গীবত একজন গীবতকারীর দ্বীনকে বরবাদ করে দিতে পারে। গীবতকারীর শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

**"দুর্ভোগ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। আপনি জানেন, হুতামা কি? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে।"**

আল-কোরআন, সুরা হুমাযা(১০৪), আয়াত-১,৪-৭

উল্লেখিত আয়াতে পশ্চাতে নিন্দাকারী অর্থাৎ গীবতকারীর জন্য প্রজ্বলিত জাহান্নামের অগ্নির শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে এ জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে বেঁধে রাখা হবে এবং তারা হৃদয় পর্যন্ত দহনের তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করবে।

এছাড়াও গীবতকারীর জন্য পরকালে বিভিন্ন শাস্তির কথা জানা যায় হাদিসের মাধ্যমে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"মিরাজের রাত্রে আমি এমন একদল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলি ছিল তামার। তারা নিজেদের নখ দ্বারা নিজের মুখাবয়ব ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?" উত্তরে তিনি বলেন,"এরা ওরাই যারা লোকদের গোশত খেত (গীবত করত)।"**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং-৪৮০৩

অযথা গীবত নয়, বরং মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখাই সকলের কর্তব্য হওয়া উচিত। মানুষের কল্যাণ কামনার মধ্যেই নিজের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"কেহ কাহারো দোষ-ত্রুটি দুনিয়ায় গোপন রাখলে আল্লাহ্ রোজ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।"**

হাদিস, মুসলীম শরীফ, নং-৬৩৬১

# চোগলখোরী
(Melicious Gossip)

চোগলখোরী একটি মারাত্মক বদ-অভ্যাস, একটি পাপাচার। তাই সর্বপ্রথমে আমাদের জেনে নেয়া উচিত যে, চোগলখোরী কি? **ঝগড়া-বিবাদ লাগানো বা মনোমালিন্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের নিকট লাগানোকে ইসলামী পরিভাষায় চোগলখোরী বলে।** সকল ইসলামী চিন্তাবিদ এ বিষয়ে একমত যে, চোগলখোরী সম্পূর্ন হারাম এবং কবীরা গুণাহ।

চোগলখোরী গীবতেরই একটি শ্রেণী। এখানে ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা নিয়তটাই মূখ্য। যখন কোন ব্যক্তি অন্যের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে বা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গীবত করে অর্থাৎ একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়ায় সেটাই চোগলখোরী। অধিকাংশ সময়ই সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বা অতিরঞ্জিত করে একের গোপণ কথা অপরের কাছে উপস্থাপন করার মাধ্যমে চোগলখোরী করা হয়। আবার কখনও বা অত্যন্ত সুকৌশলে মিথ্যা অপবাদ আরোপের মাধ্যমে একের সাথে অন্যের শত্রুতা সৃষ্টি করার প্রায়াস চালানো হয়।

চোগলখোরের কার্যক্রম শয়তানী কার্যক্রম অপেক্ষাও অধিক ক্ষতিকর। কেননা শয়তানী কার্যক্রম সংঘটিত হয় অত্যন্ত গোপনে ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে, আর চোগলখোরের কার্যক্রম চলে সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে একের সাথে অপরের নামে কুট কথা প্রচার করে শত্রুতা সৃষ্টির মাধ্যমে।

চোগলখোর লোক সাধারনতঃ দ্বিমুখী স্বভাবের হয়ে থাকে। সে তার আচরণে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে একজনার কাছে একরূপ আর অপরজনার কাছে অন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ একজনার সাথে একরূপ এবং অন্য জনার সাথে অন্যরূপ কথা বলে। এভাবে এর কাছে ওর কথা এবং ওর কাছে এর কথা লাগিয়ে শত্রুতা বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করে থাকে। একটি প্রচীন ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার করা যায়:

একবার এক ব্যক্তি বাজারে একজনকে তার নিজের দাস বিক্রী করতে দেখল। বিক্রেতা বলছে, **"এ গোলামের একটু চোগলখোরীর অভ্যাস ব্যতীত আর কোন ত্রুটি নেই।"**

লোকটি এ দোষটাকে গুরুত্ব না দিয়ে গোলামকে কিনে নিল। কিছুদিন আতিবাহিত হবার পর একদিন দাস তার মনিবের স্ত্রীকে বলল,

**"আমার মনিব আর একটি বিয়ে করতে চাইছেন, কেননা তিনি আর আপনার উপর তেমন অনুরক্ত নেই। আপনি যদি এ বিয়ে ঠেকাতে চান এবং আপনার স্বামী আগের মতই আপনাকে**

**ভালবাসুক এটা চান, তাহলে উনি যখন নিদ্রা যাবেন, তখন একটা ছুরি দিয়ে তার কণ্ঠনালীর ওপরের একটি পশম কেটে নিয়ে নিজের কাছে রাখবেন।"**

অন্যদিকে মনিবকে সে বলল,

**"আপনার স্ত্রী তলে তলে অন্য একজনের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাকে তিনি ভালবাসেন এবং তার সাথে চক্রান্ত করে আজ আপনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করবেন। আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে আপনি না ঘুমিয়ে কেবল ভান করে শুয়ে থেকে দেখবেন, আপনার স্ত্রী কিভাবে আপনার গলায় ছুরি চালায়।"**

গোলামের কথামত মনিব ঠিক তাই করল। রাতে যেই তার স্ত্রী ছুরি দিয়ে তার গলার পশম কাটতে উদ্যত হল, অমনি মনিব উঠে তার হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিয়ে স্ত্রীকে সাথে সাথে হত্যা করল। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্ত্রীর আত্মীয়রা এসে মনিবকে হত্যা করল। এরপর তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল এবং এতে উভয়পক্ষ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। চোগলখোরীর কারনে যে কতবড় সর্বনাশ হতে পারে এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা অতি সহজেই অনুমেয়।

**চোগলখোরী ও সামাজিক বাস্তবতা:**

আমাদের সমাজেও এ জাতীয় চোগলখোরীর নজির বিদ্যমান রয়েছে। কিছু লোক আছে যারা অভ্যাসগতভাবে এ আচরণটির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। তারা কুট কথা বলে মানুষের কান ভারী করে তোলে আর অন্তর বিষিয়ে দেয় এবং একে অন্যের সাথে শত্রুতার সূত্রপাত ঘটিয়ে দেয়। এর ফলে ভুল বোঝা-বুঝি, মনোমালিন্য থেকে শুরু করে ঝগড়া-বিবাদ এবং বড় ধরনের অঘটনও ঘটে যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক বা সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলার ইন্ধন যোগানো হয় চোগলখোরীর মাধ্যমে। স্বামী-স্ত্রী বা বউ-শাশুড়ীর মনোমালিন্য বা ঝগড়া-ঝাটি সব পরিবারেই কিছু না কিছু লেগে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে যখন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে কোন চোগলখোরের আবির্ভাব হয় তখন বিষয়টি অনেক জটিল আকার ধারন করে এবং অনেক সময় বিচ্ছেদ বা তার চেয়েও বড় ধরনের অঘটন ঘটে থাকে। এভাবে সমাজের অভ্যন্তরেও একে অন্যের সাথে কলহ-বিবাদ সংঘটিত হয় চোগলখোরের উপস্থিতির কারণে। এ শ্রেণীর মানুষ সমাজের ঘৃণিত জীব। তাই এদেরকে চিহ্নিত করে এদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এ জন্যই বিশিষ্টজনরা বলেছেন, "তোমার কাছে যে অন্যের কথা লাগায়, তদ্রুপ জেনে রাখবে তোমার কথাও সে অন্যের কাছে লাগাবে। অতএব তার কাছ থেকে সতর্ক থাক।" সেক্ষেত্রে একজন মুমিনের উচিত, যখন তার কাছে কেউ কারো সম্পর্কে কোন কুটকথা লাগাতে আসে অর্থাৎ কেউ যদি বলে, অমুকে তোমার সম্পর্কে এসব কথা বলছে, তখন ধরে নিতে হবে যে, লোকটি চোগলখোরী করছে। তাই তাকে হয় অবিশ্বাস করতে হবে, নয় তো কোন প্রকার গুরুত্ব দেওয়ার পূর্বেই তার কথার সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। সেই সাথে লোকটিকে এ ধরনের কথা লাগানোর কাজ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে। এভাবে চোগলখোরীর মাধ্যমে সৃষ্ট অঘটন থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

**চোগলখোরীর নিষিদ্ধতা:**

চোগলখোরী একটি ঘৃণিত আচরণ। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে চোগলখোরী করার উপরে নিষিদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

**"সে ব্যক্তির অনুসরণ করো না, যে কথায় কথায় শপথ করে, সে লাঞ্ছিত, যে অসাক্ষাতে নিন্দা করে, যে একজনের কথা আরেক জনের কাছে লাগায়।"**

আল-কোরআন, সুরা কলম(৬৮), আয়াত-১০,১১

**চোগলখোরীর পরিণাম:**

চোগলখোরী একটি কবীরা গুণাহ, তাই এর পরিণামও অত্যন্ত ভয়াবহ। চোগলখোরীর কারণে কবরেও শাস্তি হতে পারে এবং চোগলখোর জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং ৫৬৩০

অন্য একটি হাদিস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন,

**"তাদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বেশী গুণাহের দরুন আযাব দেওয়া হচ্ছেনা। আর তা হল কবীরা গুণাহ। এদের একজন পেশাবের সময় সতর ঢাকত না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং ৫৬২৯

## প্রতিশ্রুতি/ অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গ করা
## (Breaking Covenant)

অঙ্গীকার শব্দটির সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি, ওয়াদা, চুক্তি ইত্যাদি। এ সকল শব্দই অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রচলিত অর্থে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নাম অঙ্গীকার। দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন সুনির্দিষ্ট কাজ করা অথবা না করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়ে যায়, তবে তাকেই অঙ্গীকার বলা হয়। অঙ্গীকারসমূহের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। মুমিনদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন,

**"হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।"**

আল-কোরআন, সুরা মায়েদা(৫), আয়াত-১

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসিরবিদদের বাহ্যত বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন এখানে সেগুলোকেই বোঝান হয়েছে। আবার কারো মতে এখানে ঐসব চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধীতা নেই। এ কারণেই ইমাম রাগেব-এর মতে যত প্রকার চুক্তি আছে, তা সবই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। তার মতে অঙ্গীকারের প্রাথমিক প্রকার তিনটি,

১. **পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার**
২. **নিজের সাথে অঙ্গীকার**
৩. **মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত অঙ্গীকার ।**

**পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার:**

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বান্দার প্রকৃত মুক্তি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এ অঙ্গীকার সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন যায়গায়। তিনি ইরশাদ করেছেন,

**"আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর।"**

আল-কোরআন, সুরা মায়েদা(৫), আয়াত-১

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ যথাযথ পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহর সাথে মানুষের অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, আল্লাহর ইলাহ্ হওয়ার তাৎপর্য জানা ও বোঝা এবং মানুষের আল্লাহর বান্দা হওয়ার দাবী কি তা জানা ও পূরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে যে সব অঙ্গীকারের কথা বলেছেন তার শিরোনাম হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। আর এ মৌলিক কালিমা থেকে সকল বিষয় ও সকল বিধির উৎপত্তি। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবী হলো, আল্লাহ্ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের স্বীকৃতি প্রদান করা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে রব বা প্রতিপালক এবং একমাত্র ইলাহ হিসেবে মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া, এর মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা এবং কাজে-কর্মের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো। এই অঙ্গীকারের অধীনে আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্বের স্বীকৃতি দান এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত নির্দেশাবলীর পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে সকল বিধি-বিধান পালন করা, হালাল ও হারাম মেনে চলার অঙ্গীকার এসে যায়। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ যা করতে নিষেধ করেছেন সে সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকাও অঙ্গীকার পালনের অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গীকারের সার কথা হল, আল্লাহ্ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্যে লেগে থাকা। এই সমস্ত অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ)-এর কাছ থেকে ঠিক সেই সময়ে গ্রহণ করেছিলেন, যখন তাকে পৃথিবীর খেলাফত অর্পণ করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্ যখন বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেন তখন এই অঙ্গীকার পূণঃসম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত আছে এভাবে-

**"আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি।"**

আল-কোরআন, সুরা আরাফ(৭), আয়াত-১৭২

**নিজের সাথে অঙ্গীকার:**

মানুষ নিজের সাথেও অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারে। নিজ জিম্মায় কোন বস্তুর মানত মানা অথবা কসমের মাধ্যমে কোন কাজ নিজের উপরে জরুরী করে নেওয়া এই প্রকারের অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানার্থে কেবল তাঁরই নামে এবং তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন মানত করা হলে তা পূরণ করা মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায় এবং তা পূর্ণ না করা গুণাহের কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ জাতীয় মানত পুরা করা সৎকর্মশীলদের একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"(সৎকর্মশীল তারা) যারা মানত পূরণ করে।"**

আল-কোরআন, সুরা দাহর(৭৬), আয়াত-৭

কোন বৈধ কাজ করার জন্য আল্লাহর নামে কসম খাওয়া আসলে ঐ কাজটি করার ব্যপারে নিজের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়াকেই বুঝায়। এ কসম পুরা করাও তার জন্য অবশ্য করণীয় হয়ে যায়। তবে কোন অবৈধ কাজের জন্য কসম করা হলে তা পূরণ করা যাবে না।

**মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত অঙ্গীকার:**

অঙ্গীকার বলতে এখানে ঐসব চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে থাকে। যেমনঃ অংশীদারী সংক্রান্ত, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-বন্ধন, ব্যবসা-বানিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, তা এই প্রকারের অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে সম্পাদিত পারস্পরিক চুক্তি অথবা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিও এই প্রকারের অঙ্গীকারের আওতায় পড়ে।

অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পালন করা ঈমানী দায়িত্ব। যারা নিজেদের শপথ এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিষয়ে সচেতন এবং সর্বাবস্থায় তা পালন করতে সচেষ্ট থাকে, তাদের পরিণাম শুভ।

**অঙ্গীকার ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা:**

অঙ্গীকার, তা যে প্রকারেরই হোক না কেন, সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকেরই অত্যন্ত যত্নশীল হতে হয়। অঙ্গীকার পূর্ণ করা সকলের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব এবং কর্তব্য। অঙ্গীকার খেলাপ করা একটি কবীরা গুণাহ্। কোন মানুষ যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন নির্দেশ অমান্য করে তখন সে বস্তুতঃ আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তিই লঙ্ঘন করে। এর ফলশ্রুতিতে কারো পক্ষে নিজের সাথে বা অন্য মানুষের বা গোষ্ঠির সাথে কৃত অঙঙ্গীকারও লঙ্ঘীত হয়ে থাকে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করাও প্রকারান্তে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল। পবিত্র কোরআনে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

**“তোমরা আল্লাহর  অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জ্ঞানী হও।”**

আল-কোরআন, সুরা নাহল(১৬), আয়াত-৯৫

এই আয়াতে সামান্য মূল্যে অর্থাৎ দুনিয়ার মুনাফা লাভের বিনিময়ে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো পরিমানে যত বেশীই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়াদারী ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট আখিরাতের কল্যাণ ও নিয়ামতকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধনসম্পদ ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রী করা কোন জ্ঞানবানের কাজ হতে পারে না।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কোন মুমিনের কাজ হতে পারে না। কেননা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকের একটি নিদর্শন। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"চারটি স্বভাব যার মধ্যে আছে সে প্রকৃতই মুনাফিক। যার মধ্যে এ চারটির একটিও আছে, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। স্বভাবগুলি এইঃ সে কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে আর ঝগড়া বাঁধলে অশ্লীল গালমন্দ করে।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং-১১৪

**অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পরিণতি:**

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার অথবা মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত অঙ্গীকার বা নিজের কসম ভঙ্গ করা খুব বড় গুণাহ্। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে পরকালীন আযাব। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন,

**"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আযাব।"**

আল-কোরআন, সুরা রা'দ(১৩), আয়াত-২৫

এখানে বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনা, না আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে আর না আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধের প্রতি খেয়াল রাখে এবং পৃথিবীতে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারা হচ্ছে অভিশপ্ত দল এবং এদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে আযাব।

অন্য একটি আয়াতেও আল্লাহ্ অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের প্রতি পরকালীন অকল্যাণ সহ যন্ত্রণাদায়ক আযাবের হুঁশিয়ারী শুনিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

**"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রী করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতেও তাকাবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"**

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান(৩), আয়াত-৭৭

হাদিস শরীফে আছে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতকদের কিয়ামতের দিন চিহ্নিত করা হবে এবং তাদেরকে অপমানিত করা হবে। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**“প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন তার নিতম্ব বরাবর একটি ঝাণ্ডা উত্তোলিত থাকবে”।**

রিয়াদুস সলেহীন, হাদিস নং-১৫৮৭

# প্রতারণা করা

## (Deception)

প্রতারণা শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে, প্রবঞ্চণা, শঠতা, ধোঁকাবাজী, জুয়াচুরি ইত্যাদি। প্রতারণা শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ এবং এর বিস্তৃতি বা পরিধিও অনেক ব্যাপক। প্রতারণার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা তাই দুরুহ কাজ। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ছল-চাতুরী বা গোপন কুট-কৌশল অবলম্বন করে কোন অসত্য বিষয়কে সত্য প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাউকে ঠকানো বা ধোঁকা দেওয়া বা ভুলপথে পরিচালিত করার নাম প্রতারণা। এক কথায়, সততার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মিথ্যার বেসাতি করার নাম প্রতারণা।

প্রতারণার বিভিন্ন দিক রয়েছে। প্রয়োগ ক্ষেত্র অনুসারে এবং প্রকৃতি বিচারে প্রতারণার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি হচ্ছে:

- আল্লাহর সাথে প্রতারণা
- নিজের সাথে প্রতারণা
- মানুষের সাথে প্রতারণা

**আল্লাহর সাথে প্রতারণা:**

আল্লাহর সাথে কৃত ঈমান ও আমলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মানুষ আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে থাকে। ঈমানের দাবীতে সকল ইবাদত প্রাপ্যতার হকদার একমাত্র আল্লাহ্। কিন্তু মানুষ যখন সালাত, রোযা, যাকাত ও অন্যান্য ফরয বা ওয়াজিব কাজগুলো সম্পাদন করতে উদাসীন থাকে বা কেবলমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তা করে থাকে, সেটা প্রকারান্তে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার শামিল। আল্লাহর সাথে প্রতারণা করা মুনাফিকের কর্ম। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

**"নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, অথচ তারা নিজেরাই তাদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্নস্তরে।**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৪২, ১৪৫

এখানে ঐ মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর সাথে চালবাজী করতে চায়। তারা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের কপটতা যেমন দুনিয়ায় চলছে তদ্রুপ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনেও চলবে। কিন্তু তারা কখনই সফলকাম হতে পারবে না। তাই আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার পরিবর্তে তারা প্রকারান্তে নিজেকেই ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। কেননা পরকালের শাস্তি থেকে কেউ তাদের রেহাই দিতে পারবে না। মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য আল্লাহ্ সালাতের

উদাহরণ টেনে এনেছেন। বলা হয়েছে যে, তারাই মুনাফিক যারা নিজেদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন থাকে। তারা যখন মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের দেখানোর জন্য সালাতের ভান করে মাত্র। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য সেখানে মোটেই থাকে না। উপরন্তু তারা সালাতকে আল্লাহর বিধান হিসেবেও মোটেই গুরুত্ব প্রদান করে না। বস্তুতঃ তারা প্রহসনের সালাত আদায় করে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার প্রচেষ্টা করে। তবে তাদের দূরভিসন্ধি আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার অন্তরের খবর পর্যন্ত সম্যক অবগত রয়েছেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন এবং পরকালে এদের এ অপকর্মের জন্য সমুচিত প্রতিফল দান করবেন। আল্লাহর সাথে প্রতারণার ফল হিসেবে এদেরকে প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

**নিজের সাথে প্রতারণা:**

প্রতারণার জন্য দু'টি পক্ষের অস্তিত্ব বিরাজমান থাকা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, মানুষ কি করে নিজের সাথে প্রতারণা করতে পারে? তবে একটু ভেবে দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখানে মানুষের কু-প্রবৃত্তিটিই তার বিরুদ্ধ পক্ষ হিসেবে কাজ করে থাকে। সেক্ষেত্রে শয়তানী শক্তিটিই মানুষের শত্রু। শয়তানের প্ররোচনায় প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ নিজেকে বিপথগামী করে ফেলতে পারে। সেটা প্রকারান্তে নিজের সাথে প্রতারণা করার শামিল। কতিপয় বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা করা হল:

- **আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করা:** আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে একদিকে যেমন আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়, তেমনি তা নিজের সাথে প্রতারণা করার শামিল। কেননা এর জন্য তাকেই জবাবদিহি করতে হবে এবং পরিণামও তাকেই ভোগ করতে হবে।
- **ক্ষতিকর বস্তু গ্রহণ করা:** অনেক প্রকারের পাণীয় বা খাদ্যবস্তু মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন, সরাব বা মদ সহ যাবতীয় নেশা জাতীয় বস্তু এবং পানীয়, তামাক ইত্যাদি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে আরও কিছু ক্ষতিকর নিষিদ্ধ বস্তু শরীরের কোন ক্ষতি করেনা ভেবে তা গ্রহণ করে নিজের সমূহ বিপদ ডেকে আনা নিজের সাথে প্রতারণা করার নামান্তর।
- **অপরাধে লিপ্ত হওয়া:** মানুষের জন্য কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া শোভনীয় নয়। তাই জেনে-শুনে সাময়িক স্বার্থ লাভের জন্য অপরাধের জগতে পা বাড়ানো বা কোন পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া নিজের সাথে প্রতারণা বৈ কিছু নয়। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে অর্থ উপার্জন করা হারাম। আর হারাম উপার্জন আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় কাজ এবং হারাম ভক্ষণের অবস্থায় তার ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবার নয়। তাই মিছেমিছি কাউকে ধোঁকা দিয়ে অর্থোপার্জন করার মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা আত্মপ্রবঞ্চণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কথায় বলে 'কারো জন্য গর্ত খুঁড়লে সে গর্তে নিজেকেই পড়তে হয়'।

- **পরীক্ষায় নকল করা:** মানুষ লেখা-পড়া করে জ্ঞানার্জনের জন্য। পড়া-শুনা বাদ দিয়ে পরীক্ষায় নকল করে, শিক্ষকের চোখে ধুলো দিয়ে পাশ হয়ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাতে আর যাই হোক জ্ঞানার্জন হয়না। জীবনের কঠিন বাস্তবতার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে এর মাশুল দিতে হয় পদে পদে ব্যর্থতা আর গ্লানি হজম করার মাধ্যমে। তাই পরীক্ষায় নকল করার প্রচেষ্টা তার জন্য নিশ্চিত আত্মপ্রবঞ্চনার কারণ হয়ে থাকবে।

**মানুষের সাথে প্রতারণা করা:**

মানুষ সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ জীব, তাই জীবনের প্রয়োজনে তাকে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েই পথ চলতে হয়। কিন্তু নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য মানুষ বিভিন্নভাবে অন্য মানুষকে প্রতারিত করার প্রচেষ্টা করে থাকে। তাই জীবনের বাস্তবতায় মানুষকে পদে-পদে প্রতারণার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতারকদের অধিকাংশরাই জ্ঞান-পাপী, তারা সজ্ঞানে এবং বুঝে-শুনেই ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে প্রতারণার মত জঘণ্য অপরাধটি করে থাকে। তারা বিভিন্ন পন্থায় অত্যন্ত সুচতুরভাবে প্রতারণার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। আবার কেউবা হয়ত স্বাভাবিক কাজ-কর্মের মত এ কাজটিও করে ফেলে মনের অজান্তে। তবে আমাদের ধারণা যে, প্রতারণার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভাল জানা থাকলে নিজেকে যেমন প্রতারণা করা থেকে বিরত রাখা যাবে তেমনি প্রতারণার শিকার হওয়া থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে। মানুষের সাথে প্রতারণার অনেকগুলি কৌশলগত দিক রয়েছে। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, ইশারা-ইঙ্গিত ইত্যাদির মধ্যে কুট-কৌশল অবলম্বন, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন বস্তুসামগ্রীর ব্যবহার এবং মনস্তাত্বিক বিষয়াদির সাহায্যে প্রতারণা করার প্রচেষ্টা করা হয়। এ সকল কৌশলের উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রতারণা সংঘটিত হতে পারে। এ পর্যায়ে বাস্তবতার আলোকে-যে সকল ক্ষেত্রে এবং যে সকল পন্থায় প্রতারণা করা হয়, সংক্ষেপে তার একটি বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা  করা হল:

**(১) কেনা-বেচা ও ব্যবসা-বানিজ্যে প্রতারণা:**

ব্যবসা-বানিজ্যে প্রতারণা নতুন কোন বিষয় নয়, আবহমান কাল ধরে তা চলে আসছে এবং সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে তা আরো বেড়ে যাচ্ছে। প্রতারণার আছে নানা রূপ। আমাদের সমাজে ব্যবসার নামে মানুষকে যে পদ্ধতিতে প্রতারিত করা হচ্ছে তার কিছু রূপ:

**ক) ওজন বা পরিমাপে কম করা:** (বিষয়টি ভিন্ন ভাবে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে)

**খ) খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করা:** কিছু কিছু অসৎ ব্যবসায়ী তাদের বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রীর উত্তম মালের সাথে নিকৃষ্ট মাল মিশিয়ে এবং বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ ও ব্যবহার করে ব্যবসায়ে প্রসার লাভের প্রচেষ্টা করে থাকেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্রবস্তু, পানীয় এবং ঔষধ-পত্রের মধ্যে যেভাবে ভেজাল মিশানো হয়ে থাকে তার কিছু নমুনা পেশ করার চেষ্টা করা হল:

**পানীয় জল:** মিনেরাল ওয়াটারের নামে নদী, পুকুর বা ডোবার জল, ওয়াসার পানি ইত্যাদি বোতলজাত করে বিক্রী করা হয়।

**কোমল পানীয়:** কোমল পানীয়'র মধ্যে নেশা জাতীয় তরল পদার্থ মিশ্রণ করে বাজারজাত করা। এভাবে 'টাইগার' 'পাওয়ার' ও 'এনার্জি ড্রিঙ্ক' নামে এ জাতীয় পানীয় বাজারে অবাধে বিক্রী হতে দেখা যায়।

**নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্রবস্তু:** চালের মধ্যে কাঁকড়, ভাল চালের মধ্যে নিম্ন মানের চাল, সয়াবিনের মধ্যে পাম অয়েল, সরিষার তেলে ঝাঝালো পদার্থ, রান্নার মসলার মধ্যে ইটের গুঁড়া, ইউরিয়া দিয়ে মুড়ি তৈরী করা ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় অসাধু ব্যবসায়ীরা ভেজালের কারবার করে যাচ্ছে।

**মাছ-মাংস:** মাছ-মাংস তরতাজা রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় ফরমালিনের মত ক্ষতিকর কেমিকেলস, গরুর মাংসের নামে বিক্রী হয় মহিষ বা অন্যান্য বন্য প্রাণীর মাংস। এমনকি মৃত প্রাণীর মাংস সরবরাহ এবং বিক্রী করতে দ্বিধা করেন না অনেক অসাধু ব্যক্তিরা।

**কাঁচামাল:** কাঁচামালের মধ্যে বিভিন্ন ফল-ফলাদি যেমন আম, আনারস, লিচু, পেঁপে, কলা, কাঠাল, আপেল, কমলা ইত্যাদির দ্রুত পরিপক্কতা আনায়নের জন্য এবং সতেজ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় কেমিকেলস, শাক-সব্জী টাটকা রাখা হয় রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে, যে গুলির অধিকাংশ কেমিকেলস'ই স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

**শিশুখাদ্য:** গুঁড়ো দুধের মত শিশুখাদ্যেও ভেজাল মিশাতে দ্বিধা করে না ব্যবসায়ীরা

**ঔষধ-পত্র:** জীবন রক্ষাকারী ঔষধের মধেও ভেজালের প্রচলন দেখা যায়। ভুঁয়া ঔষধের কোম্পাণী খুলে নকল ঔষধ তৈরী করে ব্যাবসায়ে প্রসার জমাতেও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। প্যারাসিটামল বিষক্রিয়ায় ব্যাপক হারে শিশু মৃত্যুর ঘটনা অনেকেরই স্মরণে থাকার কথা। ফেনসিডিলের নামে মাদকের রমরমা লুকো-চুরি ব্যবসা চলছে সমাজের অলিতে গলিতে। আবার অনেক ব্যবসায়ীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করতে দেখা যায় নির্বিকারে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল হিসেবে ব্যবহৃত এসকল কেমিকেলস মানবদেহে কিডনী, লিভার ও ফুসফুসের মত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মারাত্নক ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং ক্যান্সারের মত দূরারোগ্য ব্যাধি সহ অন্যান্য জীবন নাশক রোগের সৃষ্টি করে। তাই এ সকল কেমিকেলস জীবন নাশক বিষাক্ত দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত। শরিয়তে এ ধরনের ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যারা খাদ্যবস্তুর সাথে কেমিকেলস মিশ্রিত করে অধিক মুনাফা অর্জনের পায়তারায় লিপ্ত রয়েছে, তারা প্রকারান্তে পরোক্ষভাবে মানুষ হত্যার অপরাধ করে যাচ্ছে। এ অপরাধ থেকে সকলকে মুক্ত থাকার জন্য সকল প্রকার বিষাক্ত কেমিকেলের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় পরকালে জাহান্নামের অগ্নির কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

**গ) মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কেনা-বেচার প্রতারণা:** এ প্রক্রিয়ায় শপথের মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করার প্রচেষ্টা করা হয়। জিনিসের মূল্যের উপর মিথ্যা শপথ করে বাড়তি মূল্য নির্ধারণ করে, মন্দ জিনিসকে মিথ্যা শপথ করে ভাল বলে চালিয়ে দেয়া এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে মিথ্যা শপথ করে ব্যবসা করার মাধ্যমে মানুষকে প্রতারিত করা হয়। তবে শর'ই দৃষ্টিতে এ প্রক্রিয়াটিও একটি জঘন্য প্রতারণার অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

**ঘ) এম,এল, এম পদ্ধতিতে প্রতারণা:** অধুনা আমাদের সমাজে ব্যবসা-বানিজ্যে এম,এল, এম (মাল্টি সিস্টেম মার্কেটিং) নামে প্রতারণার এক অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মার্কেটিং এর নাম করে বিভিন্ন সংস্থা বা কোম্পানী সমাজের সাধারণ মানুষদেরকে রাতারাতি বড়লোক বা ধনী হবার স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারণার জাল বিস্তার করে সমাজ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে পাহাড় পরিমান সম্পদ বা অর্থ। এ সিস্টেমের আওতায় পরিচালিত আমাদের সমাজে প্রচলিত সংস্থাগুলির মধ্যে 'ডেসটিনি' একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এদের কাজকর্ম পরিচালিত হয় বিশাল নেটওয়ার্কের আওতায় খদ্দের সংগ্রহের মাধ্যমে যেখানে প্রতিটি স্তরেই ধোঁকাবাজীর মত অবৈধ কর্ম-কাণ্ডের প্রচলন রয়েছে। বস্ত্তুতঃ এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রতারণার ফাঁদ পেতে সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার পায়তারায় লিপ্ত রয়েছে।

**ঙ) ব্যাংক প্রতারণা:** ব্যাংকের কাছে নাম মাত্র সম্পদ গচ্ছিত রেখে তার বিনিময়ে মোটা অংকের অর্থ লোন নেয়া এবং তা পরিশোধ না করে হজম করে ফেলা একটি প্রতারণা। প্রতারণার এ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় বড় বড় পার্টির সাথে ব্যাংক কর্মকর্তা এবং উর্দ্ধতন মহলের যোগ-সাজস থাকতে পারে। এ ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে লুন্ঠিত হয় দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ। কেননা তাদের গচ্ছিত অর্থ সঞ্চালনের মাধ্যমেই ব্যাংক পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতারণার প্রভাবে দেশীয় অর্থনীতিতে ধ্বস নেমে আসে এবং এর ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক অস্থিরতা, উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, অব্যাহত দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি সহ নানা প্রকার জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। প্রতারণার প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় অত্যন্ত সংগোপনে সাধারণ মানুষের অগোচরে এবং প্রতারণার হোতারা থাকে সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবে প্রতারণার ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক কুফল ভোগ করতে হয় সাধারণ মানুষকেই। ব্যাংক প্রতারণার বিষয়টি বিভিন্ন দেশে চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে এবং ছোট-খাট প্রতারণার ঘটনা আমাদের সমাজেও প্রচলিত আছে বলে প্রতীয়মান হয়। এদেশে সম্প্রতি ব্যাংক প্রতারণার পুকুর চুরির এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে 'হল মার্ক' নামের একটি ব্যবসায়ী গ্রুপ। তারা একটি সরকারী ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার লোন নিয়ে বিদেশে পাচার করেছে। তাদের এ অপকর্মের বিচার এদেশের মাটিতে হবে কিনা সন্দেহ, তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, প্রতারণার সাথে জড়িতরা এ জীবনে পার পেয়ে গেলেও পরকালের আদালতে রেহাই পাওয়ার কোন পথ থাকবে না এবং এর জন্য ভোগ করতে হবে কঠিন আযাব।

**চ) শেয়ার মার্কেট প্রতারণা:** শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করে সাধারণ জনগণ, আর শেয়ার মার্কেট নিয়ন্ত্রিত হয় একশ্রেণীর কর্মকর্তা দ্বারা। কিছু অসাধু কর্মকর্তা যখন তাদের অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং কৃত্রিম বাজার নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বিপুল অংকের অর্থ আত্মসাৎ করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

ঠকিয়ে থাকেন, সেটা এক ধরনের প্রতারণা। শেয়ার মার্কেট প্রতারণার ফলাফল লাখ লাখ সাধারণ মানুষের চরম আর্থিক ক্ষতি এমনকি অনেকের জন্য পথে বসার মত দূরাবস্থা। শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারীর সাথে জড়িয়ে যারা প্রতারণার মাধ্যমে অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনের পায়তারায় লিপ্ত রয়েছেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে পরকালীন কঠিন শাস্তি।

**ছ) রিয়াল স্টেট ব্যবসায় প্রতারণা:** রিয়াল স্টেট ব্যবসা একটি বৈধ প্রকারের ব্যবসা যখন তা সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন প্রকারের অসততা ও নিষ্ঠাহীনতা এ ব্যবসাকে কলুষিত করতে পারে। তখন সেটা হারাম ব্যবসায় পরিগনিত হতে পারে। এ জন্য এ ব্যবসায় কোন প্রকার ধোঁকা, ফেরেব বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া মহাপাপ। আমাদের সমাজে রিয়াল স্টেট ও হাউজিং এর নামে চলছে রমরমা ব্যবসা। এতে মানুষ একদিকে যেমন সৎ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উপকৃত হচ্ছে তেমনি অপরদিকে অসৎ ব্যবসায়ীর কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অনেকে। এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গ্রাহকের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমান অর্থ। তারা হাউজিং এর নাম করে ভূঁয়া কাগজপত্র এবং নাম মাত্র প্লট দেখিয়ে ক্রেতার কাছ থেকে বুকিং মানি হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা অগ্রীম হাতিয়ে নিচ্ছে। অপরদিকে ক্রেতারা হচ্ছেন দিশেহারা। তারা বছরের পর বছর কিস্তি শোধ করে যাচ্ছেন অথচ কাঙ্ক্ষিত প্লটের দেখা পাচ্ছেন না। ইত্যাবসারে অফিসপত্র গুটিয়ে লাপাত্তা হতেও দেখা গেছে অনেক কোম্পানীকে। ফলে অসাধু ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পথে বসতে হয়েছে অনেক গ্রাহককে। এটা আমাদের সমাজে রিয়াল স্টেট ব্যবসায় প্রতারণার একটি খন্ডিত বাস্তব চিত্র। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রিয়াল স্টেট ব্যবসার নামে যারা জনগণকে ধোঁকা দিয়ে অর্থ উপার্যন করছেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরকাল।

**জ) দালালীর মাধ্যমে প্রতারণা:** সত্যের আশ্রয়ে দালালী করাতে কোন দোষ নেই। তবে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বা সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রন ঘটিয়ে কিংবা ছলনা ও স্রেফ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্রেতা ভাগানো বা বিক্রেতাকে খদ্দের জোগাড় করে দেওয়া কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এটা বড় ধরনের প্রতারণা। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারনতঃ এ ধরণের দালালীর প্রচলন দেখা যায়। বর্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এ প্রকারের দালালীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এক শ্রেণীর অসৎ ডাক্তার রয়েছেন যারা দালাল ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। বিশেষজ্ঞ না হলেও দালালগণ তাদেরকে বিশেষজ্ঞ সাজিয়ে নানা প্রকার ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাদের জন্য রোগী সংগ্রহ করে থাকে। এটা নিশ্চিত সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়া বৈ কিছু নয় এবং এটা প্রতারণার একটি বিশেষ রূপ।

### (২) লেনদেনে প্রতারণা:

ব্যবসা-বানিজ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের বাইরেও মানুষের সাথে মানুষের বিভিন্ন প্রকার লেনদেন থাকতে পারে, যেমন টাকা-পয়সার লেনদেন, জায়গা-জমি ও অন্যান্য সম্পদের লেনদেন, চুক্তি-পত্র, প্রেম-ভালবাসা সহ মানবীয় সকল প্রকার লেনদেন-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর সকল প্রকারের লেনদেন সততা এবং বিশ্বস্ততার সাথে হওয়াটাই বাঞ্ছণীয়। সততা বিবর্জিত এবং ধোঁকা

ও ফেরেবপূর্ণ লেনদেন প্রতারণা হিসেবে বিবেচিত। এ ক্ষেত্রে প্রতারণার বাস্তবতা উদাহরণ সহ উপস্থাপন করা হল:

- টাকা-পয়সার লেনদেনের ক্ষেত্রে: টাকা ধার নিয়ে অস্বীকার করা বা সময়মত তা শোধ করতে গড়িমসি করা বা আদৌ শোধ না করা ।
- জমাজমির লেনদেনের ক্ষেত্রে: নিজের বিক্রীত জমি পুনরায় একাধিকবার বিক্রী করা, অন্যের জমিন ভূঁয়া কাগজ-পত্রের সাহায্য নিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নেয়া, শরীকি সম্পত্তি অন্যকে না জানিয়ে বিক্রী করা বা নিজে হস্তগত করা, ভূঁয়া মালিক সেজে অন্যের জমিন বিক্রী করা, না জানিয়ে বা সত্য গোপণ করে কারও কাছে ত্রুটিযুক্ত জমা-জমি বিক্রী করা ইত্যাদি এ প্রকারের প্রতারণার আওতাধীন।

**(৩) চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রতারণা:**

মানুষ তার জীবনের সংকটময় মুহূর্তে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। এ সময়ে তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কোন অবৈধ ফায়দা হাসিলের প্রচেষ্টা করা নিশ্চয়ই কারো জন্য শোভনীয় হতে পারে না। কিন্তু সমাজের একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী চিকিৎসককে মানুষের এ সময়কার দুর্বলতার সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ হাসিলের পথ অন্বেষণ করতে দেখা যায়। তারা বিভিন্নভাবে অত্যন্ত সুকৌশলে প্রতারণার কাজটি চালিয়ে যান অতি সংগোপণে। তাদের প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসতে দেখা গেছে অনেক পরিবারকে। চিকিৎসার নামে একজন চিকিৎসক কর্তৃক সাধারণতঃ যে সকল প্রক্রিয়ায় প্রতারণা করা হয়ে থাকে তার কিছু বাস্তব নমুনা পেশ করা হল

- ভূঁয়া বিশেষজ্ঞ সেজে চিকিৎসার নামে প্রহসন করা।
- অপ্রয়োজনীয় এবং দামী দামী টেষ্ট লিখে ল্যাবরেটরীসমূহ থেকে বিপুল পরিমান অর্থ কমিশন হিসেবে গ্রহণ করা।
- টেষ্ট না করে রিপোর্ট প্রদান করা।
- ভূঁয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করা।
- প্রয়োজন বহির্ভূত সার্জারী বা অপারেশন করা অথবা সার্জারীর নামে ধোঁকা দিয়ে অপরেশন না করেই অর্থ আত্মসাৎ করা।
- বিনা প্রয়োজনে রোগীকে ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা এবং একটি বড় অংকের বিল বানিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা।
- **হারবাল চিকিৎসার নামে প্রতারণা:** অধুনা দেশের বিভিন্ন শহরের যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে হারবাল ও কবিরাজি চিকিৎসা কেন্দ্র। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, শহরের জনবহুল এলাকায় ইণ্ডিয়ান হারবাল, আমেরিকান হারবাল, মাদ্রাজ হারবাল ইত্যাদি চিকিৎসা কেন্দ্রের নাম দিয়ে মনোরম সব সাইনবোর্ড লাগিয়ে জেঁকে বসেছে হারবাল চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি। এসব কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে চলে অপচিকিৎসা। তারা গ্যারান্টি সহকারে স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনে অক্ষমতা, যৌনরোগ, যৌনদুর্বলতা, মেদ-ভুরি, স্বাস্থ্য হীনতা,

www.waytojannah.com

জ্বিনের আছর ইত্যাদি অতিসংবেদশীল বিষয় সহ এজমা, লিভার সমস্যা, কিডনী সমস্যা, জটিল ও পুরাতন রোগ এমনকি ক্যান্সারের মত বিভিন্ন দূরারোগ্য রোগের সফল চিকিৎসা প্রদানের দাবী করে থাকে। এর জন্য তারা প্রচার পত্র বিলি ছাড়াও ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নজরকাড়া এবং যৌন আবেদনময়ী বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে। মানুষকে এভাবে আকৃষ্ট করে ভুঁয়া চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে তাদের কাছে থেকে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে প্রচুর অর্থ। আর সেই সাথে প্রতারিত হচ্ছে অসহায় সব সাধারণ মানুষ। আবার কোথাও কোথাও কবিরাজ ঘর খুলে দালাল চক্রের মাধ্যমে এবং ভণ্ড কবিরাজ ও আধ্যাত্নিকগণের সহায়তায় প্রতারকগণ অসহায় লোকজনের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা। এ সব অসাধু ব্যাবসায়ীদের কোন প্রকার সরকারী লাইসেন্স পর্যন্ত নেই, তবুও তারা এ প্রতারণার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে।

**(৪) প্রেম-প্রীতি ও  বিবাহ-শাদীতে প্রতারণা:**

প্রেমের এই ফাঁদ পাতা ভুবনে নকল প্রেমের অনেক ঘটনাই-তো প্রতারণার সাক্ষ্য বহন করে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আর্থিক লাভবান হওয়া, জৈবিক চাহিদা পূরণ করা, কিংবা নিছক আনন্দ-ফূর্তি করার জন্য প্রণয়ের আশ্রয়ে প্রতারণা করা হয়ে থাকে। সেখানে একই সাথে অনেকের সাথে সখ্যতা স্থাপনের ঘটনাও থাকতে পারে। প্রেমজাল বিস্তার করে প্রণয়ের ছলে প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকার অথবা প্রেমিকা কর্তৃক প্রেমিকের সর্বস্ব লুটে নেওয়া কিংবা ইপ্সীত স্বার্থ হাসিলের পরে প্রেমজাল কেঁটে সটকে পড়া এ প্রতারণার বাস্তবতা।

বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে প্রতারণা করা হয়ে থাকে। যেমন:

- বিবাহিত পুরুষকে অবিবাহিত বলে বা বিবাহিতা নারীকে অবিবাহিতা বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা।
- বর/কনের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক অবস্থা, চাকরী সংক্রান্ত বা শারীরিক দুর্বলতার কোন তথ্য গোপন করে বা ভুল তথ্য প্রদান করে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা।
- এক বর/কনের পরিচয়ে অন্য কনে/বরের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

এছাড়াও বিবাহ-শাদীতে আরো অন্যান্য প্রকারের প্রতারণারও আশ্রয় নেয়া হতে পারে।

**(৫) নির্বাচনী প্রতারণা:**

আমাদের সমাজের রাজনৈতিক দলগুলো ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন মিথ্যা আশ্বাস ও ভূঁয়া প্রত্যাশার বাণী শুনিয়ে সাধারণ মানুষদের প্রতারিত করার চেষ্টা করে থাকে। তারা নির্বাচনী বৈ তরণী পার হবার জন্য কথার ফুলঝুড়ি সাজিয়ে, ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে উন্নয়নের কথা বলে এবং নানা প্রকার মিথ্যা অঙ্গীকার দিয়ে মানুষকে বশীভূত করে ভোট কব্জা করার প্রচেষ্টা করে থাকে

দলগতভাবে এবং ব্যক্তিগতপর্যায়ে। কিন্তু নির্বাচনী বৈ তরণী পার হয়েই তারা বেমালুম ভুলে যান নির্বাচনে প্রদত্ত সকল অঙ্গীকারের কথা। এভাবে নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এক ধরনের প্রতারণা।

**(৬) জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতারণা:**

নকল সার্টিফিকেট, দলীল বা ভাউচার ইত্যাদি বানিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা-এক প্রকারের প্রতারণা। আমাদের সমাজে জালিয়াতির মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার অনেক ঘটনাই দেখা যায়। নিম্নে জালিয়াতির প্রতারণার কিছু বাহ্যিক রূপ উপস্থাপন করা হল:

- শিক্ষাগত যোগ্যতার জাল সার্টিফিকেট তৈরী করে চাকুরী গ্রহণ করা।
- ভূঁয়া মার্কসীট ব্যবহার করে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধা নেয়া।
- ভূঁয়া মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ফায়দা নেয়া।
- নিজের নামে অন্যকে পরীক্ষায় বসিয়ে সার্টিফিকেট হাসিল করা।
- নকল করে পরীক্ষায় পাশ করা।
- অন্যের সই নকল করে ব্যাংক থেকে টাকা আত্মসাৎ করা।
- জাল টাকা তৈরী করা ও তা বাজারে ছেড়ে দেওয়া।
- নকল ঔষধ বা পণ্যসামগ্রী তৈরী করে বাজারজাত করা।
- দলীল নকল করে অন্যের জমি দখল করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া এবং অন্যান্য সুবিধাদি হাসিল করা জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতারণার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ছাড়াও জালিয়াতির প্রতারণার আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

**(৭) পোষাক-পরিচ্ছদ-এর মাধ্যমে প্রতারণা:**

মানুষ অনেক সময় পোষাক-পরিচ্ছদকে প্রতারণার একটি উপায়-উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। পোষাকের মাধ্যমে অতি সহজেই মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে যে কারো আস্থা অর্জন করা সম্ভব। পোষাকের চাকচিক্যে আভিজাত্য বা বড়লোক এবং নোংরা পোষাকে দরিদ্র বা ফকির বলে প্রতীয়মান হওয়াটাই স্বাভাবিক। আবার বিশেষ কোন শ্রেণীর চিহ্নিত পোষাক ব্যবহার করা হলেও কাউকে সে শ্রেণীর লোক বলে ভেবে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। পোষাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তির কুৎসিত চরিত্রটি মানুষ খুব কমই দেখে। তাই একশ্রেণীর প্রতারক পোষাককে পুঁজি করে প্রতারণা করে বেড়ায় সমাজের বিভিন্ন অঙ্গণে। উদাহরণস্বরূপঃ

- ভণ্ড পীরের অস্তিত্ব আমাদের সমাজে কোন বিড়ল ঘটনা নয়। দাড়ি-টুপি-জোব্বা পড়ে আর কিছু ভণ্ড সাগরেদ যোগাড় করে পীর সেজে আস্তানা গড়ে সমাজের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করার খবর আমাদের কাছে নতুন নয়। রোগ-

www.waytojannah.com

মুক্তি, বিপদ-আপদ দূর করণ আর কল্যাণার্জনের জন্য মূর্খ ভক্তরা ছুটে আসে তার আস্তানায়। আর সেই সুযোগে ভণ্ড বাবা লুটে নেয় প্রচুর অর্থ।

- এভাবে পোষাককে পুঁজি করে প্রতারণার আরও অনেক বাস্তবতা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। আইনের পোষাক ব্যবহার করে একশ্রেণীর লোক নকল বাহিনী সেজে মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে চাঁদাবাজি, হয়রানি সহ অন্যান্য অপকর্ম করে বেড়ানোর চিত্রতো মানুষের কাছে অজানা থাকার কথা নয়।
- আবার নিঃস্ব হয়েও পোষাকের চাকচিক্য দিয়ে ধনীর দুলালীকে কব্জা করার ঘটনাও সমাজে বিরল নহে।

এগুলি সবই হলো পোষাক নিয়ে প্রতারণার সামাজিক বাস্তবতা। তবে সমাজের অভ্যন্তরে যারা পোষাককে পুঁজি করে এধরণের প্রতারণা করে যাচ্ছে তাদেরকে সাবধান হওয়া উচিত, কেননা এর ভয়াবহ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে পরকালের জীবনে।

**(৮) মোবাইলে প্রতারণা:** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই এখন মোবাইল ব্যবহার করছেন। এই সুযোগে একধরণের প্রতারক চক্র গজিয়ে উঠেছে। তারা নিত্য নতুন কৌশলে মোবাইলের মাধ্যমে প্রতারণা করার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের সাথে। এক ধরনের প্রতারণা এভাবে করা হয় যে, প্রথমে প্রতারক চক্র কোন একটি বা একাধিক মোবাইল নম্বরে বিপুল অংকের টাকা লটারীর পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে বলে একটি এসএমএস করে এবং এর জন্য নির্দিষ্ট একটি মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে বলে। যদি কেউ পুরস্কারের আশায় যোগাযোগ করে তবে তাকে কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে উপস্থিত হয়ে তা সংগ্রহ করার জন্য বলা হয়। আর এর পরিসমাপ্তি হচ্ছে উক্ত ব্যক্তিকে আটক করে মুক্তিপণ আদায় করা। এ ধরনের ভুঁয়া এসএমএস প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা বোধ করি অনেক মোবাইল গ্রাহকেরই রয়েছে। তবে যারা এতে বিশ্বাস করেছে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে এদের ফাঁদে পা দিয়েছে তাদের হাল তো আমরা বর্ণনা করলাম। আর যারা বিশ্বাস করেনি তারা অবশ্যই নিরাপদে রয়েছেন।

**(৯) বিদেশ পাঠানোর নাম করে প্রতারণা:** একশ্রেণীর প্রতারক চক্র আছে যারা বিদেশে লোক পাঠানোর নাম করে ভুঁয়া এজেন্সি খুলে বসে এবং বিদেশ গমনের ভিসা প্রদান করার কথা বলে তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে অবশেষে সটকে পড়ে। তারা চলে যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং এদের আর স্পর্শ করার সাধ্য কারো থাকে না। এভাবে কত যে নিরীহ মানুষকে এদের খপ্পরে পড়ে ভিটে-মাটি সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসতে হয়েছে তার হিসেব কে রাখে?

**(১০) বিজ্ঞাপণ দ্বারা প্রতারণা:** মিডিয়ার প্রসারের বদৌলতে বিজ্ঞাপন এখন প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। নজরকাড়া এবং মনমাতানো বিজ্ঞাপণের দ্বারা মানুষ অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কোন অচল পণ্য বিজ্ঞাপনের দ্বারা অতি সহজেই সচল করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে কত

মানুষ যে প্রতারিত হচ্ছে তার হিসেব রাখা দায়। বিজ্ঞাপনের কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে একথা অনস্বীকার্য। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিকৃষ্ট মাল বা ভুঁয়া জিনিস সচল করার জন্য বাহারী ঢংয়ের এবং নজর কাড়া বিজ্ঞাপনের ব্যবহার করা হয়। তবে খারাপ জিনিস বাজারজাত করে তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট বলে চালিয়ে দেয়া প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

### (১১) প্রতারণার আরো বিবিধ রূপ:

প্রতারণার রয়েছে আরো বহুবিধ রূপ। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ আরো যেভাবে প্রতারিত হচ্ছে অনবরত তার আরো কিছু বাস্তব রূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

- বিদেশী লেবেলে দেশী জিনিস অথবা উচ্চমানের প্যাকেটে নিম্ন মানের জিনিস ভরে বিক্রয় করা।
- উচ্চমানের চালু মালের কাছাকাছি নাম দিয়ে নিম্নমানের মাল বিক্রী করা।
- পুরাতন মালের উপর রঙ চড়িয়ে নতুন বলে বিক্রয় করা।
- কোন জিনিসের দোষ-ক্রটি নিজের জানা থাকা সত্ত্বেও তা ক্রেতার কাছে বয়ান না করে বা তা গোপণ রেখে পণ্য বিক্রয় করা।
- কোন খারাপ জিনিসের ভূয়সী প্রশংসা করে তা বাজারে চালিয়ে দেওয়া।
- ফলের কার্টুনে উপরে ভাল ফল রেখে নিচে খারাপ ফল ভরে বিক্রয় করা। তেমনি শস্যের উপরিভাগে ভালো এবং নিচে খারাপ ভরে বিক্রয় করা।
- ভূঁয়া ডিসকাউন্টের লোভ দেখিয়ে, জিনিসের গয়ে বাড়তি মূল্য লিখে রেখে পরে কম দাম রাখা।
- ভাল জিনিস টেষ্ট করিয়ে বা ভাল জিনিসের নমুনা দেখিয়ে খারাপ মাল প্যাকেটে ভরে দেওয়া।
- গিফটের লোভ দেখিয়ে মাল বিক্রয় করা।
- চাকুরী দেওয়ার লোভ দেখিয়ে মোটা টাকা গ্রহণ করে সুযোগ বুঝে কেটে পরা।
- বিদেশে পাঠাবার নাম করে ভাওতা দিয়ে অর্থ উপার্যন করা।
- টিভি, ফ্রিজ, এসি, কম্পিউটার, টেপ, মোবাইল, ঘড়ি, গাড়ী ইদ্যাদি যান্ত্রিক জিনিস মেরামতের নামে ধোঁকা দিয়ে অতিরিক্ত পয়সা কামাই করা। কোন পার্টস চেইঞ্জ না করে পার্টসের দাম নেওয়া, ভাল পার্টস খুলে রেখে পুরাতন পার্টস জুড়ে দেওয়া, নিজের পার্টস বিক্রয় করার জন্য মেরামতযোগ্য পার্টস না সেরে তা পরিবর্তন করা, সময়ের দরকার আছে ও মেহনতের কাজ বলে ভাওতা দিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেওয়া ইত্যাদি অবৈধ এবং প্রতারণামূলক কাজ।
- ঠিকাদারীর কাজে ফাঁকি দেওয়া, ভাল মালের পরিবর্তে খারাপ মাল ব্যবহার করে কাজ সারা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না দিয়ে খারাপ এবং অল্পমাল দিয়ে কাজ করা এবং প্রয়োজনীয় সময় না দিয়ে অল্প সময়ে দায়সারাভাবে কাজ করা। এ সবই প্রতারণার বাস্তব এবং বাহ্যিক রূপ।

প্রতারণার জাল এত বিস্তৃত যে, এর সকল দিক উপস্থাপন করা খুবই দুস্কর। সমাজে প্রতিনিয়ত অভিনব পদ্ধতিতে প্রতারণার নতুন নতুন ঘটনা জন্ম নিচ্ছে। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ছলনার আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের সকল প্রচেষ্টাই প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এ মৌলনীতির আলোকে সকল বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে পথ চলতে হবে এবং এভাবে প্রতারণামূলক আচরণকে চিহ্নিত করতঃ তা পরিহার করে চলতে হবে।

**প্রতারণার প্রতিফল বা পরিণতি:**

প্রতারণা একটি মুনাফিকী কর্ম এবং জঘন্য অপরাধও বটে। মুনাফিকগণ মুখে যা বলে কার্যত তা করেনা এবং সেটা তাদের অন্তরের কথাও নয়। তারা কথা বললে মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা করলে চুক্তি ভঙ্গ করে আর আমানতের খিয়ানত করে। কার্যত তাদের জীবনটাই ধোঁকাবাজীতে পূর্ণ। মুনাফিকদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন পরকালীন ভয়াবহ আযাব। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

**“তারা (মুনাফিকগণ) আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। কিন্তু এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না, অথচ তারা তা অনুভব করতে পারেনা। তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব।**

আল-কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-৯-১০

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে মুনাফিকদের স্বরূপ উৎঘাটন করে তাদের প্রতি শাস্তি আরোপের কথা বলা হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় মদীনার মুনাফিকগণ মুসলমানদের কাছ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বিভিন্ন কুট-কৌশল অবলম্বন করে তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার প্রচেষ্টা করত। তারা নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে দাবী করে মুসলিমদের কাছে গিয়ে বলত যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তারা বিভিন্নভাবে তাদের দাবীর সত্যতা প্রমানের প্রচেষ্টাও করত। বস্তুতঃ তাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্রও ছিলনা। এভাবে তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে প্রতারিত করার চেষ্টা করত। তবে তারা একথা কখনই বুঝতে পারতনা যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং সূক্ষ্মদর্শী এবং আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার প্রচেষ্টা কখনই সফলকাম হতে পারেনা। বস্তুতঃ সেসমস্ত মুনাফিকগণ নিজেরা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিয়েছে এবং তাদের আচরণ দিয়ে নিজের শাস্তিকেই ক্রয় করে নিয়েছে। কেননা আল্লাহ্ সে সমস্ত মুনাফিকদেরকে চরম শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ আয়াতটি যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় মদীনার তৎকালীন মুনাফিকদের লক্ষ্য করে নাযিল করা হয়েছে এবং এ জামানায় সে মুনাফিকদের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এখন এ আয়াতের তাৎপর্য কি থাকতে পারে? এর উত্তরে বলা যায় যে, যদিও সে মুনাফিকদের অস্তিত্ব এখন আর নেই তবুও এ জামানায় মুনাফিকী চরিত্রের অবসান হয়েছে একথা কেউ হলফ করে

বলতে পারেনা। তদুপরি এখনও যারা প্রতারণা, ধোঁকাবাজী আর বিশ্বাস ভঙ্গের মত জঘন্য আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, তারা প্রকারান্তে ঐ মুনাফিকদেরই দলভুক্ত এবং তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এ আয়াতটির হুকুম প্রযোজ্য রয়েছে।

প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের সাময়িক লাভ অর্জিত হলেও এর পরিণাম মোটেই লাভজনক নয়, বরং তা তার জন্য বয়ে আনে প্রভূত অকল্যাণ এবং পরকালীন আযাব। তাই পরকালীন মুক্তির জন্য প্রতারণামূলক সমুদয় আচার আচরণ থেকে নিজেকে বঁচিয়ে রাখা সকলের জন্যই বাঞ্ছণীয়।

## ওজন বা পরিমাপে কম দেওয়া

## (Short Weighing and Cheating)

**"ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে"**

আল-কোরআন, সুরা আল-আন'আম(৬), আয়াত-১৫২

সুরা আল-আন'আমের এই আয়াতে কারিমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি ওজন ও পরিমাপে ন্যায্যমান প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে ন্যায়ভাবে বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষকেও নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশি নেবে না। এটি একটি সুস্পষ্ট এবং সরাসরি নির্দেশ, তাই এ নির্দেশনা পালন করা সকলের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। এর অনুরূপ আর একটি নির্দেশনা এসেছে কোরআনের অন্য সুরায়,

**"মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।"**

আল-কোরআন, সুরা বানী ইসরাঈল(১৭), আয়াত-৩৫

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

**"তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিওনা।"**

আল-কোরআন, সুরা আর রহমান(৫৫), আয়াত-৯

উপর্যুপরি আয়াতগুলির মাধ্যমে পরিমাপ ও ওজন সঠিক এবং পুরোমাত্রায় করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। এ নির্দেশ লংঘণ করা কবীরা গুণাহ।

ওজন ও পরিমাপ ন্যায় প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড এবং প্রধানতঃ এ দু'উপায়েই প্রাপকের ন্যায্য পাওনা আদায় হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে থাকে। তবে মানুষের সকল প্রাপ্য শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর বাইরেও অনেক বিষয় রয়েছে। সেক্ষেত্রে জীবনের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতে হয় ন্যায়নিষ্ঠার সাথে। এ আয়াতের মর্মার্থও তাই। যদিও এখানে ওজন ও পরিমাপের কথা বলা হয়েছে, তবুও এ নির্দেশনাটি ব্যাপক অর্থবহ। মানুষের প্রাপ্য শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সংখ্যা, গণনা, পরিমান ইত্যাদি সহ অন্যান্য পন্থায় প্রাপককে তার ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ করাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরবিদদের মতে এ আয়াতের মাধ্যমে ওজন ও পরিমাপের সঠিক মান নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্য মান ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ সকল প্রকার লেনদেন এবং সকল

কার্যক্রমে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সকলের প্রাপ্য সঠিকভাবে পরিশোধ করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই পূর্ণমাত্রায় দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামায ও ওযুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর হক ও ইবাদতে গাফেলতি করে এবং বান্দার নির্দিষ্ট হক বা ন্যায্য পাওনা আদায়ে ত্রুটি বা কম করে সেও মাপে কম করার অপরাধে অপরাধী (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২০)। এতে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্ম পূর্ণ করে না, সময় ও শ্রম চুরি করে কিংবা কাজে ফাঁকি দেয়, সেও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওজন বা মাপে কমকারী অপরাধীদের মধ্যে গণ্য হবে। এভাবে শ্রমিক, মজুর, চাকুরীজীবি কর্মচারী ও কর্মকর্তা যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের খেলাপ। কাজে অলসতা করাও নাজায়েয। কাজেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করা আর ওজনে কম দেওয়া সম অপরাধ। এসব ব্যাপারে প্রশাসক, মন্ত্রী, আমলা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোন আলেম-ই হোক না কেন, সকলেই কর্তব্য কর্মে অবহেলার কারণে ওজন ও পরিমাপ কম দেওয়ার অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। জনগনের প্রতিনিধি হয়ে যারা কর্তব্যে অবহেলা করেন এবং জনগনের ন্যায্য হক আদার করেন না তারাও ওজন ও পরিমাপে কম দেয়ার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকবেন।

**ওজনে কম দেওয়ার পরিণতি:**

মাপ ও ওজনে ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ তাগীদ দিয়েছেন এবং তা অমান্যকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে তারা পূনোরোত্থিত হবে মহা দিবসে? যে দিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখীন। এটা কিছুতেই উচিৎ নয়। নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমল সিজ্জীনে আছে।**

আল-কোরআন, সুরা মুতাফফিফীন(৮৩), আয়াত-১-৭

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মাপ ও ওজনে কম করার অপরাধীদেরকে মহাদিবস অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এখানে বলা হচ্ছে যে, জনগণের প্রাপ্য যারা নষ্ট করছে তারা কি কিয়ামাতের দিনকে ভয় করে না, যেদিন সেই মহান সত্তার সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে? সেইদিন খুবই বিভীষিকাময়, আশংকাপূর্ণ এবং ভয়াবহ কঠিন দিন হবে।

মহাদিবস সম্পর্কে সতর্ক করার পর আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, পাপাচারী ও মন্দ লোকের ঠিকানা হল সিজ্জীন। সিজ্জীন হল একটি বিশেষ স্থান যেখানে সংরক্ষিত খাতায় কাফির এবং

পাপাচারীদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। সিজ্জীন সাত জমিনের তলদেশে অবস্থিত এবং এটা হল যন্ত্রণাদায়ক ও চিরস্থায়ী দুঃখ যাতনার স্থান। কোন কোন রেওয়াতে আছে যে, সিজ্জীন জাহান্নামের একটি অংশের নাম। অতএব পরকালের জন্য এটা যে কত মন্দ আবাস, সে কথা বলাই বাহুল্য। মন্দ পরিণতির কথা বিবেচনা করে কারো পক্ষেই এটা সমীচীন নয় যে, সে ওজনে কম করে ও প্রাপকের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করে মহাদিবসের ভয়াবহ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়। মাপ ও ওজনে সঠিক মান নির্ধারণ করে মহাদিবসে আল্লাহর করুণা লাভে ধন্য হয়ে সফল পরিণতি হাসিল করাই সকলের ব্রত হওয়া উচিৎ।

## আমানতের খেয়ানত করা
## (Breaching Trusts)

আমানত শব্দের অর্থ গচ্ছিত বা জমা। আর খেয়ানত এর আভিধানিক অর্থ ভঙ্গ, ব্যত্যয়, লঙ্ঘণ, হানি, চ্যুতি, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি। আমানত বলতে বোঝায় গচ্ছিত জিনিসের পরিপূর্ণ হেফাযত করা এবং যথা সময়ে ও সঠিকভাবে তা মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ করা। পক্ষান্তরে আমানতের খেয়ানত বলতে বোঝায় গচ্ছিত সম্পদ, বস্ত্ত বা বিষয়ের পরিপূর্ণ হেফাযত না করে বা তা যথাযথভাবে মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ না করে আত্মসাৎ করা বা এর কোন ব্যত্যয় ঘটানো অথবা লোকসান করা। এক কথায় বলা যায়, বিশ্বাসভঙ্গ করাই হচ্ছে আমানতের খেয়ানত।

আমানতের পরিপূর্ণ হেফাযত করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। আমানতের খেয়ানত তাই বড় গুণাহ। পবিত্র কোরআনে আমানতের খেয়ানত না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

**"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না আর খেয়ানত করো না তোমাদের পরস্পরের আমানত জেনে-শুনে।"**

আল-কোরআন, সুরা আনফাল(৮), আয়াত-২৭

আলোচ্য আয়াতে দু'ধরনের আমানতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে; একটি হলো আলস্নাহ্ ও তাঁর রাসূলের আমানত আর অপরটি হলো মানুষের পরস্পরের সাথে আমানত। এ উভয় ক্ষেত্রেই খেয়ানত না করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দান করেছেন।

**আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আমানত:**

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, এখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আমানত বলতে ঐসব আমলকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর ফরয করে রেখেছেন। এ স্থলে সাহাবা এবং তাবেয়ী তফসীরবিদের উক্তি অনুযায়ী নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদত এবং শরীয়তের সকল ফরয আমলসমূহ এমনকি সতীত্বের হেফাযত ও অপবিত্রতার গোসল সহ ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্মসমূহ এই আমানতের মধ্যে দাখিল আছে। এ আমানত হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির উপর অর্পিত হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে জানিয়েছেন,

**"আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং ওতে শংকিত হলো, কিন্তু মানুষ ওটা বহন করলো।"**

আল-কোরআন, সুরা আহযাব(৩৩), আয়াত-৭২

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল কিন্তু তারা শংকিত হয়েছে এবং এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন পৃথিবীতে আদমকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন বলে স্থির করলেন তখন আদম (আঃ)-এর কাছে নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এ আমানত বহন করার সম্মতি চাইলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হল, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে তাঁর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভ করা যাবে। পক্ষান্তরে এই আমানত পণ্ড করা হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আদম (আঃ) আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। এর ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক আদম সন্তানের উপর এ আমানত বর্তিত হয়েছে (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৮)। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমষ্টিই এই আমানত। এগুলো আল্লাহর হক এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে এ হক আদায় হয়ে থাকে। ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতগুলি সঠিকভাবে পালন করা, সুন্নতের অনুসরণ করা এবং পাপকার্য পরিহার করা- এ সবই আল্লাহর হকের মধ্যে শামিল। আল্লাহর হক আদৌ আদায় না করা অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য হওয়া এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পরিহার করাই হচ্ছে প্রকৃত খেয়ানত। আল্লাহর হক আদায় করতে গাফেলতি করা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা কিংবা সুন্নতের পায়রবী (অনুসরণ) না করা- এসবই খেয়ানতের মধ্যে শামিল। আল্লাহর আমানত এর দ্বারাই শেষ হয়ে যায়।

**মানুষের আমানত:**

মানুষের পরস্পরের সাথে আমানত বলতে প্রত্যেক ঐ সব জিনিসকে বোঝায় যা একে অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা হয় অথবা এমন সব বিষয় যার উপর পরস্পরের আস্থা রাখা হয়। বান্দাদের পরস্পরের সমস্ত হক আমানতের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলি আদায় করাও জরুরী। মানুষের হক যথাযথ আদায় না করা হলে আমানতের খেয়ানত করা হয়। সাধারণতঃ আমরা মানুষের কাছে গচ্ছিত সম্পদ বা বস্তুকেই আমানত বলে জানি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমানত এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং মানুষের পারস্পরিক আমানতের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত এবং ব্যাপক। নিম্নে এ আমানত এবং তা খেয়ানতের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

- **গচ্ছিত জিনিস:** সবচেয়ে বড় আমানত ঐ জিনিসগুলোতে রয়েছে যেগুলো আমানত হিসেবে কারো কাছে গচ্ছিত রাখা হয়। গচ্ছিত জিনিস বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন অর্থ-সম্পদ, জমা-জমি, বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র, সোনা-দানা ইত্যাদি। এই জিনিসগুলি গচ্ছিত রাখা হতে পারে কোন ব্যক্তির কাছে বা কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাছে। সেক্ষেত্রে আমানতের হেফাযত করা অর্থাৎ প্রাপককে তার হক যথাযথ পরিশোধ করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কোন প্রকার অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হলে তা খেয়ানতের কারণ হতে পারে। উদাহরণসরূপঃ

মানুষ কিছু শর্ত সাপেক্ষে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে নিরাপত্তার খাতিরে। এখানে ব্যাঙ্ক আমানতদারের ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃক গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করা হলে তা আমানতের খেয়ানত বলেই বিবেচিত হবে।

মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা এবং এরূপ অন্যান্য যৌথ প্রতিষ্ঠান যেখানে জনগণের দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় অনুদানের অর্থ জমা হয়, সে ফাণ্ডের তসরুপ করা বা সেখান থেকে টাকা-পয়সা ব্যক্তিগত কাজের জন্য অপসারণ করা এবং হস্তগত করে তা হজম করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।

ক্ষমতাসীনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বিভিন্ন খাতে ব্যবহার্য্য বরাদ্দের টাকা আত্মসাৎ করাও খেয়ানতের পর্যায়ভুক্ত।

ব্যক্তিগত পর্যায়েও কারো কাছে গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করা খেয়ানত হিসেবেই বিবেচ্য।

- **রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা:** রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল্লাহর তথা জনগণের আমানত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা এ ক্ষমতার আমানতদার। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ, জনগণের সাথে প্রতিশ্রুত ওয়াদা ভঙ্গ, শর'য়ী বিরোধী আইন প্রণয়ণ ইত্যাদি সহ সকল প্রকার অনিয়ম এ আমানতের খেয়ানত করে থাকে।

এমনিভাবে প্রশাসনিক পদে কর্মরত নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যখন ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজনপ্রীতি বা সম্পদের মোহে জেনে-শুনে কোন অযোগ্য লোককে নিয়োগ দান করে, তাহলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং জনগণের আমানত খেয়ানত করার মত কাজ করে।

- **কথা-বার্তা:** পরস্পরের কথা-বার্তার মধ্যেও আছে আমানত। কেউ কারো কাছে নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করলে, সেটা তার কাছে আমানত এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া অপর কারো কাছে প্রকাশ করা খিয়ানত।

কোন বৈঠকে যে সব কথা-বার্তা হয়, তা সে মজলিসেরই আমানত। মজলিসের অনুমতি ছাড়া সে আলোচনা অন্যকারো সাথে করা কিংবা ছড়িয়ে দেয়া খেয়ানত।

কারো কাছ থেকে কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হলে, তিনি সে ব্যপারে আমানতদার। তিনি এমন পরামর্শ দেবেন, যা পরামর্শ গ্রহীতার জন্য কল্যাণকর হবে। কিন্তু জেনে-শুনে

কাউকে কুপরামর্শ দান করা হলে পরামর্শদাতা আমানত খিয়ানতের অপরাধে অভিযুক্ত হবেন।

- **লেনদেন:** মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদান হয়ে থাকে এগুলিও আমানতের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সকল প্রকার লেনদেন স্বচ্ছতা, সততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। লেনদেনে কোন পক্ষ থেকে কোন প্রকার শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করাও খেয়ানত।
- **বিচার-ফয়সালা:** বিচার কার্য প্রত্যেক বিচারকের উপর অর্পিত আমানত। সেক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা বা বিচার-ফয়সালা ন্যায় ও সততার সাথে সম্পাদন করা তাদের পবিত্র দায়িত্ব। জেনে শুনে কোন প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজনপ্রীতি বা কোন চাপে পড়ে সুবিচার পরিহার করা হলে এ পবিত্র আমানতের খেয়ানত করা হয়।
- **ভোটাধিকার:** ভোট জনগণের উপর একটি আমানত। সে ক্ষেত্রে কারো জন্য সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও যোগ্য প্রার্থীর পক্ষেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করা বাঞ্ছণীয়। কিন্তু তা না করে জেনেশুনে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য বা অর্থলোভে কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দান করা হলে এ আমানতের খেয়ানত করা হয়।
- **তথ্য-পরিকল্পনা:** কোন গোপণ তথ্য বা পরিকল্পনা হতে পারে কারো কাছে আমানত। সে তথ্য বা পরিকল্পনা সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দেয়া খেয়ানত বৈ কিছু নয়। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য বা যুদ্ধের কৌশল শত্রু পক্ষের নিকট প্রকাশ করে দেয়া আমানতের খেয়ানত।

**আমানত পরিশোধের তাকীদ:**

যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, তার আমানতদারী যথাযথ পালন করা বা সে আমানত এর প্রাপককে পৌঁছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমানত প্রত্যার্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন এমন খুব কমই হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি:

**"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই"**

তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৯

পবিত্র কোরআনে আমানত পরিশোধের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। বলা হয়েছে,

**"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ মালিকের নিকট পৌঁছে দাও।"**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-৫৮

www.waytojannah.com

**আমানত হেফাযতের গুরুত্ব:** আমানত হেফাযতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে আমানতদারী পালন করার জন্য রয়েছে ইহকালীন এবং পরকালীন প্রভূত কল্যাণ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যখন চারটি জিনিস তোমার মধ্যে থাকবে তখন সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। সেগুলো হলোঃ আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, চরিত্র ভাল হওয়া এবং খাদ্য পবিত্র ও হালাল হওয়া।"**

তফসীর ইবনে কাসীর, ১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৮৭

**খেয়ানত মুনাফিকীর লক্ষণ:** মুমিনের মধ্যে আর যত দোষ থাক, খেয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচার থাকতে পারে না। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"চারটি স্বভাব যার মধ্যে আছে সে প্রকৃতই মুনাফিক। যার মধ্যে এ চারটির একটিও আছে, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। স্বভাবগুলি এইঃ সে কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে আর ঝগড়া বাঁধলে অশ্লীল গালমন্দ করে।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং-১১৪

**খেয়ানতের পরিণাম:** খেয়ানতের মাধ্যমে অন্যের হক নষ্ট করা হয়। কাজেই যে ব্যক্তি আমানতের হক অদায় করবে না তার জন্য কিয়ামতের দিন তাকে ধৃত করা হবে এবং খেয়ানতের জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"আল্লাহর পথে জীবন দান (শহীদ) সমস্ত পাপ মুছে ফেলে, কিন্তু আমানতের খেয়ানতকারীকে ক্ষমা করা হয় না। খেয়ানতকারীকে কিয়ামতের দিন আনায়ন করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার আমানত আদায় কর।"**

সে উত্তর দিবেঃ

> **"হে আমার প্রতিপালক ! কোথা হতে এবং কি করে আদায় করব, দুনিয়াতো শেষ হয়ে গেছে"।**

তিনবার তাকে একথা বলা হবে এবং তিনবারই সে এই ধরনের উত্তর দিবে। অতঃপর আদেশ করা হবেঃ

> **"একে হাবিয়া জাহান্নামে নিয়ে যাও। ফেরেশতারা তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে**

নিক্ষেপ করবে। সে একেবারে তলদেশে পৌঁছে যাবে। অতঃপর সেখানে ঐ অমানতের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত আগুণের জিনিস তার দৃষ্টিগোচর হবে। ওটাকে সে উপরে উঠাতে থাকবে। যখন কাছে পৌঁছবে তখন তার পা পিছলে যাবে এবং নীচে পড়ে আবার জাহান্নামের তলদেশে চলে যাবে। পুনরায় উঠবে এবং পুনরায় পড়বে। চিরকাল সে ঐ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।”

তফসীর ইবনে কাসীর, ১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৮৬

জনগণের সাথে খিয়ানতকারী সরকার দোযখের যোগ্য। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

“আল্লাহ্ যেই বান্দাকে মানুষের শাসকরূপে নিযুক্ত করেন, সে যদি তাদের সাথে খিয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন।”

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং-২৬২

Contents



## পরের ধন আত্মসাৎ করা

## (Misappropriate Others Property)

আত্মসাৎ অর্থ অন্যায়ভাবে পরিগ্রহ করা বা বিনা অধিকারে বলপূর্বক দখল করা। পরের ধন আত্মসাৎ বলতে পরের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে নিজের করে নেয়াকে বোঝায়। পারিভাষিক অর্থে নিজ জিম্মায় বা আয়ত্তে থাকা অন্যের কোন জিনিস গোপণে অন্যায়ভাবে অথবা বলপূর্বক দখল করা বা নিজের বানিয়ে নেয়াকে আত্মসাৎ বলে। ইসলামে আত্মসাতকে হারাম করা হয়েছে এবং এটি একটি কবীরা গুণাহ।

মানুষ ধন-সম্পদের প্রত্যাশী এবং সম্পদের মোহ মানুষের চিরন্তন। তবে সম্পদ অর্জন করতে হবে বৈধ পন্থায়। অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করা কোন অবস্থায়ই বৈধ নয়। আত্মসাৎ সম্পদ উপার্জনের একটি অবৈধ পন্থা। আত্মসাৎ বিভিন্ন প্রকার সম্পদে হতে পারে; যেমনঃ গনীমতের মাল, যাকাতের তহবিল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, যৌথ মালিকানাধীন প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ। একজন মুত্তাকী কখনও সম্পদ অর্জনের জন্য আত্মসাতের মত অবৈধ পন্থা বেছে নিতে পারে না বরং সর্বাবস্থায় সে এধরনের উপার্জনকে ঘৃণা করে। কেননা এর ভয়াবহ পরিণতির কথা সে জানে। রোজ কিয়ামতে আত্মসাতকৃত সম্পদ আত্মসাতকারীর জন্য ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সেদিন প্রত্যেক আত্মসাতকারী ব্যক্তিকেই তার আত্মসাতকৃত বস্তু নিয়ে হাজির হতে হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**“যে কেউ আত্মসাৎ করে তবে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে তার আত্মসাতকৃত বস্তু সহ হাজির হতে হবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে যা সে অর্জন করেছে।”**

আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান(৩), আয়াত- ১৬১

এ আয়াতখানি নাযিলের প্রেক্ষাপট বদরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল থেকে কিছু জিনিস চুরি হয়ে যাওয়ার প্রসংগে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা মহাপাপ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। এখানে আত্মসাতকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে সরকারীভাবে বন্টনেরপূর্বে কোন কিছু সরিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন তা তার ঘাড়ে চড়াও হবে যাতে সবার সামনে তার লাঞ্ছণা-গঞ্জনা হতে পারে। অতঃপর আত্মসাতকারী প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের বদলা দোযখের মাঝে পাবে।

এ আয়াতটি যদিও গনীমতের মাল আত্মসাতের ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে তবুও এ নির্দেশনাটি শুধুমাত্র এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তফসীরবিদদের মতে এ আয়াতটি সার্বজনীন এবং সকল প্রকার আত্মসাতই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাই যে কোন ধরনের আত্মসাৎ একটি কবীরা গুণাহ। চাই সে আত্মসাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদেই হোক অথবা সংগৃহীত যাকাতের মালে। চাই

www.waytojannah.com

সে আত্মসাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদে হোক অথবা কারো ব্যক্তিগত সম্পদে। আত্মসাতকৃত ব্যক্তির শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আত্মসাতকারীকে তার আত্মসাতকৃত বস্তু ঘাড়ে নিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হতে হবে। এভাবে তাকে আত্মসাতকারী হিসেবে চিহ্নিত করে সকলের সামনে চরম অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে। এ প্রসংগে একটি মশহুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে। তিনি বলেন,

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি অপরের সম্পদ আত্মসাতের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি এটাকে ভয়ংকর ব্যাপার এবং কঠিন গুণাহের কাজ ঘোষণা করলেন। অতপর তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন চিৎকাররত উট কাঁধে বহন করে নিয়ে আসা অবস্থায় আমি না দেখি। আর সে বলতে থাকবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন (আমার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন)। আমি বলবোঃ তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।”
“কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন আমি এমন অবস্থায় আসতে না দেখি যে, তার ঘাড়ে কাপড়ের গাইট পেচানো রয়েছে। সে আমাকে বলবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবোঃ আমি তোমার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে অবহিত করেছি।”
“তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় না আসে যে, আমি তার ঘাড়ে করে সোনা-রূপার বোঝা বহন করে নিয়ে আসতে দেখি। আর সে আমাকে বলবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলবোঃ আমি আজ তোমার কোন উপকারই করতে পারব না। আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পৌঁছে দিয়েছি।”

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং- ৪৫৮৫

পরিশেষে আত্মসাতকারী ব্যক্তি তার কৃতকর্মের উপযুক্ত বদলা দোযখের মাঝে পাবে। তাফসীর ইবনে কাসীর গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

“যদি কোন পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় অতঃপর ওটা সত্তর বছর পর্যন্ত চলতে থাকে তথাপি জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। আত্মসাতকৃত জিনিস ঐরূপ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আত্মসাতকারীকে বলা হবে- যাও ওটা নিয়ে এস।”

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২০৯

এ হাদিসদৃষ্টে আত্মসাতকারীর পরকালীন শাস্তি যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা অতি সহজেই অনুমেয়। আত্মসাতকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখান থেকে পরিত্রানের কোন রাস্তা খুঁজে পাবে না। গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা সাধারণ চুরির চাইতে কঠিন অপরাধ। তার কারণ

গনীমতের মালের সাথে গোটা ইসলামী সেনা বাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক আত্মসাৎ করবে সে আত্মসাৎ করবে শত সহস্র লোকের সম্পদ। যদিওবা তাওবা করে সংশোধনও করতে হয় তবে সেটাও প্রায় অসম্ভব। কেননা তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যার্পণ করা কিংবা সকলের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া একান্তই দূরূহ ব্যপার।

আত্মসাতের ক্ষেত্র শুধুমাত্র গনীমতের মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা অনেক বিস্তৃত এবং ব্যাপক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আত্মসাৎ হতে পারে সরকারী কোষাগার, যৌথ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদের মধ্যে। এগুলির যে কোন খাত থেকে অন্যায়ভাবে সম্পদ বা অর্থ অপসারণ করা হলে তা আত্মসাৎ বলে বিবেচিত হবে। এসব ক্ষেত্রে এক বা একাধিক ব্যক্তি আত্মসাতের সাথে জড়িত থাকতে পারে। তবে আত্মসাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই অপরাধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। বাস্তবতার আলোকে এসকল ক্ষেত্রে যে প্রকারে আত্মসাৎ সংঘটিত হতে পারে তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

**ক) রাষ্ট্রীয় বা সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ:**

সরকারী কোষাগার থেকে আত্মসাৎ করা বা চুরি করা কঠিন অপরাধ। কারণ এটা মূলত জনগণেরই অর্থ এবং এতে সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক এতে চুরি করে সে লক্ষ-কোটি জনতার অধিকার হরণ করে থাকে। কাজেই ক্ষমাও যদি করাতে হয় তবে কার কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা একটি ভয়াবহ অপরাধ। এতদসত্বেও সমাজে এ ধরনের অপরাধ থেমে নেই। প্রায় সকল সমাজেই এ অপরাধ প্রবণতা কম-বেশী পরিলক্ষিত হয়। তবে এজাতীয় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের বাস্তব পন্থাগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। এ পর্যায়ে মানুষের কাজ-কর্ম ও আচার আচরণের মধ্য দিয়ে যে প্রকারে আত্মসাতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে তার কিছু বাস্তব পরিচয় তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হল:

- জনসাধারণের নামে বরাদ্দকৃত সরকারী অনুদান নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অবৈধভাবে বা গোপণে হস্তগত করা।
- রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য যে টাকা সরকারের কাছ থেকে আসে তার অনেকটাই নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কুক্ষিগত করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতির উপদ্রুত এলাকায় সরকারী অনুদান হকদার না হয়েও অবৈধভাবে ভক্ষণ করা।
- হাসপাতালে জনগনের নামে বরাদ্দকৃত ঔষধপত্র, পথ্য ইত্যাদির টাকা মেরে খাওয়া।
- অফিস-আদালতের উন্নয়ণের খাত ও অন্যান্য খাতের বরাদ্দের টাকা অবৈধভাবে হজম করা।
- সরকারী অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হয়ে নয়-ছয় করে বরাদ্দকৃত অর্থ হস্তগত করা এবং তা অবৈধভাবে নিজের করে নেওয়া।

-  সরকারী হিসাবরক্ষক বা কোষাধ্যক্ষ হয়ে ভুল হিসেব দিয়ে বা নকল ভাউচার বানিয়ে অর্থ কুক্ষিগত করা।
-  সরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রাইভার হয়ে অবৈধভাবে গাড়ীর তেল মেরে খাওয়া।
-  অফিসের যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি নিজের বানিয়ে বাসায় ব্যবহার করা।
-  বিনা অনুমতিতে সরকারী গাড়ী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করা।
-  সরকারী মালামাল ক্রয় ও আমদানির সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভাল মাল ক্রয়ের পরিবর্তে ঐ দাম দেখিয়ে কম পয়সায় খারাপ বা নিম্নমানের মাল ক্রয় করে বাকী অর্থ কুক্ষিগত করা।

এ ছাড়াও সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার আরো অনেক পন্থা বা পদ্ধতি রয়েছে। তবে মূল কথা হচ্ছে, যেখানে আত্মসাৎ হওয়ার সন্দেহ হয় সে কাজটিও পরিত্যাগ করা উচিত।

**খ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাল আত্মসাৎ করা:**

অনেক জনকল্যাণমূলক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলি জনগণের অর্থ ও সরকারী অনুদানের অর্থে পরিচালিত হয়। এর সাথে জড়িত রয়েছে সাধারণ মানুষের হক। এসকল প্রতিষ্ঠানের তহবিল তসরূপ করা হলে সেখানে সাধারণ মানুষের অধিকার বিনষ্ট করা হয়। উদাহরণস্বরূপঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়। এখানে যে অর্থ প্রতিষ্ঠানের নামে অর্জিত হয় সেখান থেকে কারো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার কোন বৈধতা নেই (অবশ্য বেতন-ভাতাদী বাদে)। যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ভুল হিসাব দাখিল করে অথবা অন্য কোন অবৈধ পন্থায় নয়-ছয় করে এ তহবিলের অর্থ অপসারণ করে তাহলে সে শত-সহস্র মানুষের অধিকার হরণ করল। আর এটা বড় ধরণের আত্মসাৎ হিসেবে বিবেচিত। অনুরূপভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি হতে কোন কিছু নিজে ভোগ করাও বড় ধরনের আত্মসাৎ।

**গ) যৌথ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান:**

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একাধিক মালিক থাকে সেটাই যৌথ প্রতিষ্ঠান বা যৌথ কোম্পানী। এখানে সঞ্চালিত হয় একাধিক মানুষের সম্পদ। সে সম্পদ থেকে মালিকদের সর্বসম্মতি ব্যতীত অর্থ খরচ করা বৈধ নয়। মালিকদের সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিস্বার্থে অর্থ অপসারণ করা বা অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে ভুয়া ভাউচার কেটে বাকী অর্থ হজম করা আত্মসাতের একটি প্রকৃষ্ট নমুনা।

**ঘ) ব্যক্তিগত সম্পদ আত্মসাৎ:**

ব্যক্তিগত সম্পদ আত্মসাৎ বলতে বোঝায় কোন এক ব্যক্তি কর্তক অন্যকোন ব্যক্তির সম্পদ চুরি করা বা দখল করা। এ ধরনের আত্মসাতের ঘটনা সমাজে হর-হামেশাই দেখা যায়। এর কিছু প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করা হল:

-  পার্টনারশীপ ব্যবসায়ে সম্পদ গোপণ করে বা পার্টনারকে ঠিকমত ভাগ না দিয়ে তাকে ঠকিয়ে সিংহভাগ অর্থ নিজে নিয়ে নেওয়া। অথবা এ ধরনের ব্যবসায়ে শরীক মারা গেলে এবং তাদের পার্টনারশীপ গোপণ থাকলে তার ওয়ারীসদেরকে ভাগের অর্থ না দেওয়া।
-  শরিকী সম্পত্তি নানা তালবাহানা করে একাই ভোগ করা বা ছল-চাতুরী করে ভূঁয়া দলীল বানিয়ে সম্পত্তি নিজের নামে করে নেওয়া অথবা সে সম্পত্তি বিক্রী করে সমুদয় অর্থ নিজে গ্রাস করা।
-  আল ঠেলে বা সীমানা অতিক্রম করে অন্যের জমি নিজের বানিয়ে নিয়ে তা ভোগ করা।
-  অন্যের জমি চাষ করতে করতে গোপণে নিজের নামে রেকর্ড করে নেওয়া।
-  মানি অর্ডারের টাকা পোস্ট মাস্টার কর্তৃক গায়েব করা বা মেরে দেওয়া।
-  কারো ব্যাংক একাউন্টের নমিনী হয়ে মালিকের মৃত্যুর পরে সে টাকা ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন না করে নিজে হজম করা।
-  ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হয়ে কারো একাউন্ট থেকে টাকা গায়েব করা।
-  কারো আমানতের টাকা বা মাল মেরে দেওয়া। (বিনা অনুমতিতে কারো আমানতের টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে লাভ ভোগ করাও বৈধ নয়)।
-  কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সে টাকা পরিশোধ না করা।
-  স্বর্ণকার হয়ে অন্যের গড়তে দেওয়া অলংকার থেকে স্বর্ণ চুরি করে তার জায়গায় খাদ মিশিয়ে ওজন পরিপূর্ণ করা।
-  দর্জি হয়ে পোষাকের তৈরী করার জন্য বেশী মাপ ধরে বাড়তি কাপড় চুরি করা।
-  দোকান কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বেতনভুগ কর্মচারী হয়ে মালিক কর্তৃক বেঁধে দেয়া দ্রব্য মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে জিনিস বিক্রী করে বাড়তি পয়সা পকেটে ভরা। আবার বিক্রীত মালের পুরো অর্থ ক্যাশে জমা না দিয়ে কিছু অংশ গোপণ করা অথবা গোপণে মালিকের মাল সরিয়ে অন্যত্র সে মাল বিক্রী করে সমুদয় অর্থ নিজের পকেটে ভরা।
-  পরিবহন কর্মচারী হয়ে মালিকের অজান্তে অতিরিক্ত ট্রিপ মেরে পয়সা কামাই করা অথবা নিয়মিত ট্রিপে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে বাড়তি ভাড়ার টাকা মালিককে না দিয়ে নিজের পকেটে ভরা।

এ ছাড়াও আত্মসাতের কত শত পদ্ধতি রয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আত্মসাৎ একটি কবীরা গুণাহ এবং এর জন্য ভোগ করতে হবে পরকালীন কঠিন আযাব। তাই পরকালের মুক্তির জন্য আত্মসাৎ সহ সকল প্রকার কবীরা গুণাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই সকলের জন্য বাঞ্ছণীয়।

## জাসুসী বা গোয়েন্দাগিরী করা/ মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি অসুসন্ধান করা

## (Spying on the Muslims and Pointing Out Their Secrets)

গোয়েন্দোগিরি অর্থ গোপণ অনুসন্ধান সম্পর্কিত কর্ম। গোয়েন্দাগিরির আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে জাসুসী। সাধারণ পরিভাষায় জাসুসী বা গোয়েন্দাগিরি বলতে বুঝায়, মানুষের গোপণ বিষয় তল্লাসী করা। বিশদভাবে বলা যায়, অন্যের গতি-বিধি, কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা নিকট থেকে গোপণে পর্যবেক্ষণ করা ও তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করার নাম গোয়েন্দাগিরি। Websters Encyclopedic Dictionary অনুসারে গোয়েন্দাগিরি হচ্ছেঃ “To keep close and secret watch on the actions and words of another or others.” ইসলামী পরিভাষায় কোন মুমিনের বিনা অনুমতিতে তার বিষয়ে গোপণ অনুসন্ধান চালিয়ে তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাকে জাসুসী বলা হয়। সকল ইসলামী চিন্তাবিদ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, জাসুসী বা গোয়েন্দাগিরি হারাম এবং কবীরা গুণাহ।

গোয়েন্দাগিরির সূত্রপাত হয় সন্দেহ থেকে। অমূলক সন্দেহ একটি বাতিক এবং নিন্দনীয় বিষয়। সন্দেহের উদ্রেক হয় হৃদয়ের গভীরে অরক্ষিত মনের অভ্যন্তরে শয়তানের ওয়াসওসার মাধ্যমে। সে কারণেই অমূলক ধারনাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তার উপর আস্থা স্থাপন করার কোন যৌক্তিকতা নেই এবং এর কোন বৈধতাও নেই। একজন মুমিনের অন্তর থাকে সুরক্ষিত এবং আল্লাহর যিকিরে মশগুল, সেখানে শয়তানের প্রবেশাধিকার সীমিত। তাই মুমিনের অন্তরে সহসা সন্দেহের উদ্রেক হয়না এবং সে আর একজন মুমিনের সম্পর্কে স্বভাবতঃই সু-ধারনা পোষণ করে থাকে। যারা সন্দেহপ্রবন এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে থাকেন, তাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে, তাদের অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা রয়েছে। একজন মুমিন সম্পর্কে সু-ধারনা পোষণ করা মুস্তাহাব এবং কারোপক্ষেই প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য কোন মুসলমানের প্রতি কু-ধারনা পোষণ করা জায়েয নহে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ্ ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে অনুমান বা কু-ধারনা পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেনঃ

**“হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপণীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।”**

আল-কোরআন, সুরা হুযুরাত(৪৯), আয়াত-১২

সকল ইসলামী চিন্তাবিদ এ বিষয়ে একমত রয়েছেন যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা অনুমান বলতে প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন মুসলমানের প্রতি কু-ধারনা পোষণ করাকে বুঝিয়েছেন। অমূলক সন্দেহ বা অনুমান কখনও কখনও একজন নির্দোষ মুমিনের অনেক বড় ক্ষতি করে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ জাতীয় অনুমান বা সন্দেহ প্রবণতা একটি পাপাচার

এবং এ থেকে দূরে থাকাই সকলের জন্য বাঞ্ছণীয়। এ বিষয়ের উপর অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষ অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-২৪৯০

হাদিসের ভাষায় অনুমানকে বড় মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তা থেকে সকলকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে। অনুমান বা সন্দেহ নিজ থেকেই যেমন একটি পাপ, তেমনি তা জাসুসী বা গোয়েন্দাগিরির মত আর একটি মহাপাপের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। কারণ সন্দেহ থেকেই শুরু হয় অনুসন্ধান কার্য। কারো অপ্রকাশিত দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করাই যখন গোয়েন্দাগিরি, তখন তা থেকে বিরত থাকাই সকলের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ কোরআন ও হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী মুমিনের গোপণ বিষয় অনুসন্ধান করা বা গোয়েন্দাগিরি করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

অন্যের গোপণ কথা আড়াল থেকে আড়ি পেতে শোনা, অপ্রকাশ্যে থেকে অন্যের গতি-বিধি গোপণভাবে পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গোয়েন্দাগিরি করা হতে পারে। আবার ঘুমের ভান করে অন্যের গোপণ কথা জেনে নেওয়ার প্রচেষ্টাও একধরনের গোয়েন্দাগিরি। উপায় যেটাই হোক না কেন, জাসুসী বা গোয়েন্দাগিরি একটি নিষিদ্ধ আচরণ।

ইসলামের দৃষ্টিতে গোয়েন্দাগিরির কিছু বৈধ ক্ষেত্রও রয়েছে। নিজের এবং অন্য মুসলমানের কল্যাণ সাধন তথা হেফাযতের উদ্দেশ্যে এবং সমাজকে সমূহ ক্ষতির আশংকা থেকে রক্ষা করার জন্য ক্ষতিকারীর গোপণ ষড়যন্ত্র ও দূরভিসন্ধি অনুসন্ধান করা জায়েয। রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিদ্রোহ ইত্যাদি অপরাধমূলক বিষয় থেকে জনগণ তথা রাষ্ট্রের হেফাযতকল্পে গোয়েন্দাগিরী জায়েয রয়েছে।

সমাজে একশ্রেণীর লোক রয়েছে যারা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বা কারো অমর্যাদা করার লক্ষ্যে মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায়। মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে ফেরাই তাদের অভ্যাস। আবার কিছু লোক রয়েছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য মুসলমানের বদনাম করার জন্য বা বিপদে ফেলার জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কোন মুসলমানের যে দোষ প্রকাশিত নয় তা অনুসন্ধান করা হারাম। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে,**

আল্লাহ্ তার দোষ অনুসন্ধান করেন আর আল্লাহ্ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।”

কুরতুবীর রেওয়াতে তফসীর মা’আরেফুল কোরআন, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৯

www.waytojannah.com

## মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া/ অপবাদ দেওয়া

## (Abusing Muslims)

ইসলাম শান্তি, ভালবাসা আর সহমর্মিতার ধর্ম। মুমিনদেরকে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বন্ধুত্ব বজায় রাখতে এবং কোন প্রকার শত্রুতা ও ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে এমন বিষয় এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মিথ্যাকথন, সন্দেহপ্রবণতা, জাসুসী, গীবত, চোগলখোরী, অপবাদ, উপহাস, গালাগাল বা লানত দেওয়া ইত্যাদির মত মন্দ আচরণ ইসলামী সংস্কৃতি বহির্ভুত বিষয়। বস্তুতঃ এগুলো সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক কবীরা গুণাহ হিসেবে বিবেচিত। কারণ এগুলি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া বিবাদের বীজ বপণ করে এবং তাদের ধ্বংস ডেকে আনে। এগুলি পরিবারবর্গের সাথে, প্রতিবেশীর সাথে এবং আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে বিরোধিতা ও প্রতিকুলতার সৃষ্টি করে। ইসলাম মানবজাতিকে পরস্পরের সাথে দায়িত্বপূর্ণ, আন্তরিক এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দেয়। সেখানে প্রত্যেকেরই অন্যের মান-সম্মান, সুনাম এবং ব্যক্তিগত গোপণীয়তার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া আবশ্যক। ইসলাম আমাদের এ শিক্ষাও দেয় যে, মানুষকে যে শুধু তার নিজের কাজ-কর্মের বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে তা নয়, বরং অন্যান্যদের সাথে আচরণ তথা সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়েও হিসেব নেওয়া হবে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আচার-আচরণে শর'ই বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য করা প্রত্যেকেরই জন্য জরুরী। সাধারণ মুসলমানদের হক, আদব ও আচার-আচরণ সম্পর্কিত রীতি-নীতি বিবৃত হয়েছে কোরআনের বহু জায়গায়। সুরা হুযুরাতে বলা হয়েছে,

**"হে মুমিনগণ! তোমরা একদল আরেকদলকে উপহাস করো না। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারি অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা; ঈমানের পরে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এধরনের আচরণ হতে নিবৃত না হয় তারাই যালিম।"**

আল-কোরআন, সুরা হুযুরাত(৪৯), আয়াত-১১

উল্লেখিত আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে;

**১. কোন মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা**
**২. কাউকে দোষারোপ করা**
**৩. অপরকে মন্দ নামে ডাকা**

অতঃপর বলা হয়েছে যে, ঈমান আনয়নের পরে একজন মুমিনকে মন্দ নামে ডাকা গুণাহের কাজ এবং যারা এধরনের আচরণ থেকে বিরত না হয় এবং তাওবা না করে, তারা যালিম।

প্রথম নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে 'উপহাস'- এর অর্থ পরিহাস, ঠাট্টা, বা নিন্দাসূচক হাস্যকৌতুক। সাধারণ পারিভাষিক অর্থে শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে উপহাস বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় উপহাস হচ্ছে এমন বিষয় যেখানে কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে। এটা সাধারণতঃ মুখের ভাষায় অপমানের ভঙ্গিতে কারো প্রতি বিদ্রুপ করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কখনও কখনও হস্ত, পদ ইত্যাদি দ্বারা ইঙ্গিতের ভঙ্গিতে কিংবা অভিনয়ের মাধ্যমেও হতে পারে। কোন ব্যক্তির দেহ, আকার-আকৃতি, কিংবা গঠন প্রকৃতি বা আচার-আচরণে কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে হাসাহাসি করাও উপহাসের অন্তর্ভুক্ত। উপহাসের মাধ্যমে মুমিন বান্দাদেরকে বেইজ্জত বা অমর্যাদা করা হয় এবং সেটা তার জন্য পীড়াদায়ক। তাই উপহাস করা ইসলামী শরিয়তে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে 'একে অপরের প্রতি দোষারোপ করা'-এর অর্থ অপরের দোষ অন্বেষণ করা, প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে বিদ্রুপ করা বা গালাগাল দেওয়া। এ জাতীয় আচরণ থেকে মুমিনদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে 'অপরকে মন্দ নামে ডাকা'- অর্থাৎ কাউকে অপমানজনক নামে সম্বোধন করা বা কারো এমন উপাধি বের করা যা শুনতে সে অপছন্দ করে। উদাহরণস্বরূপঃ কাউকে তার শারীরিক দোষ-ত্রুটির কারণে খঞ্জ, লুলা, খোঁড়া, লেংড়া অথবা অন্ধ, বধির ইত্যাদি নামকরণ করে সে নামে ডাকা তার জন্য অপমানজনক এবং কষ্টের কারণ বিধায় এভাবে কাউকে সম্বোধন করা জায়েয নহে। আবার কেউ কোন মন্দ কাজে বা মন্দ অভ্যাসে লিপ্ত থাকলে সেই মন্দ কাজের উপাধিতে তাকে ডাকাও হারাম করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ চোর, ব্যাভিচারী, শরাবী, ঘুষখোর, চোগলখোর ইত্যাদি নামকরণ দিয়ে কাউকে সম্বোধন করা বৈধ নয়। অতঃপর বলা হয়েছে, কেউ যখন ঈমান আনয়ন করে মন্দ কাজগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, সেক্ষেত্রে তার অতীত কু-কর্মের জের ধরে তাকে মন্দ নামে ডাকা বা তাকে লজ্জা দেওয়া অথবা হেয় করা গর্হিত কাজ। যারা এধরনের আচরণ থেকে নিবৃত না হয় তাদেরকে কোরআনের ভাষায় যালিম বলা হয়েছে।

মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হারাম এবং স্পষ্ট গুণাহের কাজ। উপহাস করা এবং মন্দ নামে ডাকা ছাড়াও একজন মুসলমানকে আরও নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হতে পারে। অপবাদ এরূপ একটি অন্যতম পীড়াদায়ক আচরণ। অপবাদ অর্থ নিন্দা, দোষারোপ বা দুর্নাম। ইসলামী পরিভাষায় অপবাদ হচ্ছে কারো সম্পর্কে এমন কোন দোষের কথা প্রকাশ করা, যে দোষ সত্যিসত্যি তার মধ্যে নেই। এককথায়, কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করার নাম অপবাদ। এটি একটি চরম মিথ্যাচার যা একজন মুমিনের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। তাই কারো উপর অপবাদ আরোপ করা হলে সেটা তার মনকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একে অন্যের উপর অপবাদ আরোপের বিভিন্ন

বিষয় আমাদের সমাজের নিত্যদিনের বাস্তবতা। এভাবে বিনা দোষে কাউকে শরাবি বলা, চোর বলা, মিথ্যাবাদী বলা, ঘুষখোর বলা, সুদখোর বলা, প্রতারক বলা, হারামি বলা, সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া ইত্যাদি জাতীয় সকল আচরণ মিথ্যা অপবাদ আরোপের মধ্যে শামিল রয়েছে। আবার কারো সম্পর্কে কোন বিষয় না জেনে মন্তব্য করাও অপবাদের অন্তর্ভুক্ত। সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কারো উপর কোন দোষ চাপানো ঠিক নয়, কারণ সেটা অপবাদ হতে পারে। না জেনে অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে ফাসিক, কাফির, বেদ'আতী, মিথ্যাবাদী, নির্বোধ ইত্যাদি বলা হলে অপবাদ দেওয়ার গুণাহ হতে পারে। আলেম শ্রেণীর লোকও এ জাতীয় ভুল করে বসতে পারেন। আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি রাজনৈতিক চর্চা হচ্ছে বিরোধী পক্ষের প্রতি মিথ্যাচার করা এবং তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে জনগণকে নিজের পক্ষে নেয়ার অপচেষ্টা করা। এটা কখনই সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা হতে পারে না। কেননা কোন মুসলমানের উপর অপবাদ আরোপ করা বা মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করা এবং বিনা কারণে আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেওয়া হারাম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

**"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"**

আল-কোরআন, সুরা আহযাব(৩৩), আয়াত-৫৮

আলোচ্য আয়াতে কেউ অপরাধ না করলেও যখন তার উপর সে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়, সেটা অপবাদ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং অপবাদ একটি সুস্পষ্ট গুণাহের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কারো উপর দোষারোপ করার পূর্বে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যাতে কারো উপর অপবাদ আরোপ না করা হয়।

অভিশাপ (Curse) করাও একটি মহাপাপ। অভিশাপের প্রতিশব্দ অভিসম্পাত আর আরবীতে বলে লা'নত। অভিশাপের আভিধানিক অর্থ বঞ্চিত করা বা বিতাড়িত করা। ইসলামী পরিভাষায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুকম্পা ও করুণা থেকে কাউকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায় প্রকাশের নাম অভিশাপ। মুসলমানকে বিনা অপরাধে অভিশাপ করা হারাম। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। শরিয়তের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন মুসলমান অথবা অমুসলিম ব্যক্তিকেও সুনির্দিষ্ট করে অভিশাপ দেওয়া বৈধ নহে। যেমন অমুকের ধ্বংস হোক, অমুকের উপর আল্লাহর গযব পতিত হোক ইত্যাদি বলে অভিশাপ করা যায় না। তবে যে ব্যক্তি তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত জানা যায়, যেমন আবু লাহাব, আবু জাহেল, ফেরআউন, হামাম প্রমুখ কেবল এদের ওপর অভিশাপ করা জায়েয। আবার কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে বিশেষ কোন পাপ কাজের সাথে জড়িত অপরাধীদের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে অভিশাপ দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এভাবে বলা যায় যে, অত্যাচারীর ধ্বংস হোক, মিথ্যাবাদীর ধ্বংস হোক, সুদখোরের ধ্বংস হোক কিংবা পাপাচারীর ধ্বংস হোক ইত্যাদি। কারো অকল্যাণ কামনা করে বদদোয়া করাও অভিশাপের

পর্যায়ভুক্ত। অনেক সময় বাব-মা তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে মনের দুঃখে যে বদদোয়া করে থাকেন সেটা থেকেও বিরত থাকা উচিত। অভিশাপ দেওয়া যে কত বড় পাপ তা কতিপয় হাদিসের মাধ্যমে অতি সহজেই বোঝা যায়। ছাবেত ইবনে দ্বাহহাক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"কোন মুমিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার তুল্য।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ২০৪

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"মুসলিম ব্যক্তি কখনও অভিসম্পাতকারী হতে পারে না।"**

হাদিস, সহীহ তিরমিযী শরীফ, নং ১৯৬৮

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যখন কোন ব্যক্তি কারো উপর লা'নত করে, তখন তা আসমানের দিকে উত্থিত হয়। কিন্তু তা সেখানে পৌঁছাবার আগেই আসমানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন তা পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং যার প্রতি লা'নত দেয়া হয়েছে সেখানে ফিরে যায়। যদি তা লানতের উপযোগী হয় তবে সেখানে পতিত হয়, অন্যথায় লা'নতকারীর উপর গিয়ে বর্তায়।"**

হাদিস, সহীহ আবু দাউদ শরীফ, নং ৪৮২৮

## দায়ুসী

## (Being a Dayyouth)

যে ব্যক্তি তার পরিবারের নারীদের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দেয় বা সমর্থন করে অথবা যে ব্যক্তি যৌনাচারের জন্য নারী সরবরাহ করে থাকে তাকে দায়ুস বলা হয়। আর এ ধরনের সকল আচরণ দায়ুসীর অন্তর্ভুক্ত। একজন পুরুষ হচ্ছে পরিবারের কর্তা। তার অধীনস্তদের হেফাযত করা তার দায়িত্ব। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধি-নিষেধ যেমন তাকে নিজেকে মেনে চলতে হয় তেমনি অন্যদেরকেও দ্বীনের পথে পরিচালিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো তার জন্য জরুরী। তার জন্য এটা মোটেই শোভনীয় নয় যে, সে পরিবারের সদস্যদের অশ্লীলতা আর পাপাচারকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। কেননা যার ভিতরে অশ্লীলতার প্রতি ঘৃণা নেই এবং যে স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ইসলামী বিধান মতে চলতে বাধ্য করে না তার ইহকাল ও পরকালে কোন কল্যাণ নেই এবং সে দায়ুস বলেই বিবেচিত হবে। পরিবারের নারীদের অশ্লীল আচরণের মধ্যে থাকতে পারে পরপুরুষের সাথে বেপর্দায় চলাফেরা করা, বেলেল্লাপনা করা, গোপণ অভিসারে বের হওয়া, যেনা-ব্যাভিচার করা ইত্যাদি। কোন পুরুষ যখন তার অধিনস্ত নারীদের এসব আচরণ প্রত্যক্ষ করে এবং তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়, তাহলে সে দায়ুস নামেই আখ্যায়িত হবে। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি যখন নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের অশ্লীলতার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে বলে অনুমান করে বা এ ধরনের কোন ইঙ্গিত পায়, তখন তাকে সাবধান হতে হবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। অন্যথায়, এ পাপাচার তাকে সহ তার পরিবারের সকলের জন্য পরকালে ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের পথ তৈরী করে দেবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন,

**“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা করা, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ।”**

আল কোরআন, সুরা তাহরীম(৬৬), আয়াত-৬

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে উপদেশের ভঙ্গিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করে বলা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করে। এ নির্দেশনাটি এসেছে মুসলিম পরিবারের কর্তা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। এ আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিজেদের অগ্নি থেকে রক্ষা করার অর্থ- নিজে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা এবং গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা আর পরিবার পরিজনকে রক্ষা করার অর্থ- তাদেরকে আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করানো বা শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর জন্য মুখে ও হাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা অর্থাৎ আল্লাহ্ যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে সব কাজ করতে বাঁধা দেওয়া এবং যে সব কাজ করতে আদেশ করেছেন

সে সব কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনে শাসন করা। এই কর্মপন্থা অবলম্বন করা হলে নিজেও যেমন জাহান্নাম থেকে পরিত্রান পাওয়া যাবে তেমনি পরিবারবর্গকেও তা থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে। আয়াতদৃষ্টে এ মহান গুরু দায়িত্ব পালনের ভার এসে বর্তায় প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের কর্তা ব্যক্তির উপর। তফসীরবিদদের মতে এখানে পরিবার-পরিজনের মধ্যে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং অধীনস্ত দাস-দাসী বা চাকর-নকর সবাই দাখিল রয়েছে।

শর'ই বিশেষজ্ঞদের মতে নিজের পরিবারভুক্ত সদস্যদের আল্লাহর হুকুম পালন করার ও তাঁর নাফরমানী বা অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকার শিক্ষা ও উপদেশ দান করা প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির উপর ফরয। সুতরাং একজন মুসলিম ব্যক্তি তার পরিবারবর্গকে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করার তাকীদ করতে থাকবে। সে তার পরিবারের সদস্যদের সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ যোগাবে এবং সহযোগীতা করবে আর অসৎ কাজ বা অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে শাসন-গর্জন করবে। কিন্তু তা না করে সে যদি পরিবারের সদস্যদের অশ্লীলতাকে বিনাদ্বিধায় মেনে নেয়, তাহলে সে দায়ুস হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘনকারী হিসেবে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

সকল ইসলামী ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, দায়ুসী একটি কবীরা গুনাহ। কোন পাপাচারে লিপ্ত থাকা আর সে পাপাচারে সহযোগীতা করা বা বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেওয়া সমঅপরাধ হিসেবে বিবেচিত। তাই পরিবারের সদস্যরা যখন অশ্লীলতার পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন তাদেরকে বাঁধা প্রদান না করে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া হলে পরিবারের কর্তাও সে অপরাধের মধ্যে শামিল বলে গণ্য করা হয়। এ অপরাধের জন্য জাহান্নামের শাস্তি তার প্রাপ্য হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"তিন প্রকার লোকের জন্য আল্লাহ বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন - ১. দৈনন্দিন মদ্যপানকারী, ২. মাতাপিতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং ৩. দায়ূস অর্থাৎ যে তার পরিবারের সদস্যদেরকে অসৎ কর্মে লিপ্ত জেনেও তা থেকে বাঁধা প্রদান করে না।"**

হাদিস, মেশকাত শরীফ, নং ৩৪৮৮

## দান করে খোঁটা দেওয়া

## (Reminding People of One's Kindness)

স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দেয়ার নাম দান। Websters Encyclopedic Dictionary অনুসারে দান হচ্ছে "Something given voluntarily without charge." সাধারণভাবে গরীব-দুঃখী, মিসকিন বা অভাবীজনকে বিনিময় ছাড়া কোনকিছু প্রদান করাই দান হিসেবে পরিচিত।

ধন-সম্পদ মানুষের কাছে অতি প্রিয় এবং লোভনীয় বস্তু। ধন-সম্পদ ব্যয় করতে স্বভাবতঃই মানুষ কুণ্ঠা বোধ করে। কিন্তু ইসলাম মানুষকে দানশীলতার প্রতি অনুপ্রানিত করে এবং সেই সাথে দানের বিনিময়ে অশেষ সওয়াব হাসিল হওয়ার সুসংবাদ দেয়। দানশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং দান মানুষকে মহানুভব করে তোলে। দান মানুষের সহনশীল, সহমর্মী ও উদার মন-মানসিকতার পরিচয় বহন করে। ধন-সম্পদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষকে শুধু সাময়িক সময়ের জন্য এর তদারকির ভার অর্পণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সম্পদ আল্লাহর পথে অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তায় ব্যয় হওয়াটাই সমীচীন। আল্লাহর পথে ব্যয় করার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে গরীব, মিসকীন, অভাবী এতীম কিংবা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন বা যাঞ্চাকারীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা। এটা এমনই একটি উত্তম ব্যয়খাত যেখানে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ পর্যন্ত পৌঁছে অর্থাৎ এক টাকা ব্যয় করলে সাতশত টাকার সওয়াব হাসিল হতে পারে। দানের এ অশেষ ফজিলত হাসিল করার জন্য দান যথাযথ হওয়া অতি আবশ্যক। দানের কোন বিনিময় গ্রহণ করা যাবেনা এবং দান গ্রহীতাকে কোন প্রকার কষ্টও দেয়া যাবে না। এহসান প্রকাশ না করে দান করা হলে আল্লাহর কাছে অশেষ পুরস্কারের আশা করা যায়। যেমন, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয়না, তাদেরই জন্য তাদের পালন কর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। নম্র কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-২৬২-২৬৩

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। যারা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে দান করে তাদের জন্য রয়েছে পালনকর্তার কাছ থেকে অশেষ পুরস্কার এবং শেষ বিচারের দিন তাদের কোন ভয়ভীতির সম্মুখীন হতে হবে না এবং কোন চিন্তা ভাবনারও দরকার হবে না। তবে এই সাথে দান-খয়রাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কতিপয় শর্তাবলীরও উল্লেখ করা হয়েছে।

**দান কবুল হওয়ার শর্ত:**

উল্লেখিত আয়াত এবং কোরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহ ও হাদিসদৃষ্টে দান-খয়রাত আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। শর্তগুলি নিম্নরূপ:

- **হালাল সম্পদ:** যে ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয় তা হালাল হতে হবে। অবৈধ উপায়ে বা হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ অপবিত্র এবং তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হতে পারে না।
- **সুন্নত তরিকা:** সম্পদ ব্যয় করতে হবে সুন্নত তরিকায় অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সময় কোন হকদারের হক নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অভাবগ্রস্ত ওয়ারিস বা পোষ্যদের বঞ্চিত করে সব ধন- সম্পদ দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ নয়।
- **বিশুদ্ধ খাত:** শরিয়তসিদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। নিজের ধারনামতে কোন কাজকে সৎকাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং খাতটি শরিয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও জরুরী। উদাহরণস্বরূপ: যদি কেউ অবৈধ খেলা-ধুলার জন্য স্বীয় সহায় সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে।
- **অনুগ্রহ প্রকাশ না করা:** দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবেনা অর্থাৎ দানের কথা বলে বেড়ানো চলবে না বা দান করে খোঁটা দেয়া যাবে না।
- **গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া:** দানগ্রহীতাকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া যাবে না অর্থাৎ তাকে ঘৃণিত মনে করা যাবেনা বা তুচ্ছ করা যাবে না এবং তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না যাতে সে নিজেকে হেয় বা ছোট অনুভব করে।
- **খাঁটি নিয়ত:** দানের ক্ষেত্রে নিয়ত সহীহ হওয়া জরুরী। যা কিছু ব্যয় করা হয়, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তা করতে হবে। লোক দেখানোর জন্য বা নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য দান করা হলে সওয়াবের পরিবর্তে গুণাহ হবে।

**দান করে খোঁটা দেওয়া:**

যে ব্যক্তি দান করে সে নিজের উপকারের জন্যই দান করে। অতএব ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারও প্রতি অনুগ্রহ নয় বরং নিজের সওয়াবের জন্যই সে ব্যয় করছে। তাই এমন কোন আচরণ তার জন্য শোভনীয় নয় যা তাকে সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করতে পারে। দান করে খোঁটা দেওয়া এমনই একটি সওয়াব বরবাদকারী আচরণ। সুতরাং দান করে খোঁটা দেওয়া অনুচিত। উপরন্তু দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেলেও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া দরকার। দান করে খোঁটা দেওয়া বলতে বোঝায় দানের কথা বলে বেড়ানো, দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা এবং গ্রহীতাকে হেয় বা ছোট প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি। দান করে কাউকে সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এভাবে বলা যে, আমি

তোমাকে এটা দিয়েছি, ওটা দিয়েছি, তোমার জন্য অমুক করেছি, তোমাকে অমুক বস্ত দিয়েছি, তোমার অমুক সাহায্য করেছি, তোমার অমুক উপকার করেছি ইত্যাদি এবং দানগ্রহীতার কাছ থেকে দানের বিনিময় আশা করা বা তার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করা ইত্যাদি সকল প্রকার আচরণ খোঁটা দেওয়ার মধ্যে শামিল রয়েছে। দান করে গ্রহীতাকে হেয় বা তুচ্ছ মনে করে তাকে কষ্ট দেওয়াও খোঁটা দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। দানের মাধ্যমে যে প্রভুত কল্যাণ সাধিত হয়, খোঁটা দেওয়ার মাধ্যমে তা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা খোঁটা দিয়ে গ্রহীতার মনে কষ্ট দেওয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতের কোন সওয়াব নেই। উপরন্তু দান করে খোঁটা দেওয়া হারাম এবং গুণাহের কাজ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রত বরবাদ করো না।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-২৬৪

এ আয়াতের মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, দান-খয়রাত করে যদি সে অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ানো হয় বা গ্রহীতাকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া হয় তাহলে সে দান অর্থহীন হয়ে যায়। দানের বিনিময়ে যদি গ্রহীতার কাছ থেকে কিছু আশা করা হয় এবং দাতার অনুগত থাকা হলো না কেন বা তার বিভিন্ন কাজে এগিয়ে আসা হলো না কেন ইত্যাদি বলে যদি মনকষ্টের কারণ ঘটানো হয় তো সে দান বরবাদ হয়ে যায়। এহসান প্রদর্শন করা হলে বা খোঁটা দেওয়া হলে দানের সকল মহৎ উদ্দেশ্য ও ফজিলত খতম হয়ে যায়। এই এহসান প্রদর্শনের কাজটি নিজেই এমন কষ্টদায়ক ব্যবহার যা সমস্ত দান খয়রাতকে বিনষ্ট করে দেয় এবং আখিরাতের আযাবের জন্য আমন্ত্রণকারী হয়ে যায়।

**দান করে খোঁটা দেয়ার পরিণাম:**

খোঁটাদানকারীর শেষ পরিণতি অত্যন্ত অশুভ। কিয়ামতের দিন তার জন্য কোন কল্যাণ থাকবে না, না থাকবে তার কোন সাহায্যকারী আর তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু যর (রাঃ) হতে। তিনি বলেছেন যে,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

> **“তিন ব্যক্তির সাথে রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।”**

আবু যর (রাঃ) বলেন,

> **“ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা কারা?”**

তিনি বললেন,

**"তারা হলঃ যে ব্যক্তি টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রী করে।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ১৯৫

অন্য একটি হাদিসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"প্রতারক, ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও উপকার করে খোঁটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"**

হাদিস, সহীহ তিরমিযী শরীফ, নং ১৯১৩

এরূপ আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে উপকার করে খোঁটা দেয়, আর যে মাতাপিতার অবাধ্য হয় আর যে সদা শরাব পান করে, এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"**

হাদিস, সুনানু নাসাঈ শরীফ, নং ৫৬৭৫

দান করে খোঁটাদানকারী নিতান্তই দুর্ভাগা ব্যক্তি। কেননা, যে দান করা হয় নিজের কল্যাণের জন্য, খোঁটা দেয়ার ফলে সে দানের সওয়াব তো বরবাদ হয়েই যায় উপরন্তু তা তার জন্য বয়ে আনে আখেরাতের মহা অকল্যাণ। কাজেই সকলকেই এ খেয়াল রাখতে হবে যাতে দান করে সামান্য খোঁটাদান বা এহসান প্রকাশের ফলে তার দান বরবাদ না হয়ে যায়। তাই আসুন, আর খোঁটাদান করা নয় বরং নিঃস্বার্থভাবে দান-সাদকা করে আখেরাতের কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হই।

## অন্যায় ওসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারীসদের অনিষ্ট করা

## (Harming the Successors Through Wasiah)

ওসিয়ত একটি আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থে, যে কোন কাজ করার নির্দেশ প্রদানকে ওসিয়ত বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর পরে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করার জন্য মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর পূর্বে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়ে থাকে তাকেই ওসিয়ত বলা হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে ওসিয়ত করা জায়েয রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার ১৮০ নং আয়াতের মাধ্যমে ওসিয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর ফরয করা হয়। পরবর্তীতে ওসিয়ত ফরয হওয়া সম্পর্কিত এ নির্দেশটি সুরা নিসায় বর্ণিত মীরাস এর আয়াত দ্বারা মানসুখ বা রহিত করে দেওয়া হয়েছে- এটাই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মত। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যে সব আত্মীয়ের জন্য মিরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসিয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়; সে ফরয রহিত হয়ে গেছে এবং এখন প্রয়োজন বিশেষে এটা মোস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। তবে স্বাভাবিকভাবে সম্পত্তির ওয়ারীসদের জন্য ওসিয়ত করার অনুমতি আর অবশিষ্ট নেই। বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত বিখ্যাত খুতবায় এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে। হযরত আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন,

**“বরকতময় ও প্রাচুর্যময় আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারীসের পক্ষে ওসিয়ত করা জায়েয নয়।”**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২০৬৭

ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় খোতবার হাদিসে একথাও যুক্ত হয়েছে,

**“কোন ওয়ারীসের জন্য সে পর্যন্ত ওসিয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্য ওয়ারীসগণ অনুমতি না দেয়।”**

জাস্সাস এর বরাতে তফসীর মা’আরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড পৃ-৪৮৯

এ হাদিসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা’আলা যেহেতু প্রত্যেক ওয়ারীসের হিস্সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর তাদের জন্য ওসিয়ত করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্য ওয়ারীসগণ ওসিয়ত করার অনুমতি দেয়, তবে যে কোন ওয়ারীসের জন্য বিশেষভাবে কোন ওসিয়ত করা জায়েয হবে।

**ওসিয়তের সার কথা ও এর সীমারেখা:**

শর'য়ী দৃষ্টিতে ওসিয়ত করা জায়েয এবং তা মোস্তাহাব। শরীয়তে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পক্ষে ওসিয়ত করার জন্য যে বিধানাবলী পাওয়া যায় তার সারকথা এবং নির্ধারিত সীমারেখা হলঃ

- ওসিয়ত করা মোস্তাহাব।
- মোট সম্পদের অনুর্দ্ধ এক-তৃতীয়াংশ পরিমান ওসিয়ত করার বৈধতা রয়েছে।.
- কোন ওয়ারীসের জন্য ওসিয়ত করা জায়েয নহে। তবে ওয়ারীসগণের অনুমতিক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য ওয়ারীসের জন্যও ওসিয়ত করা জায়েয রয়েছে।
- যে সব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন নির্ধারণ করেনি তাদের জন্য ওসিয়ত করার অনুমতি রয়েছে। তবে ওয়ারিসগণকে বঞ্চিত করে বা তাদের ক্ষতিসাধন করে ওসিয়ত করার কোন বৈধতা নেই।
- ওসিয়তদাতার পক্ষে ওসিয়ত করার পর জীবিতাবস্থায় তা পরিবর্তন বা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে।
- ওসিয়তদাতা কর্তৃক যদি কোন অন্যায় ওসিয়ত সম্পাদিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় তবে পরবর্তীতে ন্যায়ানুগভাবে সে ওসিয়তের পরিবর্তন সাধন করারও বিধান রয়েছে।

**মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের মূলনীতি:**

শরীয়তের নীতি এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরীয়ত অনুযায়ী তার দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় বা কৃপণতা উভয়টিই নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ রেখে যাওয়া সম্পত্তির সমপরিমান হয়, তবে কেউ ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওসিয়ত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওসিয়ত করে থাকলে এবং তা কোন গোণাহের ওসিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওসিয়ত করে যায় তবুও এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত কার্যকর হবে না। ঋণ পরিশোধ এবং এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মতভাবে ওয়ারীসদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। ওসিয়ত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি বিধি মোতাবেক ওয়ারীসদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন ২য় খণ্ড পৃ-৩০২)।

**ওসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারীসদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা:**

মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করার বৈধতা রয়েছে তবে ওসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারীসদের ক্ষতিগ্রস্ত করা বা তাদের হক নষ্ট করা জায়েয নয়। ওসিয়ত করার মাধ্যমে ওয়ারীসদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবীরা গুণাহ। মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির এমন কোন ওসিয়ত করা বৈধ নয়, যাতে ওয়ারিসদের অনিষ্ট হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

**“যে ওসিয়ত করা হয় তা দেবার পর বা ঋণ পরিশোধের পর যদি তা কারো জন্য অনিষ্টকর না হয়।”**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১২

যে কেউ ওসিয়তের মাধ্যমে ন্যায্য অংশীদারদের বঞ্চিত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল রয়েছেন। তাঁর পাকড়াও থেকে কারো শঙ্কামুক্ত থাকা উচিত নয়, যদিও বিরুদ্ধাচরণের কারণে আল্লাহ্ ইহকালে শাস্তি দিতে নাও পারেন। কিন্তু এসব অমান্যকারীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে পরকালীন কঠিন আযাব। যেমন পবিত্র কোরআনে মিরাসের আয়াত বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে,

**“এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুণে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।”**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৩

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী যে কেউ মিরাসের বিধান অমান্য করবে এবং এ বিষয়ে আল্লাহর দেয়া সীমারেখা উপেক্ষা করবে, তাদের আল্লাহ্ তা’আলা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে এবং লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। মিরাসের বিধান অমান্য করার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে অন্যায্য ওসিয়ত সম্পাদন করা। ওসিয়তের বৈধ সীমা অতিক্রম করে কেউ যদি ওসিয়ত করে, তাহলে যেমন আল্লাহর বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তেমনি তা ওয়ারিসদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ওসিয়তের মাধ্যমে হকদারকে বঞ্চিত করার বা ক্ষতিগ্রস্ত করার কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়ত করা, কোন ওয়ারীসের প্রতি অত্যাধিক ঝুঁকে পড়ে তার জন্য পক্ষপাতমূলক ওসিয়ত করা, কোন নির্দিষ্ট ওয়ারীসকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে অন্য ওয়ারীসদের নামে ওসিয়ত করা অথবা যাতে ওয়ারীসগণ না পায় তার জন্য সমুদয় বা সিংহভাগ সম্পদ ওসিয়ত করে দেওয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত করা হতে পারে। আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় এধরনের আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই কম-বেশী পরিদৃষ্ট হয়। তবে এগুলো গুণাহের কাজ এবং এর শোচনীয় পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তাই প্রত্যেক মৃত্যুপথযাত্রীকেই জীবন সায়াহ্নে এধরনের অনিষ্টকর কার্য থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হওয়া আবশ্যক। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“কোন পুরুষ অথবা মহিলা ষাট বছর ধরে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করল। অতঃপর তাদের মৃত্যু হাজির হলে তারা ওসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারীসদের ক্ষতি করে, এমতবস্থায় তাদের**

**জন্য জাহান্নামের আগুণ অবধারিত হয়ে যায়।”**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ২০৬৪; আবু দাউদ শরীফ, নং ২৮৫৭

এ হাদিসদৃষ্টে অন্যায় ওসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারীসদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হলে তা মানুষের জন্য কত ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে সেটা অতি সহজেই অনুমেয় । মানুষের সারা জিন্দেগীর নেক আমল বরবাদ করে তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে একটি অন্যায় ওসিয়তই যথেষ্ট। তাই ওসিয়ত দ্বারা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা নয় বরং অন্যায় ওসিয়ত থেকে বেঁচে থাকাই সকলের ব্রত হওয়া চাই।

# তকদীরকে অস্বীকার করা

(Disbelieve on Fate/ Denying Predestination)

## তকদীর কি?

তকদীর অর্থ ভাগ্যলিপি বা বিধিলিপি। সাধারণভাবে তকদীর বলতে কপালের লিখনকে বোঝানো হয়ে থাকে। আসলে তকদীর একটি ব্যাপক বিষয়। গোটা মহাবিশ্বই তকদীরের বলয়ে ঘূর্ণায়মান। তকদীর তথা ভাগ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট এক রহস্যময় বাস্তবতা। কোন জিনিস অস্তিত্বে আসার আগেই আল্লাহ্ তা'আলার সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং ঐ জিনিসটি কিরূপে অস্তিত্ব লাভ করবে তা বিস্তারিত লিখে রাখার নাম তকদীর। এভাবে প্রত্যেক মানুষের জন্য তার জন্ম, মৃত্যু, আয়ুস্কাল এবং তার ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সহ জীবনের যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত এবং লিপিবদ্ধ রয়েছে- এরই নাম তকদীর।

তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। তকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে, যে কোন বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর চিরন্তন ইলমে তা রয়েছে, এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এও বিশ্বাস করা যে, মহাবিশ্বে এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, যা আল্লাহ্ তা'আলার ইলমের বাইরে ঘটছে। তকদীরে বিশ্বাস স্থাপন করা একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। ঈমানের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তকদীরে বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই ঈমানদার হতে পারবে না। (১) সে এ কথায় সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে, (৩) মৃত্যুর পর পূনরুত্থানে ঈমান আনবে এবং (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-২০৯২

## তকদীর কি পূর্বনির্ধারিত?

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সহ সব সৃষ্টিকুলের স্রষ্টাই শুধু নন, তিনি তাদের কর্মও নির্ধারণ করে রেখেছেন। অর্থাৎ মানুষের তকদীর তথা ভাগ্যলিপিও আল্লাহর দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। পবিত্র কোরআন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর হাদিসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

**"আমি প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতভাবে সুনির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।"**

আল কোরআন, সুরা কামার(৫৪), আয়াত-৪৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

**“আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা বর্ণনা করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং যিনি পরিমিত করেছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন ।”**

আল কোরআন, সুরা আলা(৮৭), আয়াত-১-৩

আরও বলা হয়েছে,

**“তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর ওর পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।”**

আল কোরআন, সুরা ফোরকান(২৫), আয়াত-২

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা ওলামাগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা’আলা স্বীয় মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক জিনিস প্রকাশিত হবার পূর্বেই আল্লাহ্‌ তা’আলার কাছে লিখিত হয়ে গেছে। পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে,

**“পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসেনা; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।”**

আল কোরআন, সুরা হাদীদ(৫৭), আয়াত-২২

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ভূ-পৃষ্টে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের উপর যে বিপর্যয় এবং বিপদ-আপদ আসে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন বিপর্যয় আসতে পারে না যা কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। তাই যখন কোন বিপর্যয় বা বিপদাপদ আসে তখন বুঝে নিতে হবে যে ওটা হওয়াই নিশ্চিত ছিল। যমীনের বিপর্যয় বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বানিজ্য ঘাটতি, ধন-সম্পদের ক্ষতি ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, জরা-মৃত্যু, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতদৃষ্টে এ সকল বিপদাপদ ও বিপর্যয় তা সংঘটনের পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, দুনিয়াতে যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে তার পরিমান, সময়কাল ও হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ ইত্যাদি এবং মানুষ যা কিছু বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও কল্যাণ-অকল্যাণের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্‌ তা’আলা জ্ঞাত রয়েছেন, এমনকি তিনি মাখলুক সৃষ্টির বহু পূবেই এ সকল লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং সে অনুযায়ী সকল ঘটনা আবর্তিত হচ্ছে।

www.waytojannah.com

বিভিন্ন হাদিসদৃষ্টেও তকদীরের বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা জগৎ সৃষ্টির বহু পূর্বেই তকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - কে বলতে শুনেছি,

**"আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ্ মাখলুকাতের তকদীর নির্ধারণ করেছেন।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-২১০৩

এর পক্ষে আর একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে বলতে শুনেছেন,

**"আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং কলমকে বলেন, 'লিখ'। কলম আরয করল, 'কি লিখব?' উত্তরে আল্লাহ্ বলেন, 'যা কিছু হচ্ছে এবং যা কিছু হবে যেমন আমল, রিযিক, বয়স, মৃত্যু ইত্যাদি সব কিছুই লিখে নাও।' কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। অতঃপর কলমের উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত ওটা আর চলবে না।"**

তফসীর ইবনে কাসীর, ১৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৯১

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দোয়াত ও লিপি সৃষ্টি করেন এবং দুনিয়ায় যত কিছু হবে, সবই লিপিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ কিরূপ মখলুক সৃষ্টি করা হবে, সে কি বয়স পাবে, তার মৃত্যু কখন হবে, তার জীবিকা হালাল কি হারাম হবে, তার আমল ভাল হবে কি মন্দ হবে ইত্যাদি সব কিছুই সৃষ্টির বহু পূর্বেই আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আরও জানা যায় যে, অদৃষ্টে যা কিছু লেখা হয়েছে এটাই চূড়ান্ত। তকদীর নির্ধারিত হয়ে আছে এবং তা অপরিবর্তনীয়; আর তাতে নতুন করে কিছু লেখা হবে না এবং নতুন কিছু সংযোজনও হবে না।

**তকদীর কি মানুষের উপর চাপানো হয়েছে?**

তকদীর কোন চাপানো বিষয় নয়। ইসলামী আকীদায় কোন জবরদস্তি নেই অর্থাৎ মানুষ যা করছে আল্লাহ্ তা'আলা তা করতে বাধ্য করেন, এ জাতীয় কোন আকীদার স্থান নেই। প্রকাশ্যভাবে নেই, অপ্রকাশ্যভাবেও নেই। কেননা তকদীর সৃষ্টি হয়েছে মহান আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানবলে। মানুষের চেষ্টা-তদবীরের শেষ পরিণতি কোথায় তা স্রষ্টার পক্ষে আগেই জানার বিষয়টি তাঁর জাত ও সিফাতের সাথে মানানসই একটি বিষয়। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ কখনোই এই নয় যে, কর্মের ব্যাপারে মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই। বরং তা দ্বারা এটি বোঝা যায় যে, মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত নিজেকে কোন অবস্থানে নিয়ে যাবে সেই গায়েবের খবরও আল্লাহ্ তা'আলা আগেই জানেন এবং তা হবে বলেই তিনি লিখে রেখেছেন।

ইসলামী শরিয়ত ও আকীদা অনুযায়ী মানুষ স্বাধীন। মানুষের যাবতীয় আমলে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটে থাকে অর্থাৎ মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী সকল আমল করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা ভালো ও মন্দ উভয় পথই পরিস্কার করে বাতলে দিয়েছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"আমি কি তাকে (ন্যায় অন্যায়) দুটো পথই দেখায়নি? ।"**

আল কোরআন, সুরা বালাদ(৯০), আয়াত-১০

ভালো ও মন্দ এ দু'টি পথের কোন পথটি মানুষ গ্রহণ করবে সেটা তার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। কোন প্রকার জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজ বিবেচনায় যাবতীয় কাজ-কর্ম পরিচালনা করে থাকে। মানুষ যেমন তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী সকল আমল করে থাকে, তেমনি সে তকদীরের লিখন সম্পর্কে অবগতও নয়; তথাপিও মানুষ কোনভাবেই তার তকদীরকে অতিক্রম করতে পারে না। এটাই তকদীরের রহস্যময়তা। এ রহস্য আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বিশালতার পরিচায়ক। এটা প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর সুপরিব্যপ্ত ইলমের বাইরে কোন কিছুই ঘটেনা এবং কখনো ঘটবেও না। পৃথিবীতে এমন কোন ঘটনা ঘটেনা যার জ্ঞান পূর্বথেকেই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নেই এবং তা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিখিত নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"একটি পাতা কোথাও ঝরে না, যার খবর তিনি জানেন না। মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকণাও নেই, নেই কোন তাজা সবুজ কিংবা শুকনো দ্রব্য যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।"**

আল কোরআন, সুরা আনআম(৬), আয়াত-৫৯

আসমান ও যমীনে এমন কোন জিনিস নেই যার জ্ঞান আল্লাহর কাছে নেই। চেষ্টা তদবীরের দ্বারা কোন মানুষ নিজের অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন আনতে পারবে তা মানুষের নিকট একটি অজানা বিষয় হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা পূর্ব থেকেই সে বিষয়ে অবগত আছেন। এভাবে সারা মখলুকের যাবতীয় কার্যক্রমের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই অবগত রয়েছেন। আর এটাই তকদীরের মূল রহস্য।

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী এবং সে জ্ঞানবলেই তিনি সারা মাখলুকের তকদীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রয়েছেন। আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার বিশালতা মানুষের কল্পণাশক্তিরও উর্দ্ধে। যে কাজটি আল্লাহর জন্য করা সহজ তা মানুষের উপলব্ধিরও সাধ্যাতীত। অনাদিকাল থেকেই মানুষ তার প্রাপ্ত স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছার দ্বারা যে সকল আমল করবে আল্লাহ্ তা'আলা তা জ্ঞাত রয়েছেন। এমনকি লওহে মাহফুজ সৃষ্টি করে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নামে ঐসব তথ্য অগ্রীম লিখেও রেখেছেন। কিন্তু মানুষের স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি খর্ব করেন নি।

কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তারা সবাই তাদের ইচ্ছাশক্তির বলেই নিজ নিজ তকদীর অনুযায়ী আমল করতে থাকবে- এটাই তকদীরের বাস্তবতা।

তকদীর যখন নির্ধারিত রয়েছে তখন আর চেষ্টা করে লাভ কি? এ প্রশ্নটি মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। এর উত্তরে বলা যায় যে, বিশ্বজগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে এসব কিছু সম্পর্কে আল্লাহর জানা থাকা এবং তকদীরে লেখা থাকা মানুষের চেষ্টা সাধনার পরিপন্থী নয়। কারণ যেভাবে মানুষ চেষ্টা করবে, চেষ্টার উপাদান কি হবে, চেষ্টার পরিণাম কি দাঁড়াবে সবই লেখা রয়েছে। সেই চেষ্টা অনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে। যদি কারো তকদীরে সফল হওয়া লেখা থাকে তবে সে সব উপাদানও লেখা রয়েছে, যার মাধ্যমে বা যেভাবে সফলতা আসবে। যেমন পরিশ্রম করা, নিজের বুদ্ধি বিবেক ব্যবহার করা ইত্যাদি। কাজেই চেষ্টা করা তকদীরের পরিপন্থী নয়; বরং এসব কিছুই তকদীরেরই একটা অংশ। তাকদীরে যা লেখা থাকে মানুষ সে অনুযায়ী চেষ্টা তদবীর তথা আমল করে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই সেই রূপ আমল করে থাকে যা সৃষ্টির প্রথম থেকেই আল্লাহর জানা রয়েছে। এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কিছু হাদিস থেকে। একটি হাদিসে এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,

একব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,

> **“ইয়া রাসূলুল্লাহ! বেহেশত ও দোযখ কি নির্ধারিত রয়েছে?”**

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন,

> **“হ্যাঁ।”**

এ ব্যক্তি বলল,

> **“তবে মানুষ আমল কেন করবে?”**

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন,

> **“প্রত্যেকে তার উপযোগী আমলই করে থাকে যা তার কর্মফলস্বরূপ সৃষ্টির প্রথম হতেই আল্লাহর জানা রয়েছে।”**

হাদীস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-২৫১১

অন্য একটি হাদিসে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

> **“যত মানুষ তৈরী হয় প্রত্যেকের জন্য লিখে রাখা হয় যে তার স্থান বেহেশতে বা দোযখে এবং এও লিখে রাখা হয় যে সে বদকার হবে না নেককার হবে।”**

এক ব্যক্তি বলল,

> **“ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে চেষ্টা করার আবশ্যকতা কি? আমরা আমল ছেড়ে দিয়ে সে**

লেখার উপর ভরসা করে থাকিনা কেন?”

তদুত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

**“চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে সে লেখার উপর ভরসা করে বসে থেকোনা। নেক আমলের চেষ্টা করে যেতে হবে। এটাই আল্লাহ্ তা’আলার বিধান। অবশ্য প্রত্যেকের সাধ্যে ঐ লেখাই জুটে আসবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেককারদের দলভুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে তার সাধ্যে নেককারের আমল জুটবে, আর যে ব্যক্তি বদকারের দলভুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে তার সাধ্যে বদকারের আমলই জুটবে।”**

হাদীস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং-২৫১৩

উক্ত হাদিসদ্বয়ের আলোকে বোঝা যায় যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর অবগতি ও নিজ নিজ তকদীর অনুযায়ী আমল করে থাকে। শেষ পর্যন্ত কারা জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে আর কারা চিরতরে জাহান্নামী হবে, ভবিষ্যতের সে খবরও আল্লাহ্ তা’আলার অজানা কোন বিষয় নয়, বরং সেটাও নির্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু তা আমাদের নিকট অজানা একটি বিষয়। আর যেহেতু আমরা তা জানিনা, তাই তকদীরে লেখা আছে একথা বলে হাত-পা গুটিয়ে কর্মহীন অলসতার দিকে ঝুঁকে পড়া কারো পক্ষেই সমীচীন নয়। কেননা তকদীরের প্রতি বিশ্বাসের তাকীদ হচ্ছে, মানুষ প্রথমে কাজ করবে, উপায় উপকরণ গ্রহণ করবে, চেষ্টা সাধনা চালাবে, তারপর পরিণাম ফল আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে। এসব তো আমাদের প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা। তাই আল্লাহর জানার ক্ষেত্র নিয়ে বিতর্কে না জড়িয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, কি পন্থা অবলম্বন করলে মুক্তি মিলবে বলে আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, ডানে-বামে না তাকিয়ে সেই সরল-সোজা পথ বেছে নিয়ে জীবন যাপন করা।

**তকদীরকে অস্বীকার করা:**

তকদীরকে অস্বীকার করার অর্থ তকদীর বা ভাগ্যের লিখন না মানা বা এতে বিশ্বাস না করা। তকদীর তথা ভাগ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা’আলার ইলম বা জ্ঞান দ্বারা সৃষ্ট এবং সংরক্ষিত বিষয়। তকদীর পূর্ব নির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট এবং অবধারিত। মুমিন মাত্রেরই এ বিশ্বাস থাকা জরুরী যে, তকদীর একবিন্দুও রদ-বদল হবার নয়, যার তকদীরে যা আছে সেটা অবশ্যই ঘটবে এবং যা নেই তা কস্মিনকালেও হবার নয়। আর এ বিশ্বাসের ব্যতিক্রম করার অর্থই হল তকদীরকে অস্বীকার করা। যারা মনে করে তকদীর বলতে কিছু নেই বরং মানুষ নিজ প্রচেষ্টা বা কর্মের দ্বারাই সব কিছু অর্জন করতে পারে এবং ভাগ্য বদলে দিতে পারে অথবা যারা বলে তকদীর কোন লিখিত বা পূর্ব নির্ধারিত বিষয় নয় এবং মানুষ নিজেই নিজের আমল দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে-তারাই তকদীরে অস্বীকারকারী। কিন্তু তকদীরের উপর বিশ্বাস না আনা পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না। একটি হাদিসে হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

www.waytojannah.com

**“তকদীর ও ভাল-মন্দের উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না। এমনকি তার নিশ্চিত প্রত্যয় থাকতে হবে যে, যা তার ভাগ্যে ঘটার আছে তা তাকে ছাড়বে না এবং যা তার ভাগ্যে ঘটার নয় তা তাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না।”**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-২০৯১

শরিয়তের দৃষ্টিতে তাকদীরকে যে সরাসরি অস্বীকার করে সে কাফির। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয়ে অস্বীকার করে তারা ফাসিক। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**“প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে মাজুস (অগ্নি পূজারী কাফির) আছে; আর আমার উম্মতের মধ্যে মাজুস তারা যারা তকদীর বলে কিছু মানে না।”**

হাদিস, ইবনে দাউদ শরীফ, নং-৪৬২১

**তকদীরে অস্বীকার করার পরিণতি:**

ইসলামী বিধানে তকদীরে অবিশ্বাস করা কবীরা গুণাহ বলে বিবেচিত। তকদীরে অস্বীকার করা কুফরীও বটে। সেখান থেকে এর পরিণাম অতি সহজেই অনুমেয়। তকদীরে অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্ ও নবীগণের অভিসম্পাত। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“ছয় শ্রেণীর লোককে আমি অভিসম্পাত করছি। আল্লাহ্ তা’আলা এবং সকল নবী (আঃ) এদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। এদের মধ্যে একদল হল আল্লাহ্ নির্ধারিত তকদীর অস্বীকারকারী।”**

হাদীস, তিরমিযী শরীফ, নং-২১০১

তকদীরে অবিশ্বাসীদের উপর দুনিয়তেই বিভিন্ন প্রকারের আযাব আপতিত হবে। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“আমার উম্মতের মধ্যে তকদীরে অবিশ্বাসীদের উপর ভূমিধ্বস ও চেহারা বিকৃতির বিপদ সংঘটিত হবে।”**

হাদীস, তিরমিযী শরীফ, নং-২১০০

তকদীরে অস্বীকারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্নিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**"মাতাপিতার অবাধ্য, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং তকদীরকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"**

হাদিস, আহম্মদ নং ৬/৪৪১

তকদীরে অস্বীকারকারী যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এ বিষয়ের উপর আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে উবাই ইবনে কা'ব, হুযাইফা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে। তারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**"যদি তোমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনাও থাকে এবং তুমি তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ও কর, তাহলেও যতক্ষণ না তুমি সম্পূর্ণরূপে তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার পক্ষ থেকে তা কবুল করা হবে না। জেনে রাখো, যা কিছু তোমার উপর আপতিত হওয়ার তা আপতিত হবেই। কখনও তা তোমাকে ভুল করবে না। আর যা কিছু আপতিত হবার নয়, তা কখনো তোমার উপর আপতিত হবে না। যদি তুমি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"**

হাদিস, সুনানে ইবনে মাজাহ, নং ৭৭

## আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

## (Despondance)

আল্লাহ্ তা'আলা অশেষ মেহেরবান। তিনি তাঁর রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন সারা বিশ্বজাহানকে। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষের এক মুহূর্তও টিকে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের চারপাশে বিরাজ করছে তাঁর দেয়া অগনিত নিয়ামত। পাহাড়, নদী, সাগর, পশু-পাখী, মাঠ-ঘাট, গাছ-পালাপূর্ণ সবুজে ঘেরা ফুলে-ফলে, ধন-ধান্যে, পুস্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাঁর দেয়া নিয়ামতের-ই সাক্ষ্য বহন করে চলছে। আবার এর উল্টো পিঠে বিরাজ করে নানা প্রতিকুলতা আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। রোগ-শোক, বালা-মুছিবত, জরা-মৃত্যু এ সবই আল্লাহর অমোঘ বিধান। মানুষ যখন নির্বিঘ্নে নিয়ামতরাজি ভোগ করতে থাকে, সুখানুভূতি আর আনন্দের হিল্লোলে তার হৃদয় তখন আন্দোলিত হয়। সে আল্লাহর আনুগত্যে থাকে একাগ্রচিত্ত এবং তাঁর স্মরণে থাকে মশগুল। পক্ষান্তরে প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হলে সে সব নিয়ামতের কথা ভুলে যায় এবং তার হৃদয় হয় ব্যাথিত। এ অবস্থায় সে অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়। অধিকন্তু সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা কখনই সঠিক নয়। সঠিক পন্থা হচ্ছে এই যে, যে আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন এবং অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে রেখেছেন সর্বাবস্থায় তাঁর শুকর গোজর করা। কল্যাণকর নিয়ম হচ্ছে এই যে, সুস্থতা এবং সুখের সময় আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা আর দুঃখের দিনেও তাঁকে স্মরণ রাখা এবং তাঁর রহমতের আশা করা। আর উভয়টির মধ্যে সর্বদা সমতা বজায় রাখাইতো সর্বোত্তম।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া হারাম এবং কবীরা গুণাহ। হতভাগ্য কাফের সম্প্রদায় ছাড়া আর কেহই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকতে পারে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা। কারণ আল্লাহর রহমত হতে কেহই নিরাশ হয়না, কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত।"**

আল কোরআন, সুরা ইউসুফ(১২), আয়াত-৮৭

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

**"পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কে নিরাশ হতে পারে?"**

আল কোরআন, সুরা হিজর(১৫), আয়াত-৫৬

এখান থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রহমত থেকে যারা নিরাশ হয় তারা গোমরাহ এবং পথভ্রষ্ট। আর গোমরাহী হচ্ছে সুস্পষ্ট গুণাহের কাজ। জীবনের বাস্তবতায় মানুষকে নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ নিয়েই তো মানুষের জীবন। তবে

বিপদের সময়ে বা দুঃখের দিনে অনেককেই ধৈর্যহারা হয়ে হা-হুতাশ করতে দেখা যায়। এমনকি তারা আল্লাহর উপর ভরসা হারিয়ে ফেলে এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু এ সময়ে হতাশ হবার কিছু নেই। কেননা মানুষের উপর আপদ-বিপদ, বালা-মুছিবত ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার বান্দাদের ঈমান ও আমলের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে বান্দার জন্য কল্যাণ। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-১৫৫

এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা, কিছু ধন-মালের ঘাটতি, কিছু জীবনের ক্ষতি অর্থাৎ নিজের ও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের রোগ-বালাই, মৃত্যু, কখনও ফল ও উৎপাদিত ফসলের ক্ষতি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। এতে ধৈর্য্যশীলদের তিনি উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে নৈরাশ্যবাদীদের উপর শাস্তি অবতীর্ন করে থাকেন।

বিপদাপদ ও কষ্টের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য একটি সুসংবাদ। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে মানুষ বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবুও এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার মঙ্গল। মানুষ স্বভাবতঃই নিজের দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধসমূহ নিজে বুঝতে পারে না। অনেকসময় বান্দা কর্তৃক তার মনের অজান্তে বা অজ্ঞতার কারণে নানাবিধ অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অপরাধ মোচনের জন্য বা পাপরাশি স্খলনের জন্য বিভিন্নভাবে কষ্টের সম্মুখীন করে থাকেন বা বিপদাপদ দিয়ে থাকেন। এটা মুমিন বান্দার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকবে বলে বুঝে নিতে হবে। কারণ এর মাধ্যমেই বান্দা পবিত্র হওয়ার দুর্লভ সুযোগ লাভ করে থাকে। বিপদাপদ দ্বারা যে পাপ মোচন হয়ে থাকে এর দলীল হিসেবে একটি হাদিস উল্লেখ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"কোন মুসলমান কোনরূপ বিপদে পতিত হলে তার পরিবর্তে লোকটির গুণাহর কাফফারা হয়ে যায়। এমনকি ক্ষুদ্র একটি কাঁটাবিদ্ধ হলেও।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৬৩৩৩

অনুরূপ আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তারা উভয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

**“কোন মুমিন ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ ব্যাথা-বেদনা, রোগ-ব্যাধি বা দুঃখ ক্লেশ আসে না, এমনকি চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত- যার বিনিময়ে তার কোন পাপ মার্জনা করা হয় না।”**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৬৩৩৬

সুতরাং জীবনের দুঃখ-কষ্ট আর বিপদাপদকে আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ ও নেয়ামত বলে ভেবে নিতে হবে। কেননা মানুষের কৃত অপরাধ তথা গুণাহ সমূহকে মার্জনা করে দেয়ার এটি ইলাহী ব্যবস্থা এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণা প্রকাশের একটি উপায়। তাই জান, মাল ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ বা কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব হচ্ছে সবর করা ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নেক আমল অব্যাহত রাখা। যে ব্যক্তি সবর করে তাকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয়। বিপদে পড়ে যে ব্যক্তি হা-হুতাশ করে, নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ে, স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে বেড়ায় বা বেপরোয়া হয়ে যায়, সে বস্তুতঃ সবর করেনি এবং তার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

দুঃখ-কষ্ট ভোগের কারণে যেমন মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে, তেমনি বড় বড় অপরাধ সংঘটনের পরেও মানুষ হতাশ হয়ে যেতে পারে। মানুষ কখনও কখনও অন্যায় ও অপরাধ করতে করতে এক পর্যায়ে এসে পৌছে যখন তার মনে অপরাধ বোধ সৃষ্টি হয়। তখন তার ধারনা জন্মে যে, তার অপরাধ আল্লাহ্ তা’আলা কখনই বুঝি ক্ষমা করবেন না। এভাবে সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন ধারনা পোষণ করা কখনই সমীচীন নয়। মানুষ যতই গুণাহ করুক না কেন তবুও সে আল্লাহ্ তা’আলার রহমত হতে নিরাশ হতে পারে না। এদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন,

**“বল, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ্ মানুষের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”**

আল কোরআন, সুরা যুমার(৩৯), আয়াত-৫৩

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহর রহমতের বারিশ বর্ষিত হয়েছে এবং গুণাহগার বান্দাদেরকে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির এক দুর্লভ সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছে অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে নানা গুণাহের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তথা নাযাত প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে আশার বাণী এবং পাপ মোচনের সুসংবাদ। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা’আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি প্রত্যেক বান্দার পাপ ক্ষমা করে থাকেন। কোন বৃহত্তর অপরাধী, কাফির পাপাচারীরও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তবে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তির জন্য

উপযুক্ত শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। আর সে শর্ত হচ্ছে তাওবা। যেমন উক্ত আয়াতের পরেই বলা হয়েছে,

**“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, তৎপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।”**

আল কোরআন, সুরা যুমার(৩৯), আয়াত-৫৪

আল্লাহ্ তা’আলার তাওবার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত। পাপী-তাপী, বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র, আলেম-মুর্খ, কাফির, মুশরিক নির্বিশেষে সকলেই তাওবার দ্বারা আল্লাহর করুণা লাভে ধন্য হতে পারে। তাওবা করলে আল্লাহ্ তা’আলা বান্দার অতীত গুণাহ মাফ করে দেন, চাই সেটা যত বড় গুণাহ্-ই-হোক না কেন। তবে মনে রাখতে হবে যে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাওবা করা জরুরী অন্যথায় তাওবা কবুল হবার নয়। তাওবার উপযুক্ত সময় হল মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। মৃত্যু যন্ত্রণা হাজির হলে বা মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন তাওবা করলে তাতে কোন লাভ হবেনা এবং সে তাওবা আল্লাহর কাছে গৃহীতও হবে না।

আল্লাহ্ তা’আলা যে তাওবা কবুলকারী এবং ক্ষমাশীল সে সম্পর্কে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

**“যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় প্রাপ্ত হবে।”**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১১০

কেউ যখন পাপকার্য করার পরে তাওবা করে অর্থাৎ অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ্ তাকে স্বীয় অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা দ্বারা ঢেকে নেন এবং তার ছোট-বড় সকল গুণাহ মাফ করে দেন; যদিও সে পাপ আসমান, যমীন ও পর্বত থেকেও বড় হয়। কিন্তু তাওবা ছাড়া বড় ধরনের গুণাহ থেকে ক্ষমা পাওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

**“যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে, এবং পরে তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।”**

আল কোরআন, সুরা বুরূজ(৮৫), আয়াত-১০

অনুরূপভাবে কাফির, মুনাফিক ও মুশরিকগণও তাওবা করে সংশোধিত না হলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং পরকালে কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের অতি নিম্নস্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। কিন্তু তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা তাওবা করে সংশোধিত হয়।**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৪৫-১৪৬

কোরআনের এসব আয়াত দ্বারা এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, খাঁটি তাওবার দ্বারা সকল ধরনের অপরাধ থেকে মার্জনা পাওয়া যেতে পারে। একজন মুমিন ভুল করার পরে তাওবার মাধ্যমে নিজেকে শুধরে নেয়ার অপার সুযোগ লাভ করে এবং আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবার আহবান এবং তিনি যে তাওবা কবুল করে থাকেন, বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কিছু হতে পারে না। অবিরাম পাপকাজ করতে করতে একপর্যায়ে যখন কারো বোধোদয় হয়, তখন সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্ যখন তাওবা কবুলকারী এবং করুণার আঁধার তখন কারো পক্ষেই হতাশাগ্রস্ত হওয়া প্রত্যাশিত নয়। বরং এদের উচিত তাওবার মাধ্যমে নিজেকে পরিশোধিত করে নেওয়া ও সবর এবং নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত কামনা করা। আশা করা যায় তারা কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে।

www.waytojannah.com

## আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা বা আল্লাহর শাস্তিকে উপেক্ষা করা

## (Disregard of Allah's Punishment)

আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করা একটি কবীরা গুণাহ। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন,

**"তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে? বস্তুতঃ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তরাই আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিঃশঙ্ক হতে পারে।"**

আল কোরআন, সুরা আরাফ(৭), আয়াত-৯৯

এখান থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, পাপী এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আর কেহই আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে মাহফুজ তথা নিরাপদ মনে করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা মনুষ্য জাতিকে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন করে সকল মাখলুকের সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন ধারনের জন্য দান করেছেন অসংখ্য নিয়ামত। সকলেরই উচিত এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে লেগে থাকা। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু পরকালীন জীবন চিরস্থায়ী। এ দুনিয়া মানুষের জন্য কেবলই পরীক্ষার ক্ষেত্র মাত্র। মানুষের আসল ঠিকানা পরকাল। আখিরাতের অফুরন্ত জীবনের সাফল্য অর্জন করতে হবে দুনিয়ার এ সীমিত সময়ের সদ্ব্যবহার ও নেক আমলের মাধ্যমে।

আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবার অর্থ শঙ্কাহীনভাবে স্বদর্পে আল্লাহর নাফরমানী করা এবং নিঃসঙ্কোচে পাপাচারে লিপ্ত থাকা। পাপকাজ করলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে এ বিষয়টি অনেকেই ভুলে যায়। যারা ঐশ্বর্যের মোহে বেমালুম ভুলে যায় যে, পাপাচার কারো পরকাল বিনষ্ট করে তাকে আখিরাতের কঠিন আযাবের সম্মুখীন করে দিতে পারে তারা যে আল্লাহর শাস্তিকে উপেক্ষা করে চলছে সেকথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ পাপাচারী কখনই আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পারে না। পাপাচারীকে দুনিয়াতে ধন-সম্পদ আর ঐশ্বর্য্য দান করে অবকাশ দেয়া হয় মাত্র। আল্লাহর দেয়া অবকাশকে যারা বুঝতে না পারে তারা খেল-তামাশায় মত্ত হয়ে পার্থিব জীবনে ভোগ-বিলাসকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ ভেবে নেয়। বস্তুতঃ এদের কোন দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা নেই এবং তারা মহাসত্যকে অস্বীকার করে পরকালকে বেমালুম ভুলে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের পাকড়াও অত্যন্ত ভয়াবহ। কোন পাপাচারীই তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পারে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"যারা (পরকালে) আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং যারা পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধেও গাফিল তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। তা একমাত্র তাদের কার্যকলাপের কারণে।"

আল কোরআন, সুরা ইউনুস(১০), আয়াত-৭-৮

আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা এটাও যে, বান্দা পৃথিবীতে বেপরোয়াভাবে জীবন যাপন করবে এবং গুণাহ করতে থাকবে আর গুণাহের জন্য তাওবা করবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। গুণাহের পরে তাওবা করলে আল্লাহকে ক্ষমাশীল পাওয়া যাবে। কিন্তু গুণাহের পরে তাওবা না করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ক্ষমার আশা করবে এটা চরম নির্বুদ্ধিতা এবং গোড়ামিও বটে।

আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার আর একটি দিক হচ্ছে নিজের নেক আমল নিয়ে গর্ব করা এবং নিজেকে নিষ্পাপ মনে করা। অনেকে আছেন যারা নিজের নেক আমল নিয়ে গর্ববোধ করেন এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে মাহফুজ মনে করেন। কিন্তু এটাও অনুচিত বরং সর্বদা আল্লাহর ভয়ে শংকিত থাকা উচিত। আমি বা আপনি যতই নেক আমল করি না কেন তাতে গর্বের কিছুই নেই এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, আমাদের আমলগুলো আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা কবুল করছেন। আর কবুল হয়ে থাকলেও আমরা এ ব্যপারে নিশ্চিত নই যে, আমরা সর্বদা এ জাতীয় আমল করার সুযোগ পাবো কিনা। বস্তুতঃ আল্লাহর রহমত ও করুণা ছাড়া কেহই মুক্তি পেতে পারে না, এ কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার। তাই আমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নেক আমলের উপর টিকে থাকার দু'আ করতে হবে এবং মুক্তি পাবার আশায় তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে হবে।

আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা নিছক বোকামী এবং আহম্মকী বৈ কিছু নয়! আল্লাহর কৌশল থেকে বেড়িয়ে আসার সামর্থ্য কারো নেই। অতীতে অনেক অবাধ্য জনপদকে আল্লাহ্ সুখ-সমৃদ্ধি দান করে অবকাশ দিয়েছেন। তারা যখন এসব পেয়ে গর্বিত হয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে পড়েছে তখনই তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরা আন'আমে বলা হয়েছে,

"অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নসীহত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ-শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে আনন্দিত ও উল্লসিত হলো, তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল।

আল কোরআন, সুরা আন'আম(৬), আয়াত-৪৪

এভাবেই আল্লাহ্ অবাধ্যজনকে অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং হঠাৎই পাকড়াও করে ফেলেন। ধন-সম্পদ আর সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে উল্লসিত হবার কিছু নেই, কেননা এটা আল্লাহর একটি পরীক্ষামূলক নীতি এবং পাকড়াও-এর একটি কৌশল মাত্র। এ সম্পর্কিত একটি হাদিসে ইবনুল আমর (রাঃ) বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যখন তোমরা কাউকে দেখতে পাও যে, সে আল্লাহর নাফরমানী করছে, অথচ আল্লাহ তাকে পার্থিব সুখ-সম্পদে ডুবিয়ে রেখেছেন। তখন তুমি বিশ্বাস করে নাও যে, এটা ছিল আল্লাহর তাকে ঢিল দেয়ার সময় এবং তা শেষ হতে চলেছে।"**

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩

আল্লাহ যে কওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ইচ্ছা করেন তাদের উপর তিনি খিয়ানতের দরজা খুলে দেন এবং যখন সে গর্বিত হয়ে পড়ে তখন হঠাৎ তাকে পাকড়াও করেন। ফলে সে নিরাশ হয়ে পড়ে। অতঃপর ঐ কওমের মূল শিকড় কেটে ফেলা হয়। অহংকারী অবাধ্য সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউই আল্লাহর শাস্তিকে উপেক্ষা করতে পারে না। আল্লাহর দেয়া অবকাশকে নিরাপদ ভেবে যারা ভোগ-লালসায় মত্ত হয়ে থাকে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহর শাস্তি যে কোন সময়ই তাদের উপর আপতিত হতে পারে, যখন তারা ঘুমন্ত থাকবে অথবা দিবাভাগে খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন,

**"লোকালয়ের মানুষগুলো কি এতোই নির্ভয় হয়ে গেছে, আমার আযাব নিঝুম রাতে তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা গভীর ঘুমে বিভোর হয়ে থাকবে, অথবা জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে ধরে নিয়েছে যে, আমার আযাব তাদের উপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না যখন তারা খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে।"**

আল কোরআন, সুরা আরাফ(৭), আয়াত-৯৭-৯৮

আল্লাহর নিয়ামত অবারিত। অবাধ্যজনকেও আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামতরাজী দান করে অবকাশ দিয়ে থাকেন। নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। কেননা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ক্ষণস্থায়ী, যে কোন মুহূর্তেই তা কেড়ে নেয়া হতে পারে এবং আযাবের সম্মুখীন করা হতে পারে। ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, সুখ-সমৃদ্ধি এ সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত। এসকল নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ ভাবে আর আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তারা কি ভেবে নিয়েছে যে, এগুলি তাদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তাদের কোন ধ্বংস নেই অথবা আল্লাহ্ তাদেরকে ধৃত করবেন না বা কৃত অপরাধের শাস্তি দিবেন না? না, এটা কিছুতেই ঠিক নয়। যে কোন মুহূর্তেই তাদেরকে পাকড়াও করা হতে পারে। এ জীবনে না

হলেও পরকালে তাদের এ পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে নিশ্চিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ মরণশীল। জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। তাই মৃত্যু অবধারিত। এ মহাসত্যকে ভুলে গেলে চলবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

**"সকল জীব মাত্রই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই হবে সফল ব্যক্তি। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়"**

আল কোরআন, সুরা আলে ইমরান(৩), আয়াত ১৮৫

মৃত্যু যেমন অবধারিত, কিয়ামত এবং হিসাব দিবসও তেমনি অবধারিত। সকলকেই সেদিন মহাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে অবনত মস্তকে। সেদিন সকল অপরাধীকেই ধৃত করা হবে অত্যন্ত কঠিনভাবে। কেউ কোনভাবেই পাড় পেয়ে যেতে পারবে না এবং কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন,

**"মানুষ কি ভেবে নিয়েছে যে তাকে এমনি লাগামহীন অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে। তোমরা কি মনে করে, আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদের পুণরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবে না?**

আল কোরআন, সুরা ক্বিয়ামাহ(৭৫), আয়াত-৩৬,৪০

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাদের নাফরমানীর কারণে সাথে সাথেই পাকড়াও করেন না। তাদেরকে কিছু কালের অবকাশ দিয়ে রাখেন। অবশেষে কঠোরভাবে পাকড়াও করেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদের তাদের নাফরমানীর জন্য যদি সাথে সাথেই পাকড়াও করতেন তাহলে এ যমীনের বুকে কোন একটি বিচরণশীল জীবকেই তিনি ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এক বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দেন; অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না। যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে; তাদের জিহবা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মঙ্গল তাদেরই জন্য; স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে অগ্নি এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।"**

আল কোরআন, সুরা নাহল(১৬), আয়াত-৬১-৬২

আল্লাহ অবাধ্য, পাপাচারী ও অত্যাচারী যালিমকেও অবকাশ দিয়ে রাখেন এবং তাদের সুখ-সমৃদ্ধি আরো বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর নিয়ামতরাজী ভোগ করার সুযোগ দিয়ে থাকেন। পাপী ব্যক্তি অব্যহতভাবে সুখ-সমৃদ্ধি ও আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করতে পারার ফলে গর্বিত হয়ে পাপকার্যে লিপ্ত থাকার পরেও সে নিজেকে মাহফুজ ও নিরাপদ মনে করে আর বলে যে, তাদের জন্যেই

রয়েছে মঙ্গল। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা দরকার যে, দুনিয়ার সুখভোগই শেষ কথা নয়, এরপরেও রয়েছে পরকালীন অনন্ত জীবন। সে জীবনে অপরাধীরা নিশ্চিত নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিতে এবং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

## আল্লাহর বিধান অনুযায়ী
## বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা না করা
## (Ruling by Laws Other Than the Laws of Islam)

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন এবং শাসন ও বিচার ব্যবস্থা কায়েম থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের উপযোগী সুন্দর একটি বিধান দিয়েছেন। আল্লাহর বিধানের দু'টি মূল উৎসের একটি হচ্ছে কোরআন এবং অন্যটি হচ্ছে সুন্নাহ্। আল-কোরআন হচ্ছে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিধান সহ জীবনের যাবতীয় বিধানের এক পরিপূর্ণ ভাণ্ডার এই আল-কোরআন। আল-কোরআন হচ্ছে মানবতার সেরা সংবিধান। আর বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন আল-কোরআনের এক জীবন্ত মডেল। তিনি আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে রাজনীতি পর্যন্ত শিখিয়ে গেছেন। জীবন থেকে রাজনীতি যেমন বিচ্ছিন্ন নয় তেমনি রাজনীতি থেকে ধর্মকেও আলাদা করা যায় না। কাজেই যারা রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করতে চান তারা আসলে বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাঁর রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্যের জন্য নির্দেশ দান করেছেন। তাই রাজনীতির ক্ষেত্রেও রাসূলের আনুগত্য একান্ত জরুরী। একজন সাধারণ মুসলিম বা মুসলিম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং অনুসারীদের ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে- আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করার চেষ্টা করা এবং সে লক্ষ্যে দেশের সংবিধান তৈরী করা। কিন্তু বাস্তবে আমরা যা দেখছি তা হল, আমাদের দেশে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করেন, তাদের অধিকাংশরাই ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন এবং রাজনীতি তথা শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে অনিচ্ছুক। তারা এটাকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তারা দেশীয় রাজনীতিতে পাশ্চাত্য রাজনীতির অনুসরণ ও অনুকরণেই বেশী আগ্রহী। তাই তারা দেশ পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেয়া নির্দেশিকা আল-কোরআনের আলোকে সংবিধান রচনা না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী পাশ্চাত্য ঢংয়ে বা বিধি-বিধানের অনুসরণে সংবিধান তৈরী করে নিচ্ছেন। চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, হত্যা, ব্যাভিচার, মিরাস, হালাল-হারাম ইত্যাদি সহ আরো অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে মনগড়া আইন ও বিধান রচনা এবং তা সংসদে পাশ করে নিয়ে বিচার কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে। কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ্ যেখানে যাবতীয় আইনের মূল উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার কথা, সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজেরাই আইনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে যারা শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন ও বিধানকে বর্তমান সময়ে অচল ও তা বাস্তবায়নের অযোগ্য বলে উপেক্ষা করে নিজেদেরকে প্রয়োজনীয় আইন রচনা করার যোগ্য বলে মনে করেন এবং সে অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করেন তারা এক মহাপাপের মধ্যে নিমজ্জিত

রয়েছেন। পবিত্র কোরআনে তাদেরকে কাফির, যালিম এবং ফাসিক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

**“আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির।”**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত-৪৪

অতঃপর বলা হয়েছে,

**“আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।”**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত-৪৫

আরো বলা হয়েছে,

**“আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।”**

আল কোরআন, সুরা মায়িদা(৫), আয়াত-৪৭

আল্লাহর দেয়া কল্যাণময় বিধানকে লঙ্ঘণ করে মানব রচিত বিধানের আলোকে বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং তা গ্রহণ করা একটি কবীরা গুণাহ। তবে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন:

**ক.** যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা’আলার বিধান বর্তমান যুগে বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোনোভাবেই উপযোগী নয়, তাহলে সে কাফির। কেননা, সে আল্লাহ্ তা’আলার বিধানকে অস্বীকার করেছে যা নিশ্চিত কুফরী

**খ.** যে বিশ্বাস করে যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা’আলার বিধানের চাইতে মানব রচিত বিধানই বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী, তাহলে সেও কাফির। কেননা, সে মানব রচিত বিধানকে আল্লাহ্ তা’আলার বিধানের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, যা কুফরী।

**গ.** যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা’আলার বিধান যেমন বর্তমান যুগে বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উপযোগী, তেমনিভাবে মানব রচিত বিধানও, তাহলে সে যালিম। কেননা, সে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে যা শির্ক।

**ঘ.** যে মনে করে যে, আল্লাহ্ তা’আলার বিধানই বিচার ও শাসনকার্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিধান; অন্য কোন মানব রচিত বিধান নয়। তথাপিও সে মানব রচিত বিধান মতে বিচার ও শাসন কার্য চালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সত্যিই সে বড় পাপী, নাফরমান। তবে সে কাফের নয়।

মানব রচিত বিধান গ্রহণকারীদেরও কয়েকেটি পর্যায় রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

**ক.** যে এ কথা জানে যে, তার প্রশাসক বা বিচারক আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করছে না। তবুও সে তাদের অনুসরণ করছে এবং এও মনে করছে যে তার প্রশাসক বা বিচারকের বিচারকার্যই সঠিক। তারা যা হালাল বলে তাই হালাল এবং তারা যা হারাম বলে তাই হারাম তাহলে সে কাফির। কারণ সে তার প্রশাসক বা বিচারককে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে যা শির্ক তথা কুফরীও বটে।

**খ.** যে মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিচারই সঠিক, তার বিচারকের বিচার সঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যা-ই হালাল বলেন তাই হালাল আর যা হারাম বলেন তাই হারাম। তবুও সে তার বিচারকের বিচারই গ্রহণ করছে তার কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, তাহলে সে সত্যিই পাপী। কারণ সে স্বার্থ পূজারী। তবে সে কাফির নয়।

**গ.** যে বাধ্য হয়েই শরীয়ত বিরোধী বিচার গ্রহণ করছে, সন্তুষ্ট চিত্তে নয়; তাহলে সে কাফিরও নয়, গুণাহগারও নয়।

(সূত্র: হারাম ও কবীরা গুণাহ, মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ)

## আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ)- এর উপর মিথ্যা আরোপ করা
## (Forging Statements of Allah and His Messenger)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর মিথ্যারোপ করা একটি মারাত্মক গুণাহ। তন্মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা সর্বোচ্চ অপরাধ। চাই তা জেনে হোক অথবা না জেনে। চাই তা তাঁর সত্তা, নাম বা গুণাবলীতে হোক অথবা তাঁর শরীয়তে। আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন গুণে গুণান্বিত করা যে গুণ না তিনি নিজের জন্য চয়ন করেছেন না তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে সম্পর্কে কাউকে বলেছেন; বরং তা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনার বিপরীত, এজাতীয় আচরণ আল্লাহর উপর মিথ্যারোপের অন্তর্ভুক্ত। এর অবস্থান শির্কের পর পরই। আবার কখনো কখনো তা শির্কের চাইতেও মারাত্মক রূপ ধারন করে যখন তা জেনে শুনে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

**"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে এবং তাঁর আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? ।"**

আল-কোরআন, সুরা আনআম(৬), আয়াত-২১

আল্লাহ্ চির সত্য, শ্বাশ্বত। তাঁর অস্তিত্ব সত্য, তাঁর কিতাব সত্য, তাঁর ওয়াদা সত্য। তাঁর রাসূলগণও সত্য যেমন সত্য তাঁর সৃষ্টিকূল। আল্লাহ্ আসমান, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু এবং সারা মখলুকের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মালিক, তিনিই পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, সংহারকর্তা এবং কিয়ামত দিবসের মালিক। সেক্ষেত্রে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা হলে তার সৃষ্টিকেই অস্বীকার করা হয় এবং তা প্রকারান্তে নিজেকে অস্বীকার করার শামিল। তবে নিজেকে অস্বীকার করা যেমন অবাস্তব তেমনি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করাও অবাস্তব এবং অবান্তর। মুমিন হওয়ার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে কতিপয় বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

**"তারা সবাই আল্লাহ্ কে, তাঁর ফেরেশতাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে।"**

আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ্(২), আয়াত-২৮৫

আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা অবিশ্বাসীদের আকিদা। তাই আল্লাহর উপর যারা মিথ্যা আরোপ করে তারা কাফির, মুনাফিক এবং মুশরিক। আলস্নাহ্ তা'আলা বলেন,

**"যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"**

আল-কোরআন, সুরা যুমার(৩৯), আয়াত-৩৯

মক্কার মুশরিকরা বিনা দলীল প্রমাণে আল্লাহর শরীক স্থাপন করে নিয়েছিল এবং তাদের পূজা-অর্চণা শুরু করে দিয়েছিল। তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত, ইয়াহুদীরা উযায়ের (আঃ)-কে এবং খৃস্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) ভাবতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এসব হতে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ্ তাদের এ আকিদাকে খণ্ডন করেছেন এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী ও কাফির আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, তিনি মিথ্যাবাদী ও কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করার অর্থ তাঁর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা, কোরআনকে অস্বীকার করা, তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করা, কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করা এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করা। তবে ঈমানের দাবীতে কোরআন আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে হবে। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ যে ওয়াদা করেছেন তার এক বিন্দুও মিথ্যা হবার নয় বলে জানতে হবে। তাই কারো পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে কোরআনের বাণীকে মিথ্যা বলে জানে বা অস্বীকার করে কিংবা কোন আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে অথবা এর কোন আয়াতকে পরিবর্তন করে বা মনগড়া কোন বিষয়কে কোরআনের তথা আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এমনটি করার পায়তারা যারা করবে, তারা মহা পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর অসন্তোষের কারণ হয়ে প্রত্যাখিত হবে।

**আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করার পরিণতি:**

আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

**"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?"**

আল-কোরআন, সুরা যুমার(৩৯), আয়াত-৬০

এখানে আল্লাহর পবিত্র সত্তার প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করে, তাদের কঠিন পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করা, কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা বলে জানা, বিনা দলিলে আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা ইত্যাদি সকল বিষয়ই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার শামিল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন যে, মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের কারণে কিয়ামতের দিন তাদের মুখ মলিন দেখা যাবে। সত্যকে অস্বীকার করার এবং অহংকার প্রদর্শনের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা বড়ই লাঞ্ছনার সাথে কঠিন ও জঘণ্য  শাস্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের অন্যত্র একই ধরণের শাস্তির উল্লেখ করে আর একটি আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি বলেন,

**"যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি তাদের আবাস নয়?"**

আল-কোরআন, সুরা আনকাবূত(২৯), আয়াত-৬৮

আল্লাহর পবিত্রতা নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে এবং যারা সত্যকে প্রত্যাখান করে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তারা সবচেয়ে বড় যালিম এবং যালিমদের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন জাহান্নামের শাস্তি ।

কোরআনের আর একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারীদের তিনি দুনিয়াতে কিছু দিনের অবকাশ দেন। তারা দুনিয়ায় অল্প কয়েক দিনের সুখ ভোগ করবে মাত্র। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ্ বলেন,

**"তুমি বলে দাও- যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না। এটা দুনিয়ার আরাম আয়েস মাত্র, তৎপর আমারই দিকে তাদের আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।"**

আল-কোরআন, সুরা ইউনুস(১০), আয়াত-৬৭-৭০

সুরা মায়েদার একটি আয়াতে অবিশ্বাসী এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীকে সরাসরি জাহান্নামী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

**"যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারা দোযখী।"**

আল-কোরআন, সুরা মায়েদা(৫), আয়াত-৯

সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ যুগেও যারা বিনা দলীল প্রমাণে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে চলেছেন তারাও মূলত আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং আল্লাহর ক্রোধের কারণ হয়ে আখিরাতের কঠিন শাস্তি খরিদ করে নিচ্ছেন।

**রাসূল (সাঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করার পরিণতি:**

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি সত্যের বাহক ও ধারক। যে কেউ তার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে এক মহাপাপ করে। তাঁর নবুয়াত ও রিসালতকে বিতর্কিত করা, তাঁর কোন বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তাঁর নামে মিথ্যা ও

বানোয়াট বা জাল হাদিস তৈরী করা, তাঁর উপর অহী আসাকে অস্বীকার করা, তাঁর চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করা ইত্যাদি কার্য-কলাপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর মিথ্যা আরোপের অন্তর্গত। তার উপর মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপ এবং এর জন্য পরকালীন কঠিন আযাব নির্ধারিত রয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

**"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন দোযখে তার বাসস্থান নির্ধরণ করে লয়।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং-২৬৫৯

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজ আমাদের মাঝে বর্তমান নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তাই চিরসত্যের বাহক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবিচল বিশ্বাস রেখে তাঁর আদর্শের অনুসরণই সকলের জন্য বাঞ্ছণীয়। মুনাফিক বা মুশরিকদের ন্যায় তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বা বানোয়াট হাদিস তৈরী করা এবং বাতিল হাদিসের অনুসরণ করা কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারে না; উপরন্তু তা আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হিসেবে বিবেচিত।

## জ্যোতিষী বা গণকের কথা বিশ্বাস করা

## (Believing What Soothsayers Say)

জ্যোতিষীরা মানুষের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বিশ্লেষণ করে রাশিফল নির্ণয় বা কুষ্ঠি বিচার করে থাকে এবং কোন কাজের শুভ-অশুভ দিন-ক্ষণের নির্ঘণ্ট তৈরি করে থাকে। আবার হস্তরেখা বিশারদ গণকগণ মানুষের হস্তরেখা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের খবর দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, জ্যোতিষী বা গণককে দিয়ে ভাগ্য গণনা করানো, রাশিফল নির্ণয় করানো, শুভ-অশুভ ক্ষণ নির্ণয় করা ইত্যাদি আগাম খবর জানতে চাওয়া বা তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ফায়দা হাসিলের জন্য তাদের কাছে গমন করা ইত্যাদি সকল আচরণই কবীরা গুণাহ তথা শির্ক। কেননা, কেহ ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখে না, কাল কি হবে জানেনা; ভাল-মন্দ, জয়-পরাজয়, আপদ-বিপদের অগ্রিম খবর কারো কাছে নেই। এ সমুদয় জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ রাখেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

> **"কেহ জানেনা আগামীকাল সে কি অর্জন করবে, কেহ জানেনা কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয় অবহিত।"** .
>
> আল কোরআন, সুরা লুকমান(৩১), আয়াত- ৩৪।

জ্যোতিষী বা গণকের কাছে মানুষের আনাগোনা আমাদের সমাজে প্রতিদিনকার একটি বাস্তব চিত্র। শুভক্ষণ নির্ণয়, ভাগ্যফল এবং ব্যবসা-বানিজ্য, চাকুরী, বিবাহ ইত্যাদি নানা বিষয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ জানতে চেয়ে এদের কাছে মানুষ বিভিন্ন সময়ে ধর্ণা দিয়ে থাকে এবং এদের সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাসও স্থাপন করে থাকে। আবার চোরাই মাল বা হারিয়ে যাওয়া মালের সন্ধান লাভের জন্যও মানুষকে এদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। কিন্তু এ জাতীয় আচরণ নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ এবং কঠিন গুণাহের কারণ। কেননা গায়েবের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাখেন এবং তাছাড়া তিনি তাঁর মনোনীত রাসূলদের যতটুকু প্রদান করেন। কিন্তু জ্যোতিষী, গণক কিংবা অন্য কাউকেই গায়েবের এলেম দেয়া হয়নি। সুতরাং যারা এদের কাছে গমন করেন এবং এদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন তারা বস্তুতঃ অবিশ্বাসী কাফির সম্প্রদায়ভুক্ত। এর সমর্থনে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

> **"যে ব্যক্তি গণকের নিকট আসে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মোহাম্মদ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**-এর উপর যা নাজিল হয়েছে তা অস্বীকার করেছে।"**
>
> হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩৮৬৫।

অদৃশ্য সম্পর্কে জানার জন্য গণকের কাছে আনাগোনা করাও বৈধ নয়। যারা এধরনের কাজ করে তাদের কোন নেক আমল আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়না। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে মুছান্না আনযী (রহঃ) হতে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কয়েকজন স্ত্রীর রেওয়াতে তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গিয়ে তার নিকট অদৃশ্য বিষয় কিছু জিজ্ঞেস করে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল হবে না।"**

হাদিস, মুসলিম শরীফ, নং ৫৬২৯

www.waytojannah.com

## নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া

সন্তান তার পিতার পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। ইসলামে মিথ্যা পিতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনের কোন সুযোগ নেই। জেনে-শুনে নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে পরিচয় প্রদান করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া বা অন্যের সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। ওলামাদের সর্বসম্মত মতামত অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে জানা সত্বেও নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়া কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত।

পিতার উপর সন্তানের এবং সন্তানের উপর পিতার অধিকার বা দাবী ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সম্পর্ক রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষের সাধ্য কি যে এর কোন ব্যতিক্রম করে। মুখের ভাষায় পিতা-পুত্রের পবিত্র সম্পর্ককে যেমন অস্বীকার করা যায়না, তেমনি অন্যের সন্তানকে নিজের পুত্র বলে পরিচয় দিলেও সে পুত্র হয়ে যায় না বা অন্যকে পিতা বললেও সে পিতা হয়ে যায় না। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। এর যেমন কোন হের-ফের হয়না, তেমনি এর ব্যতিক্রম করার প্রচেষ্টাও অপরাধ। সমাজে এক ধরনের বিভ্রান্তিমূলক বিষয় প্রচলিত আছে যে, নিঃসন্তান ব্যক্তি অন্যের সন্তানকে দত্তক নিয়ে পাল-পোষ করে তাকে পিতৃত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন এমনকি তাকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করে ফেলেন। আবার ধর্মপিতা, ধর্মপুত্র গ্রহণের নামেও একধরনের রীতি সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখা উচিত যে, অন্যের সন্তানের প্রকৃত পিতা যেমন হওয়া যায় না তেমনি সে সন্তান তার ওয়ারিশও হতে পারে না।

কোন কোন সন্তান তো এমনও আছে যে, ছোট বেলায় তার পিতা তার প্রতি বহু অবহেলা দেখিয়েছে। এমনকি তার কোন খবরাখবরই রাখেনি। তখন বড় হয়ে সে সন্তান তার পিতাকেই অস্বীকার করে বসে অথবা পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। হয়তো বা সে তার সৎ বাবাকেই আপন বাবা হিসেবে পরিচয় দেয়। এমতাবস্থায় সত্যিই সে মারাত্মক অপরাধী। পিতার কৃতকর্মের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে অবশ্যই; কিন্তু তাতে সন্তানের নিজ পিতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

আবার অনেকসময় পিতা কর্তৃক পুত্রকে বা পুত্র কর্তৃক পিতাকে ত্যাজ্য করার মত ঘটনাও আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয়। পিতা-পুত্রের মাঝে সৃষ্ট এ ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কেউ ইচ্ছা করলেই রক্তের সম্পর্ক মুছে ফেলতে পারে না। এ পবিত্র বন্ধন আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্ট হয়েছে; একে অস্বীকার করা আল্লাহর সাথে নাফরমানী এবং চরম ধৃষ্টতার পরিচয়। যারা এ সম্পর্ককে অস্বীকার করতে বা মুছে ফেলতে চায় তারা এক মহাপাপ করে। এর সমর্থনে একাধিক হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

জেনে-শুনে নিজ পিতাকে অস্বীকারকারী মুমিন বা ঈমানদার হতে পারে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"তোমরা তোমাদের পিতাকে অস্বীকার করোনা। কেননা যে ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে অস্বীকার করবে সে কাফের।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং ৬৩১১

অন্যকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়ার অর্থ নিজ পিতাকে অস্বীকার করা। আর নিজ পিতাকে অস্বীকারকারী সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে বলতে শুনেছেন,

**"যে ব্যক্তি অন্য লোককে পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।"**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং ৬৩১০

## রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা

রিয়া হল প্রদর্শনীর ইবাদত। বিভিন্ন প্রকারের ইবাদতের যে কোনটির চর্চা লোকদেখানো বা লোকের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং কোন প্রকার পার্থিব সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সম্পাদন করাই রিয়া। মানুষ স্বভাবতঃই সঙ্গী-সাথী বা অন্য লোকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে আশা করে এবং পেলে আনন্দিত হয়। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে এই আকাঙ্খা পোষণ করা একটি অপরাধ। কেননা ইবাদতের মূল শর্ত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর সমীপে নিজেকে সমর্পন করা এবং কেবলমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

রিয়ার মূল ভাব হচ্ছে লোকপ্রদর্শন এবং মানুষকে খুশী করার মাধ্যমে প্রশংসা কুঁড়ানো। সেটা হতে পারে ইবাদত বা অন্য কোন নেক আমল করার প্রদর্শনী। রিয়া মুনাফিকের একটি স্বভাব। এদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"তারা কেবল মানুষকে প্রদর্শন করে বেড়ায় এবং আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।"**

আল কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত- ১৪২

রিয়া সম্পাদিত হয়ে থাকে নিয়ত বা মনের আকাঙ্খার ভিত্তিতে। তাই এর কোন বাহ্যিক রূপ নেই এবং এটি একটি গোপণীয় অপরাধ তথা শির্ক। নিয়ত প্রকৃতিজাত এবং এর অনুপ্রেরণা যোগায় অন্তরাত্মা। মনের গভীরে অত্যন্ত সংগোপণ থাকে এর চলাচল। তাই সাধারন মানুষের মত একজন মুমিন ব্যক্তিরও রিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। এ শির্কের গোপনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আবু মুসা আশয়ারি (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রিয়ার প্রকৃত রূপ উৎঘাটিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ভাষণে বলেন,

**"হে লোক সকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো! কেননা এটাতো অন্ধকার রাত্রে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার চলাচলের চেয়েও গোপনীয় ও সুক্ষ্ম।"**

তফসীর ইবনে কাসীর, ১২ খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা

প্রখ্যাত সাহাবাগণ এবং খ্যাতিমান আলেমগণ বিভিন্নভাবে রিয়াকারীদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর মতে রিয়াকারীর পরিচয় এটাই যে, একাকী থাকলে উদাসীন ও অলস হয়ে যায় আর লোকজনের মধ্যে থাকলে সচেষ্ট হয় এবং প্রশংসা করলে অধিক পরিমানে সৎ কাজ করে কিন্তু ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিলে বা নিন্দার সমালোচনা করলে সৎকাজ কমিয়ে দেয়।

হযরত ফযল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন যে, মানুষের সন্তোষ লাভ করার জন্য সৎকাজ করা আর মানুষের অসন্তুষ্টির ভয়ে সৎকাজ পরিত্যাগ করা রিয়াকারী।

রিয়া যেহেতু অত্যন্ত গোপণীয় বিষয়, তাই রিয়ার ইবাদতের অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে মানুষকে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কেবলমাত্র নিয়তের পরিবর্তন করে এ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। সেজন্য সর্বপ্রথমে এ অপরাধ সংঘটনের বাস্তব পন্থাগুলিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। মুসলিমদের আচরিত নিয়মিত ইবাদতের মধ্যে সালাত, রোজা, যাকাত, হজ্জ, কোরবানী, দান-খয়রাত ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলিতে সাধারনতঃ যে উপায়ে রিয়া সংঘটিত হতে পারে তার কিছু বাস্তব উদাহরন তুলে ধরা হল

**সালাত:** মানুষ যখন আল্লাহকে রাজি-খুশী করার পরিবর্তে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে, লোকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সালাত আদায় করে, তখন এটা রিয়ায় পরিণত হয়। এখানে শুধুমাত্র নিয়তের ত্রুটির কারণেই আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়ে থাকে এবং মানুষ অগ্রাধিকার পায়। মানুষ কখনও কখনও ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের জন্য বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য অথবা লোকের ভয়ে বা লজ্জায় ঈমানদার সাজার চেষ্টা করে এবং এই ধরনের প্রদর্শনীর সালাত আদায় করে থাকে। কিন্তু মনে রাখা উচিত আল্লাহর কাছে এই ধরনের সালাতের কোন মূল্য নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন,

> **"সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাতে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে।"**

আল কোরআন, সুরা মাউন(১০৭), আয়াত-৪,৫,৬।

আবার, একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির সালাতও রিয়ায় পরিণত হতে পারে যখন তার মধ্যে লোক দেখানোর মনোভাব লুকায়িত থাকে। এ ধরনের লোকদেখানো এবং বড়াইপূর্ণ সালাত আদায়কারীর উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল গোপন শির্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং এ প্রকারের গোপন শির্ক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সচেষ্ট হবার তাকীদ দিয়েছেন। মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাহির হয়ে বললেন,

**"হে লোক সকল! গোপণ শিরক হতে সাবধান থাক।"**

সাহাবাগন জিজ্ঞেস করলেন,

**"হে আল্লাহর রাসুল! গোপণ শিরক কি?"**

তিনি বললেন,

**"যখন একজন মানুষ সালাতে দাঁড়ায় এবং খুব আগ্রহ সহকারে সুন্দরভাবে সালাত আদায় করে, কারণ মানুষ তার সালাতকে**

**দেখছে, সেটা গোপণ শিরক ।"**

হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ

**রোজা:** রোজা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে রোজাদারদের পুরস্কৃত করবেন। কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রোজা পালন করে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা লোকের ভয়ে রোজা রাখে তখন সেটা রিয়ায় পরিণত হয়। শাদ্দাত বিন আউস (রাঃ) হতে বর্নিত একটি হাদিসে আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি,

**"যে ব্যক্তি অপরকে দেখানোর জন্য সিয়াম বা রোজা রাখল সে শির্ক করল।"**

হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ

**হজ্জ:** এক শ্রেনীর মানুষ আলহাজ্জ্ব খেতাব নিয়ে লোকদের নিকট সম্মানিত হবার জন্য বা ন্যায়পরায়ণ সাজার জন্য হজ্জ্ব পালন করে থাকে। তাদের মূল উদ্দেশ্য সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল। কিন্তু যেই হজ্জ্ব আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় সেটা প্রকারান্তে মানুষের উপাসনা এবং রিয়া বৈ কিছুই নয়। শাদ্দাত বিন আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি,

**"যে ব্যক্তি লোকের নিকট ন্যায়পরায়ন সাজার জন্য বা স্বনামধন্য হবার জন্য হজ্জ পালন করল সে শিরক করল।"**

হাদিস, মুসনাদে আহম্মাদ

**যাকাত:** যাকাত এবং অন্যান্য দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে যদি কোন প্রকার প্রদর্শনীর ইচ্ছা বা 'দানবীর' খেতাব হাসিলের ইচ্ছা পোষণ করা হয় তাহলে সেটা রিয়া। সমাজে একশ্রেণীর মানুষ এভাবে আল্লাহর পরিবর্তে লোকদের খুশী করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট। কারণ এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্র তৈরি করে থাকে। আবার কিছু লোক কোন প্রকার বাস্তব সুবিধা বা লাভ অর্জনের জন্য নয়, মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য বা স্বনামধন্য হবার জন্য দান-খয়রাত করে থাকে; যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য মোটেই থাকেনা বা থাকলেও সেটা গৌণ। যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল বা কোন ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দান করা সওয়াবের কাজ। কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশা ছাড়া অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে, যেমন নামী-দামী হওয়া, খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে বা লোকের স্মৃতিতে অমর হওয়ার জন্য দানের বিনিময় কোন প্রতিষ্ঠানের নামকরণে নিজের বা আপনজনের নামের ব্যবহার করে, তবে এটি রিয়া পর্যায়ের একটি অপরাধ। আল্লাহ্ বলেন,

**“হে মুমিনগন! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করোনা যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে।”**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-২৬৪।

**কোরবানী:** কোরবানীর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা। যদিও বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে কোরবানী অনুষ্ঠিত হয় তবুও মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ আত্মিক। আল্লাহ বলেছেন,

**“আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা ওগুলির গোশ্ত এবং রক্ত বরং পৌঁছে তোমাদের তাক্ওয়া।”**

সুরা হাজ্জ(২২), আয়াত-৩৭।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ কোরবানীর মূল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে লোকপ্রদর্শনীর মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকে। কোরবানীর হাটে তাই প্রতিযোগিতা চলে, কে কত বড় এবং বেশী মূল্যের পশুটি ক্রয় করতে সক্ষম। এবং এই পশুটি কোরবানী করে লোকের প্রশংসা কুড়ায় এবং নিজেকে ধন্য মনে করে থাকে। আল্লাহর সমীপে নিজেকে সপে দেওয়ার অনুভূতিটুকুও সেখানে অনুপস্থিত। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের পরিবর্তে মানুষের প্রশংসা লাভের আকাঙ্খা মূখ্য হওয়াতে এটি রিয়ায় পরিণত হয়।

**রিয়ার পরিণতি:**

রিয়াকারীর শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রিয়ামিশ্রিত মানুষের সকল ইবাদত তথা নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং তা তার আখিরাতকে বিনষ্ট করে দেয়। কেননা রিয়া মিশ্রিত আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; উপরন্তু তা তার জন্য বয়ে আনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। এর পক্ষে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)  কে বলতে শুনেছেন,

**“রোজ কিয়ামতে সর্বপ্রথম একজন শহীদ ব্যক্তির বিচার করা হবে। তাকে হাজির করা হলে আল্লাহ্ তাকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করবেন। লোকটিও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন,**

**“তুমি কি আমল করে এসেছ?”**

**সে বলবে,**

**“আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি।”**

**আল্লাহ্ বলবেন,**

**“তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি যুদ্ধ করেছিলে এই উদ্দেশ্যে যে, লোকগণ তোমাকে বাহাদুর বলবে, তা বলা হয়েছে।”**

এরপর আল্লাহর আদেশে তাকে উপুর করে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর আর এক ব্যক্তির বিচার করা হবে। সে ব্যক্তি নিজে এলেম শিক্ষা করেছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে। কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেছে। তাকে হাজির করে আল্লাহ্ তাকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা জিজ্ঞেস করবেন। সে সেই নিয়ামতসমূহ চিনতে পারবে এবং তা স্বীকারও করবে।

তখন আল্লাহ্ বলবেন,

"এই নিয়ামত লাভের বিনিময়ে তুমি কি করে এসেছ?"

লোকটি বলবে,

"আমি এলেম শিক্ষা লাভ করেছি এবং অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমারই সন্তুষ্টির জন্য কোরআন পাঠ করেছি।"

তখন আল্লাহ্ বলবেন,

"তুমি মিথ্যা বলছ। তুমিতো এলেম শিক্ষা করেছিলে এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তোমাকে আলেম বলবে এবং ক্বারী উপাধিতে ভূষিত করবে। তোমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।"

তখন আল্লাহর আদেশে তাকে উপুর করে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর আর এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যাকে আল্লাহ্ বহু ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে হাজির করতঃ আল্লাহ্ তাকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা বলবেন। সে তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন,

"এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি কাজ করে এসেছ?"

জবাবে লোকটি বলবে,

"তুমি যে সকল স্থান ও যে সকল পাত্রে দান করায় সন্তুষ্ট হও, আমি তার কিছুই বাকি রাখি নাই; বরং সর্বস্থানেই তোমার খুশির জন্য মুক্ত হস্তে দান করেছি এবং অকৃপণভাবে ধন-সম্পদ খরচ করেছি।"

তখন আল্লাহ্ বলবেন,

"তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি দান-খয়রাত এবং সম্পদ ব্যয় এজন্য করেছ যাতে লোকগণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ দাতা বলে অভিহিত করে, তা করা হয়েছে। তুমি দানবীর খেতাবে আখ্যায়িত হয়েছ।"

এরপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ দেয়া হবে এবং সে অনুযায়ী তাকে উপুর করে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৪৭৭১

www.waytojannah.com

এসকল হাদিসদৃষ্টে রিয়া যে মানুষের পরকালকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তা অতি সহজেই অনুমেয়। কাজেই পরকালের সেই কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য সকলকেই রিয়ামুক্ত ইবাদত ও নেকআমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সদা সচেষ্ট থাকা চাই।

# প্রস্রাব থেকে পবিত্র না হওয়া

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। শরীর এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। তাই সকল অপিবিত্রতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সকলের জন্যই বাঞ্ছণীয়। পেশাব একটি অপবিত্র বা নাপাক বস্তু। পেশাবের নাপাকী থেকে নিজেকে হেফাযত করা ঈমানী দায়িত্ব। পেশাবের ছিটা-ফোঁটাও শরীর এবং পরিধেয় বস্ত্রকে নাপাক করে ফেলতে পারে। পেশাবের নাপাকী নিয়ে অযু করলেও পবিত্রতা হাসিল হবে না এবং এ অবস্থায় নামায পড়লে সে নামায আদায় হবে না। পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসিল না করা কবীরা গুণাহ। সঠিকভাবে পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করলে কঠোর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। তাই পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা সকলের জন্যই অত্যন্ত জরুরী।

**প্রস্রাব করার আদব এবং পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসিলের উপায়:**

যত্র-তত্র প্রস্রাব না করে প্রস্রাবের জন্য নির্ধারিত স্থানে অথবা নির্জন স্থানে বসে সতর ঢেকে প্রস্রাব করাই প্রস্রাবের স্বাভাবিক আদব। লোকসমক্ষে বা খোলাখুলিভাবে এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সঠিক নয়।

প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা বলতে বোঝায় প্রস্রাবের পরে এস্তেঞ্জা না করা অর্থাৎ ভালোভাবে পানি দিয়ে পরিস্কার না হওয়া। প্রস্রাব থেকে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার মধ্যে এটিও যে, আপনি প্রস্রাব সেরেই দ্রুত উঠে গেলেন অথচ প্রস্রাবের কয়েক ফোঁটা এখনও থেকে গেছে যা পরবর্তিতে আপনার কাপড়কে নাপাক করে দিচ্ছে অথবা প্রস্রাবের পর আপনি টিস্যু বা ঢিলা কিছুই ব্যবহার করেননি। তাই প্রস্রাবের ফোঁটায় আপনার কাপড় নাপাক হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবারই প্রস্রাব করার পরে সঠিক পদ্ধতিতে পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসিল করতে হবে। প্রস্রাবের পরে এসেত্মঞ্জা করা জরুরী। সাধারণতঃ পবিত্রতা হাসিলের জন্য পানি ব্যবহার করে প্রস্রাবের স্থান পরিস্কার করে নিতে হয়- এটাই এস্তেঞ্জার উত্তম পদ্ধতি। তবে পুরুষের জন্য আরো অতিরিক্ত কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। কেননা পুরুষের প্রস্রাবের নালীতে কিছুটা বক্রতা থাকার জন্য প্রস্রাব শেষ করার পরেও এ নালীতে কিছু পেশাব অবশিষ্ট থেকে যায় যা গড়িয়ে পড়তে অতিরিক্ত সময় লাগে। অতএব আপনি যদি প্রস্রাব শেষ করার সাথে সাথেই পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে পবিত্র হয়ে গেছেন বলে মনে করেন তবে আপনি ভুল করবেন। পবিত্রতা হাসিলের জন্য আপনাকে কিছুটা অতিরিক্ত সময় অপেক্ষা করে পেশাবের শেষ ফোঁটা নির্গত হয়েছে বলে নিশ্চিত হবার পরে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এর জন্য যা করণীয় তা হলো প্রস্রাবের পরে টিস্যু পেপার, ঢিলা বা বৈধ অন্য কিছু ব্যবহার করে কিছু সময় অপেক্ষা করা এবং তার পরে পানি ব্যবহার করা। এ পদ্ধতিটিই পবিত্রতা হাসিলের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে

বিবেচিত। তবে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের পন্থা হিসেবে আমাদের সমাজে প্রায়শঃই একটি অবাঞ্ছিত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। অনেককেই পেশাবের পরে ঢিলা বা পাথর বা পাতা জাতীয় বস্তু ব্যাবহার করে লোকসমক্ষে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায়। এটা একটি নির্লজ্জতা এবং এজাতীয় আচরণ থেকে আমাদের দূরে থাকাই উচিত।

আবার, প্রস্রাব করার সময় যদি পেশাবের ছিঁটা এসে শরীরে কোথাও লেগে যায় বা পরিধেয় বস্ত্রতে লেগে যায় তাহলে শরীর অপবিত্র হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে যে স্থানে বা কাপড়ের যে অংশে পেশাব লেগে যাবে সে অংশটি পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা জরুরী। এভাবে পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাবে।

**পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়ার পরিণাম:**

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। তাই তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। পেশাবের নাপাকি থেকে সঠিকভাবে পবিত্র না হলে তার কোন নামায কবুল হবে না। উপরন্তু পেশাবের অপবিত্রতার জন্য নির্ধারিত রয়েছে কবরের আযাব। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি বাগানের দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময়ে তিনি বললেন,

**"জেনে রাখ, এই কবর দু'টির অধিবাসীদের সাজা দান করা হচ্ছে। অবশ্য কোন কঠিন কাজের জন্য তাদের সাজা দেওয়া হচ্ছেনা।" তারপর তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এদের একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর একজন চোগলখোরী করে বেড়াত।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম নং ৫৭০; সহীহ বোখারী নং ২১৬

সুতরাং কবরের কঠিন আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রস্রাবের ফোঁটা দ্বারা নিজের শরীর অপবিত্র হওয়ার হাত থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের জন্যই জরুরী।

## উচ্চঃস্বরে বিলাপ করা বা শোক-মাতম করা

**"আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।"**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-১৫৫

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবনের প্রকৃত দর্শন। জীবন মানে নিরবিচ্ছিন্ন সুখভোগ নয়। সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণ দিয়েই মানব জীবন পরিবেষ্টিত। সুখময় জীবনে দূঃখের আবির্ভাব ঘটাটাই তাই জীবনের স্বাভাবিক গতি। সুখ-দুঃখের আবর্তন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশেই সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর নেক বান্দাদের বাছাই করে থাকেন। সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা, কিছু ধন-মালের ঘাটতি, কিছু জীবনের ক্ষতি অর্থাৎ নিজের ও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের রোগ-বালাই, মৃত্যু, কখনও ফল ও উৎপাদিত ফসলের ক্ষতি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। এতে ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ। পক্ষান্তরে বিপদে পড়ে যে ব্যক্তি হা-হুতাশ করে, নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ে, আহাজারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে বস্ত্ততঃ সবর করেনি এবং তার জন্য কোন কল্যাণ নেই। তাই আপন জনের মৃত্যু বা নিজের জান, মাল ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ বা কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর করা ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নেক আমল অব্যহত রাখা। যারা নিজের মনকে এই বলে সান্তনা দেয় যে ওটা আল্লাহর অধিকারে রয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ হতেই পৌঁছেছে এবং তিনি ওর মধ্যে যথেষ্ট হেরফের করতে পারেন, তাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয় এবং তারাই সুপথ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"যাদের উপর কোন বিপদ নিপতিত হলে তারা বলে-নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।**

আল কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-১৫৬-১৫৭

অকস্মাৎ বিপদাপদ বা প্রিয়জনের প্রাণহানিতে মানুষের দুঃখ পাওয়াটাই স্বাভাবিক। শোকের কারণে হৃদয় হয় ব্যাথিত আর চোখ হয় অশ্রুসজল। হৃদয়ের অভিব্যক্তি আর চোখের পানি বিসর্জনের মাধ্যমে সাবলিলভাবে শোকপ্রকাশের মধ্যে দোষের কিছু নেই। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

"শুনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের পানি ও শোক ব্যাথার কারণে আযাব দিবেন না। তিনি আযাব দিবেন এর কারণে, (এই বলে তিনি জিহবার দিকে ইশারা করলেন)।"

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং ১২২৬

প্রিয়জন হারনোর ব্যথায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও চোখের পানি ফেলেছেন। উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন,

**"একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কন্যা যয়নব (রাঃ)-এর এক সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে খবর দেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে উপস্থিত হলে যয়নব (রাঃ) বাচ্চাকে তাঁর কোলে সমার্পণ করেন। এসময় বাচ্চার মৃত্যুকষ্ট হচ্ছিল, যা দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চোখ থেকে পানি বেড়িয়ে আসে।"**

**তখন সাদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন,**

**"এটা কি?"**

**নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,**

**"এতো রহমত, আল্লাহ্ যার অন্তরে চেয়েছেন এ রহমত রেখে দিয়েছেন।"**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩১১২

চোখের পানি এক প্রকার রহমত। যার অন্তরে রহমত নেই তার চেখেও পানি নেই। আর যার অন্তরে রহমত আছে, আপনজন হারানোর ব্যাথায় তার চোখ হয়ে ওঠে অশ্রুসজল। চোখের পানি হৃদয়ের শোকানুভুতির বহিঃপ্রকাশ। নিরবে-নিভৃতে চোখের জল ফেলা বা স্বাভাবিক কান্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই দুঃখ প্রকাশের শর'ই আদব। কিন্তু শোকের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অস্বাভাবিক কিছু আচরণ করা বা সীমালঙ্ঘন করা সমীচীন নয়। উচ্চস্বরে বিলাপ করা, চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, আহাজারি করা, বুক চাপরানো, হাত-ছোড়া বা শোক-মাতম করা ইত্যাদি বিষয়গুলি শোক প্রকাশের সীমালঙ্ঘনকারী অচরণ হিসেবে বিবেচিত। এজাতীয় আচরণ না জায়েয এবং কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। এর পক্ষে অনেকগুলি হাদিস পাওয়া যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

**"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাপকারী এবং বিলাপ শ্রোতা নারীদের উপর অভিশাপ করেছেন।"**

হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩১১৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন

**“যারা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে গলা চাপরায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়াত যুগের মত চীৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।”**

হাদিস, সহীহ বোখারী শরীফ, নং ১২১৭

আবু মালেক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“বিলাপকারী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তবে রোজ কিয়ামতে তাকে দাঁড় করানো হবে। তখন তার দেহে আলকাতরা মাখানো থাকবে এবং তাকে অমসৃণ লোহার পোশাক পড়িয়ে দেয়া হবে।”**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ১২১৭

## শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর জুলুম অত্যাচার ও প্রতারণা করা

## (Opression & Deception on the Part of the Ruler)

রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্টিত হন তাদের কর্তব্য হল সত্য ও ন্যায়ের সাথে দেশ পরিচালনা করা এবং জনগণের হিত সাধন করা। জনগণের স্বার্থ বিরোধী কোন কার্য-কলাপ করা তাদের পক্ষে শোভনীয় নয় এবং সেটা কারো কাঙ্খিতও নয়। জনগণের সমর্থন নিয়ে যখন কেউ ক্ষমতায় আসেন তখন জনগণের কল্যাণ সাধন করা এবং তাদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করাই তাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির জন্য তার অধিনস্তদের ওপর যুলুম করা অথবা তাদের কোন ব্যাপারে ধোঁকা দেওয়া কখনই জায়েয নয়, বরং তা কবীরা গুণাহগুলোর অন্যতম। কোন ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

**"শুধু তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা (শাস্তি) গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।"**

আল-কোরআন, সুরা শুরা(৪২), আয়াত নং ৪২

এখানে জালিমের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। জালিম হতে পারে ব্যক্তি পর্যায়ের কোন একজন মানুষ অথবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শাসন কর্তৃপক্ষ। কোন শাসকশ্রেণী যখন জনগণের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যার্থ হয় বা জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে ভেঙ্গে চুরিমার করে দেয় তখন সে ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব ক্ষমতাসীন সরকারকেই নিতে হয়। আবার সরকার যখন স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করে এবং জনগনের সুখ-শান্তি কেড়ে নেয় বা জনদুর্ভোগের সৃষ্টি করে তখন সেটা শাসক কর্তৃক জনগনের উপর নির্যাতন বলেই বিবেচিত হয়। জনগনের উপর শাসক শ্রেণীর জুলুম ও অত্যাচার সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর উপরও হতে পারে আবার ব্যক্তি পর্যায়েও হতে পারে। যে ধরনের আচরণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠদের কাছ থেকে জনগণের উপর জুলুম হিসেবে বিবেচিত হয় তার কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হল:

- শাসকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্নসাৎ করা
- জনগণের উপর অতিমাত্রায় করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া
- জনগণের সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা ভঙ্গ করে ফেলা
- জনগণকে অযথা হয়রানি করা
- জনগণের উপর অযথা পুলিশী নির্যাতন চালানো
- মিথ্যা মামলা দায়ের করে কাউকে জেল-হাযতে প্রেরণ করা
- শাসনের নামে স্বেচ্ছাচারিতা করা

- জনগণের স্বাধীনতা খর্ব করা
- শাসন ব্যবস্থায় দলীয়করণ করা এবং অন্যের অধিকার খর্ব করা
- পক্ষপাতিত্ব করা এবং দলীয় স্বার্থে অযোগ্য লোকদের নিয়োগ দেয়া
- বিচার ব্যবস্থাকে দলীয়করণের মাধ্যমে ন্যায় বিচারকে বাধাগ্রস্ত করা
- রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ইত্যাদি।

এ জাতীয় সকল আচরণ শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনগণের ওপর জুলুমই বটে। যুলুমকারী যেই হোক না কেন আল্লাহ্ জুলুমবাজদের পছন্দ করেন না এবং তার জন্য নির্ধারিত রেখেছেন পরকালীন কঠিন আযাব।

শাসকশ্রেণী হচ্ছে রাষ্ট্রের জনগণের ওপর দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ। তারা সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে ব্যর্থ হলে রোজ কিয়ামতে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে মাকিল (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

**“যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনগণের দায়িত্ব লাভ করলো এবং তার মৃত্যু হল এ অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ্ তা’আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।”**

হাদিস, সহীহ বুখারী শরীফ, নং ৬৬৬৬

অপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হাসান বসরী (রহঃ) হতে। তিনি বলেন যে, মাকিল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

**“কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ তা’আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না।”**

হাদিস, সহীহ বুখারী শরীফ, নং ৬৬৬৫

যালিম শাসকরা কি মনে করেছে জুলুম করে তারা পার পেয়ে যাবে? না, কখনই নয়। তারা ঠিক সময়ে আল্লাহর হাতে ধৃত হয়ে যাবে। তাদেরকে যদিও এ দুনিয়ায় কিছুদিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরকালে তারা কঠিনভাবে পাকড়াও হবে, এতে সন্দেহ নেই। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলছেন,

**“তুমি কখনো ভেবোনা যে আল্লাহ্ যালিমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন। তিনি তো তাদের শুধু এমন একটি দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেই দিন তাদের চক্ষুগুলো বিস্ফোরিত হবে, ভীত বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটোছুটি করবে, নিজেদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরবে**

**না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য।”**

আল-কোরআন, সুরা ইব্রাহীম(১৪), আয়াত নং ৪২,৪৩

ক্ষমতাসীনদের ভাবতে হবে যে, তাদের মধ্যে জুলুম, অত্যাচার, প্রতারণা বা ধোঁকা জাতীয় কার্যকলাপ রয়েছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সময় থাকতে সেগুলো পরিহার করে জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্রত নেওয়া উচিত।

সবশেষে ‘কবীরা গুনাহ ও গীবত’ গ্রন্থের প্রণেতা প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ইমাম আয্যাহাবী (রহঃ)-এর একটি মন্তব্য, “হে যুলুমবাজ অত্যাচারী শাসক! মনে রাখবে, তোমার কারাগার হচ্ছে জাহান্নাম আর ভয়াবহ কবর হচ্ছে তোমার হাযতখানা। দীর্ঘস্থায়ী হিসাব নিকাশ ও জবাবদিহিতার জন্য তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন তোমার বিচারক। সেখানে তুমি কোন আপত্তি পেশ করতে পারবে না। সুতরাং নিজেকে সে সব শাস্তি থেকে বাঁচাও।”

# চাঁদাবাজি করা

চাঁদাবাজি হচ্ছে বিনিময়হীন অর্থ উপার্জনের একটি অবৈধ পন্থা। চাঁদাবাজি অর্থ জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা। কোন প্রভাবশালী চক্র অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক কাউকে তার বৈধ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট পরিমান চাঁদা দিতে বাধ্য করাকে চাঁদাবাজি বলা হয়। চাঁদাবাজিতে অন্যের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়। প্রত্যেক মানুষেরই বৈধ উপায়ে এবং নিরাপদে সমাজে বসবাস করার হক রয়েছে। সেখানে অনাকাঙ্খিত বা অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। চাঁদাবাজি এমনই একটি বিষয় যা মানুষের সে অধিকার খর্ব করে। এর ফলে তার নিরবিচ্ছিন্ন জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয় এবং শান্তি বিনষ্ট হয়। চাঁদাবাজি একটি জুলুম। তাই চাঁদাবাজি নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে চাঁদাবাজি একটি কবীরা গুণাহ।

চাঁদাবাজির ঘটনা আমাদের সমাজে নতুন কোন বিষয় নয়। বিভিন্ন সময়ে চাঁদাবাজির অনেক ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তবে অধিকাংশ চাঁদাবাজি হতে দেখা যায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিরীহ মানুষদের উপর চাঁদাবাজি করা হয়। আবার কখনো পেশী শক্তির ব্যবহারও দেখা যায়। সমাজের কিছু বল্লাহীন শৃংখলমুক্ত ও অভয় চিত্ত  মাস্তান রয়েছে তারা সাধারনত চাঁদাবাজি সহ অন্যন্য অপকর্মের সাথে জড়িত থাকে। এ ছাড়াও আইন শৃংখলা বাহিনীর কিছু অসাধু সদস্যকেও এ জাতীয়  কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। এ পর্যায়ে আমাদের সমাজে বাস্তবে যে সকল ক্ষেত্রে চাঁদাবাজি সংঘটিত হতে দেখা যায় তার কিছু অতি পরিচিত রূপ উপস্থাপন করা হল:

- কোন স্থানে নতুন বাড়ি তৈরী করার সময় বাড়ীর নির্মান কাজে বাঁধা প্রদান করে মালিকের কাছ থেকে জোরপূর্বক মোটা অংকের চাঁদা আদায় করা।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে চাঁদা উসুল করা।
- হাটে বাজারে দোকান মালিকদের হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায় করা।
- ফুটপাতে বসা দোকানীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করা।
- বিয়ের গাড়ি আটকে দিয়ে জোরজুলুম করে চাঁদা আদায় করা।
- রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ী আটক করে চাঁদা আদায় করা।
- কোরবানীর হাটে বিক্রেতাদের কাছ থেকে জোরজবরদস্তি করে চাঁদা উসুল করা।
- কাউকে অপহরণ করে আপনজনদের কাছ থেকে মুক্তিপণের টাকা উসুল করা।
- ঠিকাদারীর কাজ বন্ধ করে দিয়ে বা ভয়-ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করা।

এই শ্রেণীর চাঁদাবাজদের শ্রেণীভুক্ত লোক তারাও যারা দাপট দেখিয়ে দোকান থেকে জিনিস নিয়ে মূল্য পরিশোধ করে না। আবার অনেকে ভদ্রতার মুখোশ পড়ে টাকা ধার নেওয়ার নাম করে চাঁদাবাজি করে।

এছাড়াও চাঁদাবাজির রয়েছে আরো অনেক রূপ। অনেক সময় চাঁদা না পেলে চাঁদাবাজরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং নানাভাবে অত্যাচার করে। এমনকি কখনওবা জানের হুমকি দেয়। এভাবে চাঁদাবাজরা আল্লাহর বান্দাদের উপর জুলুম ও শোষণ চালায়। তারা মানুষের কষ্টার্জিত বৈধ অর্থ কেড়ে নেয়। কত নিকৃষ্ট যালেম তারা!

তবে যুলুম করে এ দুনিয়াতে পার পেয়ে গেলেও আখিরাতে চাঁদাবাজরা  রেহাই পাবে না। সেদিন তাদেরকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। আল্লাহ্‌ বলেন,

**"কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। বস্তুতঃ এদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"**

আল কোরআন, সুরা শূরা(৪২), আয়াত-৪২

হাদিসের মাধ্যমেও জানা যায় যে, অবৈধ চাঁদা আদায়কারীর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

**"অবৈধ চাঁদা আদায়কারী জাহান্নামে যাবে"**

হাদিস, সিলসিলাহ সহীহাহ, নং ৩৪০৫

চাঁদাবাজরা যে জোরপূর্বক চাঁদা আদার করে তা তাদের বৈধ প্রাপ্য নয়। এখানে জুলুম করে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়। তাই তাদের এ উপার্জন সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হারাম। জুলুমের সহায়তা করাও জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। তাই চাঁদা উত্তোলনকারী, চাঁদা ভোগকারী এবং চাঁদা আদায়ে সাহায্যকারী সবাই সমঅপরাধী। জুলুমের সহায়তা দু'ভাবে হতে পারে- প্রথমতঃ প্রত্যক্ষভাবে চাঁদাবাজের পক্ষে ঝুঁকে পড়া এবং তাদেরকে জুলুম করতে উৎসাহিত করা কিংবা কাজে-কর্মে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতা থাকা সত্বেও চাঁদাবাজ জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ানো, এটা পরোক্ষভাবে জালিমের সহায়তাই করা হয়। তবে জালিমের সহায়তাদানকারীর শেষ পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। পবিত্র কোরআনে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

**"তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়োনা তথা তাদেরকে যুলুমের সহযোগীতা করো না, অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুণ স্পর্শ করবে।।"**

আল কোরআন, সুরা হুদ(১১), আয়াত-১১৩

আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার দম্ভে চাঁদাবাজির মত জুলুম করে এ পৃথিবীতে রেহাই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু পরকালে এ দম্ভ কোন কাজে আসবে না। সেখানে এ জুলুম অন্ধকার রূপে দেখা দিবে এর প্রতিফল হিসেবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই জুলুমের পথ পরিত্যাগ করে কল্যাণের পথে ফিরে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

## পুরুষের সাথে নারীর এবং নারীর সাথে পুরুষের সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা গ্রহণ

## (Women Appearing Like Man & Vice-Versa)

পুরুষ ও নারী এক মানব জাতি হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিগতভাবেই এদের মধ্যে বেশ কিছু বৈষম্য রয়েছে। অনেক বিধি-বিধান উভয়ের জন্য সমান। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্যও রাখা হয়েছে। বেশভুষার ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে সেই পার্থক্য। পোশাক-আশাক বেশভূষার একটি অংশ। পোশাক শুধু সৌন্দর্য বর্ধনকারী জিনিস নয়; বরং পোশাক মানুষের আব্রু-ইজ্জত রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি বস্তু। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সতর ঢাকা ফরয। এ জন্য তাই পোশাক পরিধান করাও অত্যাবশ্যকীয়। পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী থেকে শুরু করে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত; পক্ষান্তরে নারীর সমস্ত শরীরই সতরের অন্তর্ভুক্ত। আবার পুরুষের ক্ষেত্রে পোষাক টাকনু গিঁরার উপর পর্যন্ত থাকা জরুরী কিন্তু নারীর জন্য টাকনু গিঁরা আবৃত করাই জরুরী।

পুরুষের সাথে নারীর কাঠামোগত পার্থক্যের কারণে পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বেশভূষায়ও সে পার্থক্য বজায় রাখাটাই স্বাভাবিক এবং জরুরীও বটে। তাই নারী যদি পুরুষ সাজতে যায় আর পুরুষও যদি নারী সাজার আকাঙ্খা করে তবে সেটা হবে প্রকৃতি বিরুদ্ধ একটি কাজ। আর প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয়।

পুরুষের সাথে মহিলার এবং মহিলার সাথে পুরুষের যে কোনভাবে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন সাদৃশ্য বজায় রাখা একটি হারাম কাজ। চাই তা পোশাক-আশাকে হোক অথবা চাল-চলনে কিংবা কথা-বার্তায়। পুরুষের অনুকরণে মহিলা এবং মহিলাদের অনুকরণে পুরুষের পোশাক পরিধান করা বা বেশ ধারণ করা কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। মহিলা এবং পুরুষের পোষাকে যে স্বাতন্ত্র রয়েছে সেটাকে বজায় রেখে চলাই সমীচীন। মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও কথা-বার্তায় শালীনতা থাকা আবশ্যক। মেয়েদের জন্য উত্তম পোশাক হচ্ছে স্যালোয়ার কামিজ ও চওড়া ওড়না যাতে শরীরের সকল অংশ ঢেকে রাখা সম্ভব। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য শাড়ী পড়াও শালিন। তবে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে শরীরের কোন অংশ অনাবৃত না থাকে। আবার ফিনফিনে পাতলা শাড়ী পরিধান করাও অনুচিত যাতে শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে এমন সব আটসাট পোষাকও পরা বৈধ নয় যাতে শরীরের প্রতিটি ভাজ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ছেলেদের প্যান্ট-সার্ট, গেঞ্জী, ক্যাপ ইত্যাদিও মেয়েদের পরা উচিত নয়। আবার পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে মিনি স্কার্ট, হাফ প্যান্ট ইত্যাদি ব্যাবহার করারও কোন বিধান শরীয়তে নেই। ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের মাথার চুল ছোট করা বা বয় কাট করা বিধি সম্মত নয়। পুরুষের ন্যায় বুক ফুলিয়ে হেলে দুলে মেয়েদের চাল-চলনও আপত্তিকর। আবার কিছু বিষয় আছে সেগুলো যদিও বা ছেলেদের অনুকরনে না করা হয়, তবুও তা শরিয়তে অবৈধ করা হয়েছে। যেমন: সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য শরীরে উলকি উৎকীর্ণ করা, ভ্রু প্লাক করা, দাঁত সরু করা ও দাঁতের

মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা ইত্যাদি কাজগুলি জায়েয নয়। যারা এ জাতীয় কাজ করে তাদের প্রতি আল্লাহ্ লানত করেছেন। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্নিত হয়েছে আলকামা (রাঃ) হতে। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন,

**"সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে যে সব নারী অঙ্গ-প্রতঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে, যে সব নারী ভ্রু উপড়ে ফেলে এবং যে সব নারী দাঁত সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে- যা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করেন।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৫৫১৪

পুরুষের ক্ষেত্রে নারীর অনুকরণে বেশভূষা গ্রহণ করার প্রতিও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্বর্ণের আংটি, গলায় চেইন, কানে দুল বা অন্য কোন অলংকার পরিধান করা, নারীর পোষাক পরা কিংবা টাকনু ঢেকে কাপড় পরা ইত্যাদি বিষয়গুলি পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। আবার দাড়ি কামানো এবং মোচ লম্বা করা সুন্নতের খেলাপ এবং না-জায়েয কাজ। অনুরূপভাবে ছেলেদের বা পুরুষের মাথার চুল মেয়েদের ন্যায় লম্বা রাখা এবং পিছন দিকে ঝুঁটি বাঁধা ইত্যাদি শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ।

যে সমস্ত পুরুষ ও নারী বিপরীত লিঙ্গের অনুসরণে বেশভূষা গ্রহণ করে তাদের জন্য দুঃসংবাদ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন হাদিসে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে,

**"রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **নারীদের পোশাক পরিধানকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের পোশাক পরিধাণকারী নারীদের উপর লা'নত করেছেন।"**

হাদিস, সুনান আবু দাউদ, নং ৪০৫৬

অনুরূপ আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

**" নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **ঐ সব পুরুষকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐ সব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৫৪৬৫

## পুরুষের স্বর্ণ ও সিল্ক ব্যবহার করা

## (Men Wearing Silk and Gold)

পোষাক এবং স্বর্ণ এ দু'টোই মানুষের সৌন্দর্য বর্ধন করে। তবে পোষাক যেমন নারী ও পুরুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, অলংকার তেমনটা জরুরী নয়। অলংকার শুধুই শোভা বর্ধনকারী জিনিস। তাই অলংকার শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই শোভনীয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেক্ষেত্রে পোষাক এবং অলংকার ব্যবহারেও পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও সিল্ক ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে কিন্তু নারীর জন্য তা হালাল বা বৈধ করা হয়েছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে তাই পুরুষের স্বর্ণ ও সিল্কের ব্যবহার কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। অলংকার হিসেবেই হোক আর অন্য যে কোন পন্থায়ই হোক পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় হারাম। তদ্রুপ সিল্কের বেলায়ও এই একই কথা প্রযোজ্য।

পুরুষের স্বর্ণ ও সিল্ক ব্যবহারের নিষিদ্ধতার উপর বেশ কিছু হাদিস পাওয়া যায়। আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক এবং স্বর্ণালংকার ব্যবহার অবৈধ এবং স্ত্রীলোকদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৬৬৫

অনুরূপ আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হতে। তিনি বলেন,

**"রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **তাঁর বাম হাতে রেশমী বস্ত্র এবং ডান হাতে স্বর্ণ নিলেন, অতঃপর সেগুলো সহ দু'হাত উপরে তুলে বললেনঃ আমার উম্মতের পুরুষের জন্য এ দু'টো হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।"**

হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ, নং ৩৫৯৫

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

**"নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **আমাদের সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও মিহিন রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও তাতে বসতে বারণ করেছেন ।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৫৪১৯

রেশমী কাপড় পরিধান প্রসংগে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইমরান ইবনে হিত্তান (রহঃ) হতে। তিনি বলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"দুনিয়ায় রেশমী কাপড় সেই ব্যক্তিই পরবে, যার আখিরাতে কোন অংশ নেই।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৫৪১৭

উপর্যুপরি হাদিসগুলি থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। আমাদের সমাজে অধিকাংশ পুরুষ মানুষকেই স্বর্ণ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেককেই বিভিন্ন রকম স্বর্ণালংকার পরিধান করতে দেখা যায়। যেমন, গলায় স্বর্ণের চেইন, কানে স্বর্ণের দুল, আঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি বা হাতে স্বর্ণের ব্রেসলেট ইত্যাদি। কেউ হয়ত ফ্যাশন করার জন্য স্বর্ণ পরে, আবার কেউ হয়ত সখের বশে; কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে যে, শর্তহীনভাবেই পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সখের বশে স্বর্ণ পরার কোন বিধানও আর অবশিষ্ট থাকে না। পরকালীন কল্যাণের জন্য তাই সকলকেই স্বর্ণ ও সিল্ক বা রেশম ব্যবহার না করার প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

www.waytojannah.com

## প্রাণীর প্রতিকৃতি অংকন করা ও ছবি টানানো
## (Putting Pictures of Beings)

কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি অংকণ করা এবং ছবি সংরক্ষণ করা না-জায়েয এবং কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণী বলতে এখানে মানুষ সহ অন্যান্য যে কোন জীব-জন্তু ও পশু-পাখীকে বোঝানো হয়েছে।

প্রাণীর ছবি সংরক্ষণ করা কিংবা ছবি বাঁধিয়ে ঘরের দেয়ালে টানিয়ে রাখার চর্চা আমাদের সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কম-বেশি দেখা যায়। এটাকে তারা এক ধরনের সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করে থাকে। অনেকে প্রয়াত বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে তাদের ছবি খুব যত্নের সাথে সংরক্ষণ করেন এবং প্রদর্শণের জন্য ড্রইং রুম বা অন্য কোন কক্ষে সাজিয়ে রাখেন। অনেককেই আবার প্রিয় নেতা-নেত্রী কিংবা প্রিয় তারকার ছবি দিয়ে ড্রইং রুম সাজিয়ে রাখতে দেখা যায়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ছবির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্বা নিবেদনের জন্য ছবি সংরক্ষণ করা এবং এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা এক ধরনের মূর্তি পূজার শামিল।

প্রাণীর ছবি অংকনের উপর শরীয়তে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যারা প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করে তাদের জন্য পরকালীন কঠিন আযাবের ঘোষণা এসেছে বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে। একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যারা প্রাণীর ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবেঃ তোমরা যা বানিয়েছ তা জীবিত কর।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ , নং ৫৫২৭

অনুরূপ আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে ব্যক্তি কোন ছবি বানায়, সে যতক্ষণ তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে না পারবে ততক্ষণ আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন। অথচ সে কখনও তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না।"**

হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৬৯৫

আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আয়শা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন,

**"রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন। আমি আমার কক্ষে পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গিয়েছিলাম, তাতে ছিল প্রাণীর অনেকগুলো ছবি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এটা দেখলেন, তখন তা টেনে ছিড়ে ফেললেন এবং বললেনঃ কিয়ামতের দিন সে সব মানুষের সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির (প্রাণীর) অনুরূপ তৈরী করবে।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৫৫৩০

যারা ছবি নির্মাণ করে তারা লা'নতযোগ্য। আবু জুহায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

**"নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **ছবি নির্মাণকারীকে লা'নত করেছেন।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৫৫৩৭

গৃহ অভ্যন্তরে প্রাণীর ছবি রাখাও ঠিক নয়। কেননা প্রাণীর ছবি রহমতের ফেরেশতাদের গৃহে প্রবেশ করার জন্য একটি অন্তরায়। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু তালহা (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"যে ঘরে জীব-জন্তুর ছবি থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"**

হাদিস, সুনানে আবু দাউদ, নং ৪১১০

এরূপ বর্ণনায় আরো অনেক হাদিস রয়েছে অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে। হাদিসদৃষ্টে এ বিষয়টি পরিস্কার বোঝা যায় যে, প্রাণীর ছবি থাকলে সেখানে রহমতের ফেরেশতার আনাগোনা থাকেনা এবং সে স্থান আল্লাহর রহমত থেকেও বঞ্চিত হয়। তাই ঘরে প্রাণীর ছবি টানানো থাকলে সে গৃহ থেকে আল্লাহর রহমত উধাও হয়ে যায়। আর আল্লাহর রহমত বঞ্চিত ঘরে কোন কাজ-কর্মে বরকত হয় না এবং পারিবারিক অশান্তি সহ নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা হাজির হতে থাকে। প্রাণীর ছবি ছাড়া গাছ-পালা বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন ছবির ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য নয়। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

**"জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বলেনঃ আমি গতরাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু ঘরের দরজায় ছবি এবং কুকুরের কারণে আমি বাধাপ্রাপ্ত হই। সুতরাং আপনি ঘরের মধ্যে যে ছবিগুলো আছে, তাদের মাথা কেটে ফেলতে বলুন যাতে তা বৃক্ষের ন্যায় বাকি থাকে।"**

হাদিস, বুখারী শরীফ, নং ৫৫৩০

অতএব যারা শখ করে নিজেদের এবং বাবা-মায়ের বা অন্যকারো ছবি ঘরে টানিয়ে রাখতে ভালবাসেন এবং এর মাধ্যমে একধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করেন তাদের একটিবার ভেবে দেখা উচিত, তারা কতটা শরিয়ত অসমর্থিত কাজ করে চলছেন। বস্তুতঃ এ কাজটির জন্য খামোখাই তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছেন। তাই আসুন ছবি সংরক্ষণের সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির প্রত্যাশী হই।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## তাওবা (Repentence)

তাওবা একটি আরবী শব্দ যার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা; মতলব গুণাহ থেকে ফিরে আসা। কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় তাওবার অর্থ হলো বিগত গুণাহের জন্য অনুশোচনা করা বা অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে এর পূনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সংকল্প করা। পরিস্কারভাবে বলা যায়, পূর্ববর্তী গুণাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সে গুণাহ পরিত্যাগপূর্বক আল্লাহর আনুগত্য করার লক্ষ্যে আল্লাহমুখী হওয়া এবং গুণাহটির পূনরাবৃত্তি না করে নেক আমল অব্যাহত রাখার জন্য মনস্থীর করার নাম তাওবা।

সত্যসন্ধানী ইসলামী মনিষীদের মতে তাওবার মর্মার্থ হলো কারো অনুভব, উপলব্ধি, অভিপ্রায়, চিন্তা-চেতনা বা আচার-আচরণ দ্বারা আল্লাহর মৌলিকত্ব ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ বিরোধিতা না করা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর সকল হুকুম আহকাম মেনে চলা। এক কথায় বলা যায়, পাপকাজ বর্জন করে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে লেগে থাকার নাম তাওবা। আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। প্রাথমিকভাবে আনুগত্যের দু'টো দিক উল্লেখ করা যায়। এর একটি হলো ঋণাত্মক কর্ম অর্থাৎ যে কাজ করা যাবে না এবং অপরটি হলো ধনাত্মক কর্ম অর্থাৎ যে কাজগুলো পালন করতে হবে। আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত বিষয় সমূহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা বা তা পরিহার করে চলা হলো ঋণাত্মক কর্ম - যেমন, সুদ, ঘুষ, জুয়া, ব্যভিচার, গীবত, মিথ্যাকথা, প্রতারনা, শির্ক, বিদ'আত ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিত্যাগ করে এর থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। আর আল্লাহর আদিষ্ট বিষয়গুলি মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরে তা পালন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হলো এর ধনাত্মক কর্ম- যেমন, নামাজ, রোজা, সামর্থবানদের জন্য হজ্জ ও যাকাত, দান-খয়রাত সহ সকল ফরয, ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব বিষয়গুলি আন্তরিকতার সাথে পালন করা। সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা বা না করা এবং যা করতে আদেশ করেছেন তা সঠিকভাবে পালন করাই হলো আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাওবার সার্থকতা। তাওবার সারকথা হচ্ছে, আল্লাহর পথে ফিরে আসা এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা আর আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ করা বা আল্লাহ্ যা ভালবাসেন সে কাজে লেগে থাকা।

তাওবা, গুণাহ এবং বান্দা ও আল্লাহ্- এ সকলের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। তাওবার সম্পর্ক গুণাহের সাথে। কারণ গুণাহ সংঘটিত হলে তাওবার প্রশ্ন ওঠে। আবার গুণাহের সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহর হুকুম-আহকাম এবং বান্দার কর্মতৎপরতার সাথে। গুণাহ সংঘটিত হয় বান্দার মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানীর কারণে। তবে গুণাহ সংঘটিত হওয়ার কিছু স্তর রয়েছে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-র মতে গুণাহের তিনটি স্তর রয়েছে-

- **এক.** কোনো সময়ই কোনো গুণাহ না করা। এটা ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরদের বৈশিষ্ট্য।
- **দুই.** গুণাহ করা এবং অব্যহতভাবে করে যাওয়া। কোনো সময় অনুশোচনা না করা এবং গুণাহ ত্যাগ করা বা তাওবা করার চিন্তা না করা। এ স্তর শয়তানদের।

- **তিন.** গুণাহ হয়ে গেলে অবিলম্বে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা বর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্প করা অর্থাৎ তাওবা করা। এটা মানবজাতির স্তর।

এতে বোঝা গেল যে, মুমিনের বেশিষ্ট্য হলো গুণাহ হয়ে গেলে তাওবা করা। তাই মানুষের মধ্যে যারা গুণাহ হয়ে গেলে তাওবা করে না তারা সংগত কারণেই শয়তানের অনুসারী।

গুণাহ যখন আল্লাহর নাফরমানির কারণেই সৃষ্টি হয়, তখন সে নাফরমানি পরিত্যাগ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে তাওবা সম্পাদন করতে হয়। প্রত্যেক গুণাহগার বান্দার জন্য তাওবা করা জরুরী। আশা করা যায় পরম করুণাময় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করবেন এবং তার গুণাহ খাতা মাফ করে দিবেন। তবে তার জন্য তাওবা হতে হবে খাঁটি তাওবা।

খাঁটি তাওবার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'তাওবা এ নসুহ'- যার অর্থ আন্তরিক, অকৃত্রিম বা বিশুদ্ধ তাওবা। এ এমন তাওবা যা কাউকে সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত করে দোষক্রটি মুক্ত করে দেয় এবং নেক আমলে উন্নতি সাধন করায়। খাঁটি তাওবা হলো রিয়া ও নাম-যশঃ থেকে মুক্ত-কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে গুণাহ পরিত্যাগ করা। যুগে যুগে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতগণ খাঁটি তাওবার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল:

হযরত ওমর (রাঃ)- এর মতে,

> **"গুণাহ থেকে তাওবা করার পর ঐ পাপকাজের আর পূনরাবৃত্তি না করার নাম খাঁটি তাওবা।"**

কলবী (রহঃ) বলেন,

> **"খাঁটি তাওবা হলো মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গুণাহ থেকে দূরে রাখা।"**

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

> **"পাপকে ঘৃণা করা এবং কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থণা করার নাম খাঁটি তাওবা।"**

এ সকল বক্তব্যে ভাষাগত ব্যবধান থাকলেও মূলভাব বা সারবক্তব্য এক এবং অভিন্ন। খাঁটি তাওবার উপরে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইমাম ইবনে হাতিম (রহঃ) থেকে। তিনি বলেছেন যে,

হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো,

**" বিশুদ্ধ তাওবা কি?"**

উত্তরে তিনি বললেন,

**"আমি রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **কে এ প্রশ্নই করেছিলাম।"**

তিনি জবাবে বলেছিলেন,

**"ভুলক্রমে গুণাহ হয়ে গেছে, অতঃপর ওর উপর লজ্জিত হওয়া, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করা, তারপর ঐ গুণাহের দিকে আর ঝুঁকে না পড়া।"**

তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭৩

যে তাওবা আল্লাহকে ভয় করে অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে করা হয়না এবং যে তাওবায় পাপকাজের প্রতি ঘৃণাবোধ থাকেনা বা যে তাওবায় অতীত অপকর্মের জন্য অনুশোচনা নেই, সেটি খাঁটি তাওবা হতে পারে না। এভাবে খাঁটি তাওবার জন্য কতগুলি বিষয়ের উপস্থিতি জরুরী। প্রখ্যাত ওলামাগণ কোরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করে কতগুলি বিষয়ের সমাহারে খাঁটি তাওবার একটি মানদণ্ড স্থির করেছেন। সে অনুযায়ী খাঁটি তাওবার শর্তগুলি নিম্নরূপ

- কৃত গুণাহ অবিলম্বে বর্জন করা।
- অতীত গুণাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।
- ভবিষ্যতেও সে গুণাহের ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা।
- যদি গুণাহতে বান্দার কোন হক নষ্ট হয়ে থাকে তবে তার প্রতিকার করা।
- ফেলে আসা আল্লাহর হক (ফরজ, ওয়াজিব) সাধ্যমত আদায় করতে চেষ্টা করা।
- পূর্বে যেমন নিজেকে আল্লাহর নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা।

উপরোক্ত বিষয়গুলির কোনটির অনুপস্থিতিতে তাওবা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয় না এবং তা খাঁটি তাওবা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে না। এ পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ের উপরে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হল:

শর্তানুযায়ী খাঁটি তাওবার জন্য সর্বপ্রথমে যেটা করণীয় তা হলো, অনতিবিলম্বে গুণাহের কাজটি পরিত্যাগ করা। এর জন্য তাকে গুণাহের সাথে সকল প্রকার সংশ্লিষ্টতা বর্জন করতে হবে। তবে গুণাহ বর্জনের অন্তর্নিহিত দর্শণটিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। কারণ শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে গুণাহ থেকে বেঁচে থাকাই তাওবার মূখ্য

উদ্দেশ্য। যে তাওবা আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞানুবর্তিতা বা আনুগত্য করার নিয়তে সম্পাদিত হয়না, সেটা কোনভাবেই খাঁটি তাওবা হতে পারেনা। নিজের অপছন্দ, অক্ষমতা বা বিরক্তির কারনে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তৃতীয় কোন শক্তির চাপের মুখে কোন কিছু থেকে বিরত থাকার নাম তাওবা নয়। বরং আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, যদিও বা তা শোভন, উপযোগী বা মনোরম এবং ন্যায় সঙ্গতও মনে হয়- সেগুলি থেকে দূরে থাকাই তাওবা। সেক্ষেত্রে কেউ যদি শারীরিক অক্ষমতা, অর্থনৈতিক সংকট, লোকের সমালোচনার ভয় কিংবা তৃতীয় অন্যকোন অপশক্তির প্রভাবে পাপকাজ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সেটা তাওবা হিসেবে বিবেচিত হবেনা। উদাহরণস্বরূপ, অনেকের কাছে মদ একটি আকর্ষণীয় পানীয় এবং এর কিছুটা উপকারও রয়েছে বটে; কিন্তু যেহেতু আল্লাহ মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছে, তাই এটা পরিহার করে চলতে হবে। এই ভাবনায় যারা মদ্যপান ছেড়ে দেয় তারাই তাওবাকারী। কিন্তু অর্থের অভাবে মদ কিনতে না পেরে বা কঠিন রোগের কারণে অথবা অন্য কোন পার্থিব কারণের জন্য কেউ যদি মদ্যপান থেকে বিরত থাকে, তখন সেটা শর'য়ী দৃষ্টিতে তাওবা বলে বিবেচিত হবে না। একজন ব্যাভিচারী যখন যৌনক্ষমতা হারিয়ে ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকে, তখন সেটাকে তাওবা বলা যাবেনা। আবার আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে কেউ যদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে অবৈধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকে তবে সেটা আর যাই হোক খাঁটি তাওবা হবে না। তেমনি একজন ঘুষখোর ব্যক্তি যখন আল্লাহর ভয় না করে আইনের হাতে পাকড়াও হবার ভয়ে ঘুষ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, তখন সেটা তাওবা বলে বিবেচিত হবে না। পঙ্গুত্বের কারনে কেউ যদি চুরি, ডাকাতি বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেয় তাহলে সেটা তাওবা নয়। এধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে শুধুমাত্র পার্থিব স্বার্থ অথবা শারীরিক অক্ষমতার কারনে মানুষ গুণাহের কাজটি থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়- তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের কোন আচরণই খাঁটি তাওবার মর্যাদা পেতে পারে না। আল্লাহর প্রতি অকৃতিম ভালবাসা এবং আল্লাহভীতির কারণে সম্পাদিত তাওবাই সত্যিকারের তাওবা।

বিশুদ্ধ তাওবা হওয়ার জন্য দ্বিতীয় যে শর্তটি রাখা হয়েছে তা হলো, অতীত গুণাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং লজ্জিত হওয়া। পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ, লজ্জা বা অনুশোচনার জন্ম হয় আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও আল্লাহভীতি থেকে এবং এর মধ্যে দিয়েই আল্লাহর আনুগত্যের প্রকাশ ঘটে। তাই অতীত গুণাহ স্মরণ হলে মানুষ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, অনুতপ্ত হয় বা লজ্জিত হয়, তখন তা তার ভবিষ্যত কর্মকে সুধরে দেয় এবং গুণাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে। তখন তার জন্য আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর লজ্জাবোধ না থাকলে তার দ্বারা কোন পাপ করা সহজ হয়ে যায়। লজ্জিত হওয়া যে তাওবার অংশ, এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে বলতে শুনেছেন,

**"লজ্জিত হওয়াও হলো তাওবা।"**

তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭২

তৃতীয় শর্তে গুণাহের পূনরাবৃত্তি না করার কথা বলা হয়েছে। এটা একপ্রকার কর্তব্য পালনের শপথ বা অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারের উপর অবিচল থাকা সুকঠিন এবং এর জন্য জোড়ালো ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। যাদের এ ক্ষমতা রয়েছে এবং তাওবার উপর অবিচল থাকতে পারে তারা উৎকর্ষের শির্ষে আরোহন করে শহীদের মর্যাদা পেতে পারে। পক্ষান্তরে যারা তাওবা করা সত্ত্বেও পথভ্রষ্টতা বা গুণাহ থেকে বেড়িয়ে আসতে পারছে না, তাদের তাওবা ছলনা বৈ কিছু নয়। কেউ যখন তাওবা করে কিন্তু গুণাহের পূনরাবৃত্তি না করার নিয়ত না রাখে, তাহলে তার দ্বারা গুণাহটি বারবার সংঘটিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ভবিষ্যতে গুণাহের সাথে জড়িত না হবার সংকল্পবিহীন তাওবা অর্থহীন এবং তা খাঁটি তাওবা হিসেবে বিবেচ্যও নয়। উদাহরণস্বরূ, যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যাবলা পরিহার করার জন্য তাওবা করে, তখন তাকে সর্বাবস্থায় এর উপর অটল থাকতে হবে। কিন্তু তা না করে সে যদি পুনরায় আবার মিথ্যাবলা শুরু করে আবার তাওবা করে আবার মিথ্যা বলে- এভাবে সে মিথ্যার সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, এ তাওবায় আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। তখন এ ধরনের আচরণ তাওবার সাথে পরিহাস বলেই বিবেচিত হবে। এ প্রকারের তাওবা খাঁটি তাওবার মর্যাদা পেতে পারে না। পাপের পথ পরিহার করে সে পাপের পূনরাবৃত্তি না করার উপর অবিচল থাকলেই সেটা খাঁটি তাওবা হিসেবে গণ্য হবে। তবে মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। সবকিছু ঠিক-ঠাক থাকলেও মানবীয় স্বভাব হিসেবে যে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে হয়ত আবার পদস্খলন ঘটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাওবা পুনরায় নবায়ন করা জরুরী হয়ে পড়বে। কেননা যারা স্বীয় গুণাহের উপর অটল থাকে বা পাপকাজ করেই চলে তারা কখনই সফলকাম হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**“(ভাল মানুষ হচ্ছে তারা) যারা- যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের উপর নিজেরা জুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং গুণাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কে আছে যে, তাদের গুণাহ মাফ করে দিতে পারে? তদুপরি এরা জেনেবুঝে নিজেদের গুণাহের উপর অটল হয়ে বসেও থাকেনা।”**

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান(৩), আয়াত-১৩৫

এ আয়াতে-কারীমায় তাওবার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কখনও মানবিক দুর্বলতাবশতঃ কারো দ্বারা কোন গুণাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে ক্ষমা প্রার্থণা করে এবং ভবিষ্যতে এ গুণাহ থেকে বেঁচে থাকার কঠোর সংকল্প করে। পাপকে পাপ জেনেও যারা হঠকারীতা করে না, বা বারবার পাপের পূনরাবৃত্তিও করে না- এরাই ভালো মানুষ এবং এরাই সফলকাম।

খাঁটি তাওবার চতুর্থ শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, গুণাহের কারণে যদি কোন বান্দার হক বিনষ্ট হয়ে থাকে, তবে তার সাধ্যমত ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক। কারণ বান্দার হক বিনষ্ট করা হয়ে থাকলে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তা অপরাধীর জিম্মায় থেকে যাবে এবং তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত

আল্লাহ্ তা'আলাও ক্ষমা করেন না। রোজ হাশরের দিনে তার কাছ থেকে ঐ হক পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে তার পূণ্যের বিনিময়ে অথবা তার ঘাড়ে বান্দার পাপ চাপিয়ে। এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে ব্যক্তির উপর অন্য মুসলমান ভাইয়ের মানহানি বা অন্যকোন বস্তু সম্পর্কীয় হক থাকে, তার কর্তব্য হবে- ইহজীবনেই তা থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা। তার সম্মুখে এমন একদিন আসবে যে দিন কারও নিকট কোন প্রকার ধন-দৌলত থাকবে না। যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে ঐ হক অনুপাতে তার নেক আমল ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে হকদারের গুণাহের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।"**

হাদিস, বোখারী শরীফ, নং-১১৮৩

একজন তাওবাকারীর পক্ষে বান্দার হক বিনষ্ট করা হয়ে থাকলে তা পরিশোধ করা যে কতটা জরুরী তা এ হাদিসদৃষ্টে অতি সহজেই অনুমেয়। বান্দার কাছ থেকে মৃত্যুর পূর্বেই ঋণমুক্ত হতে না পারলে তাকে আখিরাতে আসামী হয়ে বিচারের কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হবে নিঃস্ব অবস্থায়। সেখানে হকদারগণ নিজ নিজ হকের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে উপস্থিত হবে, তখন তার নেক আমল সমূহ থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। অতঃপর হকদারের পাওনা মিটাতে গিয়ে যদি তার সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে হকদারের গুণাহের বোঝা তার উপর চাপানো হবে। এভাবে সে সমুদয় নেক আমল হারিয়ে রিক্তহস্তে গুণাহের বোঝা নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।

বান্দার হক নষ্ট করা হতে পারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়- যেমন আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি, শারীরিক ক্ষতি, মানসিক কষ্ট বা মান-সম্মান হানি ইত্যাদি। তবে যে প্রকারেরই হক বিনষ্ট করা হোক না কেন, সাধ্যমত তার প্রতিকার করা আবশ্যক। তাই কারো অর্থসম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা হয়ে থাকলে তা ফেরত দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কাউকে খুন করা হলে কিসাস বা দিয়াতের (রক্তপণ) ব্যবস্থা করতে হবে। কাউকে প্রহাড় করা বা কোন রকম শারীরিক কষ্ট দেয়া হলে তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে গালি-গালাজ বা অন্যকোন ভাবে মান-সম্মান হানির মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। কারো উপর গীবত বা অপবাদ সম্পর্কীয় হক থাকলে হকদারের নিকট থেকে ক্ষমা নিতে হবে। এভাবে বান্দার হক পরিশোধ করার মাধ্যমে তাওবার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা করতে হবে। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, যারা রাষ্ট্রীয় তথা জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ বা অবৈধ হস্তক্ষেপের সাথে জড়িত রয়েছেন তারা যে নিজের অজান্তেই লক্ষ-কোটি মানুষের হক বিনষ্ট করে চলছেন, সে হিসেব কি তাদের আছে? জনতার হক নষ্টের শেষ পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে সে বিষয়েও কি তাদের কোন হুঁশ আছে? অথবা কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে তাদের পক্ষে কি

অগনিত মানুষের হক পরিশোধ করা আদৌ সম্ভব হবে? এটা নিশ্চয়ই তাদের জন্য একটা মস্তবড় চ্যালেঞ্জ। তাই এ গুণাহ থেকে পরিত্রাণের রাস্তা তাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শর্তের মধ্যে রয়েছে বিগত দিনে বিনষ্টকৃত আল্লাহর হক আদায় করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে সৎকাজে লেগে থাকা। বান্দার মাধ্যমে আল্লাহর হক নষ্ট করার জন্য অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজেব ইবাদত- যেমন নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতগুলি যথাসময়ে পালন করতে ব্যার্থ হওয়ার কারণে গুণাহ সংঘটিত হয়ে থাকলে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং কর্ম সংশোধন করা যেমন জরুরী তেমনি তাওবা পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য বিগত দিনের ফরয ও ওয়াজিব কর্মগুলির কাযা আদায় করে নেওয়াও আবশ্যক। সালাত নির্দিষ্ট সময়ের সাথে নির্ধারিত ফরয ইবাদত, তাই বিশুদ্ধমতে সালাতের কোন কাযা নেই। তবে অমনোযোগিতা বশতঃ যে সকল নামায তরক করা হয়েছে তার খেসারতস্বরূপ বেশি বেশি নফল নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। আশা করা যায় আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। অতীতে মুসলিম অবস্থায় কারো উপর ধার্যকৃত যে সকল রোজা অবহেলার কারনে বাদ পড়েছে সেগুলির কাযা করতে হবে। উপরন্তু প্রতিটি রোযার জন্য তাকে একজন করে মিসকিনকে একদিনের খাদ্য বা ঐ পরিমাণ অর্থ ফিদিয়া দিতে হবে- এটা জরিমানা স্বরূপ দেয়। সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও যে যাকাত দেয়া হয়নি তা এখন দিয়ে দেওয়া এবং হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ পালন না করে থাকলে তা এখন আদায় করে নেওয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ্জ করানো ইত্যাদি বিষয়গুলি অপরিহার্য। মোট কথা কর্ম সংশোধনের জন্য শুধু বর্তমান আমলসমূহ সঠিকভাবে করাই যথেষ্ট নয়; বিগত দিনের ফেলে আসা ফরয ও ওয়াজিব সমূহও আদায় করা জরুরী। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাওবার মাধ্যমে মানুষকে শুধরে নেওয়ার কথা বলেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনো অজ্ঞানতাবশতঃ কোন অন্যায় কাজ করে বসে এবং পরক্ষনেই তাওবা করে ও নিজের জীবন শুধরে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"**

আল-কোরআন, সুরা আনআম(৬), আয়াত-৫৪

এখানে তাওবার সাথে সাথে নিজেকে শুধরে নেয়া বা নিজের কর্ম সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। বিশিষ্ট আলেমগণ এর মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যতের নেক আমল সহ অতীতের কর্ম সংশোধনের বিষয়ও বুঝিয়েছেন-যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

এভাবে সচেতন মনে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সকল হুকুম আহকাম মান্য করে তাঁর আনুগত্য করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাওবার উৎকর্ষতা এবং এটাই বিশুদ্ধ তাওবার দাবী।

**তাওবার মাধ্যমে সকল গুণাহ মাফ হয়:**

আল্লাহ ক্ষমাশীল। তাই তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। বড় বড় গুণাহ থেকে বেঁচে থাকলে তিনি নিজ গুণে বান্দার ছোট-খাট গুনাহগুলি মিটিয়ে দেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"যদি তোমরা সে সমস্ত বড় বড় গুণাহ থেকে বেঁচে থাক, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাট গুণাহ আমি তোমাদের থেকে মুছে দেব।"**

আল-কোরআন, সুরা নচে(৪), আয়াত-৩১

এখান থেকে এটা অতি সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহ তাওবা ছাড়াই বান্দার ছোট-খাট গুণাহগুলি নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু কুফরী, শিরক তথা কবীরা গুণাহ সমূহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা করা হয়না। তবে বান্দার নিরাশ হবার কিছুই নেই। কারণ বান্দা যখন তাওবা করে তখন তিনি বান্দার জন্য অবারিত হয়ে যান। গুণাহ, তা যত বড় গুণাহ-ই হোক না কেন, তাওবার মাধ্যমে সকল প্রকার গুণাহ থেকে ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

**"যে ব্যক্তি গুণাহের কাজ করে অথবা নিজের উপর অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।"**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১১০

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে স্বীয় অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, কেউ কোন পাপকার্য সম্পাদনের পর তাওবা করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা দয়া করে তার দিকে প্রবর্তিত হন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা দ্বারা ঢেকে নেন এবং তার গুণাহ ক্ষমা করে দেন- যদিও সে পাপ আকাশ, জমীন ও পর্বত থেকেও বড় হয় (তাফসীর ইবনে কাসীর)।

আল্লাহই যে বান্দার তাওবা কবুল করেন এবং তিনিই যে তাওবার মাধ্যমে বান্দার সকল অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে,

**"তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহ্-ই নিজ বান্দার তাওবা কবুল করেন, আর তিনি সাদকা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**

আল-কোরআন, সুরা তাওবা(৯), আয়াত-১০৪

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"যারা অজ্ঞানতাবশতঃ কোনো গুণাহের কাজ করলো অতঃপর তাওবা করে নিল ও নিজেদের সংশোধন করে নিল, তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আল-কোরআন, সুরা নাহল(১৬), আয়াত-১১৯

শির্ক ও হত্যার মত বড় বড় গুণাহ থেকেও পরিত্রান পাওয়া যেতে পারে তাওবার মাধ্যমে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"(দয়াময়ের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কোনো মা'বুদকে ডাকে না, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে যাকে হত্যা করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না, যারা ব্যাভিচার করে না; যে ব্যক্তিই এসব অপরাধ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবে। কিন্তু যারা তাওবা করেছে, আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব লোকদের গুণাহগুলি নেক আমল দ্বারা বদলে দেবেন, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আল-কোরআন, সুরা ফোরকান(২৫), আয়াত-৬৮-৭০

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন। বান্দা গুণাহ করার পরে আল্লাহকে ভয় করে তাওবা করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা খুশি হন। এ সম্পর্কে ইসহাক ও হুদবাহ (রাহঃ) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আনাস (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবার কারনে সেই লোকটির চাইতেও বেশি খুশি হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তার হারানো উট ফিরে পেয়ে খুশি হয়।"

হাদিস, সহীহ বুখারী শরীফ, নং ৫৮৭০

বান্দা যতটা বেগে আল্লাহর পানে ধাবিত হয়, আল্লাহ্ তার চেয়েও বেশি বেগে বান্দার দিকে এগিয়ে আসেন। অর্থাৎ বান্দা যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ্ তার চেয়ে অধিক বান্দাকে স্মরণ করে থাকেন। এর সমর্থনে একটি হাদিস রয়েছে। সুয়াইদ ইবনে সাঈদ (রাহঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"বান্দা যখনই আল্লাহকে স্মরণ করে তিনি তার সঙ্গে আছেন। যদি কেহ এক বিঘত পরিমান তাঁর দিকে এগিয়ে আসে তিনি তার দিকে একহাত পরিমান অগ্রসর হন। যদি কেহ একহাত পরিমান তাঁর দিকে অগ্রসর হয় তবে তিনি তার দিকে দু'হাত পরিমান অগ্রসর হন। যদি কেহ তাঁর দিকে হেঁটে আসে তিনি তার দিকে দৌড়ে যান।"

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৬৭০২

মানুষ বার বার গুণাহ করার পর তাওবা করলেও তা কবুল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে অন্য একটি হাদিসে। আবদুল আলা ইবনে হাম্মাদ (রাহঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রতিপালক আল্লাহ হতে বলেন:

**“এক বান্দা গুণাহ করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুণাহ ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ্ বললেনঃ আমার বান্দা গুণাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গুণাহ ক্ষমা করেন এবং গুণাহের কারনে পাকড়াও করেন। একথা বলার পর সে পুনরায় গুণাহ করল এবং বললঃ হে আমার প্রভু! আমার গুণাহ মার্জনা করুন। এরপর আল্লাহ্ বললেনঃ আমার এক বান্দা গুণাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গুণাহ ক্ষমা করেন এবং গুণাহের কারনে পাকড়াও করেন। তারপর সে আবার গুণাহ করে বললঃ হে আমার প্রভু! আমার গুণাহ মার্জনা করুন। একথা শুনে আল্লাহ্ আবারও বললেনঃ আমার বান্দা গুণাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন মালিক আছেন, যিনি গুণাহ ক্ষমা করেন এবং গুণাহের কারনে পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ বললেনঃ হে বান্দা! এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গুণাহ মাফ করে দিয়েছি।”**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৬৭৩৪

**তাওবা কবুল হওয়ার শর্তঃ**

কৃত গুণাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য কেবল তাওবা করাই যথেষ্ট নয়, বরং তাওবা কবুল হওয়াটা জরুরী। তবে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে বিবৃত তাওবা কবুলিয়াতের যোগ্য হতে পারে না। শর’ই বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার পূর্ব গুণাহের জন্য লজ্জিত বা অনুতপ্ত না হয় অথবা তা পরিত্যাগের কোনো ইচ্ছা না করে তখন তার শুধুমাত্র তাওবার মৌখিক ঘোষণা একটি প্রহসন বা ছলনার তাওবা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর সেক্ষেত্রে তাওবা কবুলের আশাও করা যায় না। তাওবা কবুল হওয়াটা শর্ত সাপেক্ষ বিষয়। কোরআন ও হাদিসের আলোকে এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে যে শর্তগুলি পাওয়া যায় তা হচ্ছে:

- ঈমান
- খাঁটি তাওবা
- সময়কাল

ঈমান তাওবার অপরিহার্য অঙ্গ এবং তাওবা কবুলের পূর্বশর্ত। আল্লাহ শুধুমাত্র ঈমানদার মুমিন বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন। ঈমানহীন কাফির অবস্থায় কারো আহবানে আল্লাহ্ সাড়া দেন না। তাই তাদের তাওবা কবুলেরও কোন সম্ভাবনা থাকেনা। বস্ততঃ কুফরী অবস্থার কোন নেক আমলই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়না। কুফরীতে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তওবা কবুল না হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"যার ঈমান আনার পর কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে অতঃপর তারা এই কুফরী দিন দিন বাড়াতেই থেকেছে, তাদের তাওবা কখনও কবুল হবে না, কারণ এরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট। যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অবিশ্বাস করেছে এবং কুফরী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা যদি নিজেদের আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য এক পৃথিবীপূর্ন স্বর্ণও মুক্তিপণ হিসেবে ব্যয় করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবেনা; বস্তুতঃ ওদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"**

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান(৩), আয়াত-৯০,৯১

তবে কোন কাফির ব্যক্তি যখন কুফরী পরিত্যাগ পূর্বক ঈমানের নবায়ন করে তার বিগত গুণাহের জন্য তাওবা করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাকে ক্ষমাশীল পাবে। যেমন পবিত্র কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে,

**"যারা ঈমানের পর কুফরী করেছে, আল্লাহ্ তাদের কিভাবে পথপ্রদর্শন করবেন। তবে তাদের কথা আলাদা যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**

আল-কোরআন, সুরা আলে-ইমরান(৩), আয়াত-৮৬,৮৯

তাওবা গৃহীত হওয়ার জন্য খাঁটি তাওবা হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর বান্দাদের তাওবার আহবান জানিয়েছেন এবং তা কবুলের সুসংবাদ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর-একান্ত খাঁটি তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রবে ঝর্ণাধারা।"**

আল-কোরআন, সুরা তাহরীম(৬৬), আয়াত-৮

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ সরাসরি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাওবার আহবান জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি বান্দার তাওবা কবূল করে তাকে সুখময় জান্নাতে দাখিল করারও সুসংবাদ দিয়েছেন। মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কোন খোশ খবর হতে পারে না। তবে তাওবা কবুলের জন্য এখানে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাওবার জন্য শুধু মুমিনদেরকে আহবান জানিয়ে তাদের তাওবা কবুলের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটা আবারও প্রমাণিত যে তাওবা কবুলের জন্য ঈমান অপরিহার্য। দ্বিতীয় শর্ত রাখা হয়েছে এই যে, তাওবা হতে হবে 'তাওবা এ নসুহ' বা খাঁটি তাওবা। আল্লাহ তা'লার ক্ষমা এবং রহমত প্রাপ্তির জন্য তাওবা একান্ত আন্তরিক হওয়া আবশ্যক।

বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গুণাহই তাওবা ও ইসতিগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তার জন্য তাওবা বিশুদ্ধ হওয়া জরুরী। কিন্তু 'আস্তাগফিরুল্লাহ, ওয়া আতুবু ইলাইহি'- এ জাতীয় শব্দগুলি কেবলমাত্র মুখে উচ্চারণ করাই তাওবা নয়। তাওবা করতে হয় আন্তরিকতার সাথে এবং কর্মসংশোধনের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের খবর পুরোপুরিভাবে অবহিত আছেন। তাই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সে গুণাহের কারণে অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে কৃতসংকল্প না হয়, তবে শুধু মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ বলা তাওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়। আর প্রহসনের তাওবা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যও নয়। সে জন্য তাওবা হতে হবে একান্ত আন্তরিক, বিশুদ্ধ তাওবা।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা যে তাওবা কবুল করেন তা হচ্ছে সে তাওবা যা মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেড়িয়ে আসে অর্থাৎ মানুষ যখন পাপ পঙ্কিলতার মাঝে নিমজ্জিত হবার পর পুরোপুরি লজ্জিত হয় এবং স্বীয় কাজের জন্য অনুশোচনা করতে গিয়ে পবিত্র হওয়ার প্রবল একটা ইচ্ছা তার মনে জাগে এবং সঠিকপথে চলার খালেছ নিয়ত করে, সর্বোপরি অনেক আশা ভরসা নিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে- তখনই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

তাওবা করার জন্য যদিও সুনির্দ্দিষ্ট কোন সময় নেই তবুও তাওবা কবুলের জন্য সময়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু শর্ত আরোপিত রয়েছে। যেমন গুণাহ হওয়ার পরে অনতিবিলম্বে বা নিকটতম সময়ে এবং কিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাওবা করা ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে গুণাহের অব্যবহিত পরেই তাওবা করার কথা বলা হয়েছে,

**"তাওবা কবুল করার দায়িত্ব যে আল্লাহর উপর রয়েছে তাতো শুধু তাদেরই জন্য যারা অজ্ঞানতাবশতঃ পাপ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে। এরাই হলো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।"**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৭

এ আয়াতদৃষ্টে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তাওবা কবুল হওয়ার জন্য যথাশীঘ্র বা নিকটতম সময়ে তাওবা করতে হবে। তাওবা করায় দেরী করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যথাশীঘ্র বা নিকটতম সময় বলতে কতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে? এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত নবী (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস থেকে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

" যে কোন বান্দা তার মৃত্যুর একমাস পূর্বেও তাওবা করে, তার তাওবা আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ

**করে থাকেন, এমনকি তার পরেও বরং মৃত্যুর একদিন পূর্বে হলেও, এমনকি এক ঘন্টা পূর্বে হলেও। যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে ও সততার সাথে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তিনি তার তাওবা কবুল করে থাকেন।”**

তাফসীর ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**“আল্লাহ্ তা’আলা বান্দার তাওবা তখন পর্যন্ত কবুল করেন, যে পর্যন্ত তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণার গড়গড়া আরম্ভ না হয়।”**

তাফসীর মা’আরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪

এ হাদিসদ্বয়ের আলোকে বোঝা গেল যে, মানুষের সমগ্র জীবনটাই নিকটবর্তী বা যথাশীঘ্রর অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বান্দা যতদিন জীবিত রয়েছে এবং তার জীবনের আশা আছে, সে সময়ের মধ্যে যদি সে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আল্লাহ তা’আলা তার তাওবা কবুল করে তার দিকে প্রবর্তিত হন। তবে মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হয়ে গেলে যে তাওবা করা হয়, তা কবুল হবে না। যেমন পবিত্র কোরআনেও বলা হয়েছে,

**“আর তাদের জন্য ক্ষমা নেই, যারা পাপ করতেই থাকে- যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলেঃ নিশ্চয়ই আমি এখন তাওবা করছি।”**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৮

এখানে বলা হয়েছে যে, যারা সারাজীবন নির্ভয়ে গুণাহের কাজ করতে থাকে, অতঃপর যখন সে জীবন হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ মৃত্যু যখন মাথার উপর ছায়াপাত করে ও মৃত্যুর ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হয় এবং আত্মা দেহ থেকে বেড়িয়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে মৃত্যু যন্ত্রনার গড়গড়া শুরু হয়ে যায়, তখন তাদের তাওবা কবুল হয়না। তারা জীবনের মূল্যবান সময় অবহেলায় কাটিয়ে তাওবার সময় বিনষ্ট করে ফেলেছে। সুতরাং তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

আখিরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় মানুষের পার্থিব জীবন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাকে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে হয়। পাপ মানুষের দ্বারাই সংঘটিত হয় আবার তাওবার মাধ্যমেই যখন সে পাপ মোচন হয়, তখন গুণাহ হয়েছে বলে বুঝতে পারার সাথে সাথেই তাওবা করে নেয়া শ্রেয়। তাওবা করতে গড়িমসি করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। কারণ মৃত্যুর সময় সুনির্ধারিত, তবে কেউ জানেনা যে, কোন মুহূর্তে বা কখন তার নিকট মৃত্যুর পরওয়ানা এসে হাজির হবে। হতে পারে তাওবা করতে দেরী করার ফলে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা তার নসীবই না হয়। ‘এক সেকেন্ডের নাই ভরসা, বন্ধ হবে রং

তামাশা’- তাই কালক্ষেপন না করে মৃত্যু আঘাত হানার পুর্বেই আসুন আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনের হিসেবের খাতা খুলে দেখি এবং ভুল-ত্রুটিগুলো তাওবার মাধ্যমে শুধরে নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সৎ জীবন যাপনে ব্রত হই।

**যে অবস্থায় বা যখন তাওবা কবুল হয়না:**

আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত খুব বিস্তৃত। এতদসত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। তাওবা দ্বারা গুণাহ মাফ হয় কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করা জরুরী। যেমন আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি যে, মৃত্যু উপস্থিত হলে আর তাওবা কবুল হয় না। তেমনি মৃত্যুর পরেও কোন তাওবা নেই। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআন বলছে,

**“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।”**

আল-কোরআন, সুরা যুমার(৩৯), আয়াত-৫৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তাওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোন উপকার হবে না এবং সে তাওবা গৃহীতও হবে না। তাফসীর মা’আরেফুল কোরআনের বর্ণনায় এসেছে, **“কোন কোন কাফির ও পাপাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, ‘হায়! আমি আল্লাহর আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম! কেউ সেখানেও তাকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। আবার কেউ বাসনা করবে যে তাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাবে এবং আল্লাহর বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলবে। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না”** (৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬১)।

কিয়ামতের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে; এর পরে ঈমান আনায়ন করা হলে তা ফলপ্রসূ হবে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**“যেদিন তোমার প্রতিপালকের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেদিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি অথবা যে ব্যক্তি তার ঈমান দিয়ে কোনরূপ সৎকর্ম করেনি, তার জন্য ঈমান আনাটা কোন কাজে আসবে না।”**

আল-কোরআন, সুরা আনআম(৬), আয়াত-১৫৮

এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা’আলার কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কোন কাফির স্বীয় কুফর থেকে এবং কোন পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে এ সময়ের পরে যদি তাওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না। এখানে নিদর্শন বলতে

কিয়ামতের নিদর্শনকে বোঝান হয়েছে। তবে এ নিদর্শন কোনটি তা পরিস্কারভাবে বলা হয়নি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর হাদিসদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এ নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ঘটার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর যখন পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ঘটবে তখন সকল মানুষ ঈমান আনবে; কিন্তু এর পূর্বে যে ঈমান আনে নাই অথবা ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করে নাই, এ সময়কার ঈমান তার কোন কাজে আসবে না।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং-২৯৩

আর একটি হাদিসে সাফওয়ান ইবনে উসসাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

**'আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন যা প্রস্থে সত্তর বছরের পথ। এটা তাওবার দরজা। সূর্য বিপরীত দিক থেকে উদয় হওয়ার পূর্বে এটা বন্ধ করা হবেনা।"**

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৩

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"যে ব্যক্তি সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হওয়ার পূর্বেই তাওবা করবে তার তাওবা কবুল হবে, এর পরে আর তাওবা কবুল হবে না।"**

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩২

**যাদের তাওবা কবুল হবার নয়:**

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, তাওবা কবুলের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। কাজেই ঈমানহীন কাফির অথবা কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির তাওবা নেই এবং তাদের ক্ষমাও নেই। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

**"যারা কুফরী করেছে এবং এই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশতাদের অভিশাপ আর অভিশাপ সমগ্র মানবকুলের। এই অভিশপ্ত অবস্থার মধ্যেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তাদের শাস্তি লেশমাত্রও কম করা হবে না এবং তাদের কোনরকম অবকাশও দেয়া হবে না।"**

আল-কোরআন, সুরা বাকারা(২), আয়াত-১৬১-১৬২

কাফেরদের জন্য যে তাওবা নেই, সে সম্পর্কে কোরআনের আর একটি সুরায় বলা হয়েছে,

**“তাদের জন্য তাওবা নেই যারা কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাঙ্গ করলো; তাদেরই জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।”**

আল-কোরআন, সুরা নিসা(৪), আয়াত-১৮

**তাওবার তাৎপর্য ও গুরুত্ব:**

তাওবার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো পাপকাজ বর্জন করা এবং অতীত গুণাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাওবার মাধ্যমে নিস্পাপ হয়ে পবিত্রতা হাসিল করা যায়। তাওবার মাধ্যমে সুপথ প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর রহমত এবং তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাওবা মুমিন বান্দার জন্য পরম আশীর্বাদ এবং পরকালীন মুক্তির হাতিয়ার। তাওবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাই অপরিসীম।

তাওবা মানুষকে কলুষমুক্ত করে। মানুষ যখন একটি গুণাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। এভাবে পাপরাশি মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে ফেলে। তখন সে অমানুষ হয়ে যায়। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র রাস্তা তাওবা। তাওবা ছাড়া হৃদয়ের সে কালিমা দূরীভুত হয় না। তাওবার মাধ্যমে একজন মানুষ কলুষমুক্ত হয়ে খাঁটি মানুষে পরিণত হতে পারে।

তাওবা হলো মুক্তির সোপান। একটি বড় গুণাহ-ই মানুষের পরকাল বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট এবং তা তার জন্য নিশ্চিত বয়ে আনতে পারে আখেরাতের চিরস্থায়ী শাস্তি। অপরাধ জগৎ থেকে ফিরে আসাটা তাই প্রত্যেকের জন্য জরুরী; আর এ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাওবার কোন বিকল্প নেই। কারণ মানুষ যখন অপরাধ করতে করতে পাপের সাগরে ডুবতে বসে, তখন একমাত্র তাওবা-ই তাকে উদ্ধার করতে পারে। তার পাপ-পঙ্কিল মৃত আত্মায় প্রাণসঞ্চারের জন্য তাওবা মৃতসঞ্জীবনী টনিকের মত কাজ করে। এভাবে অভিশপ্ত পাপপঙ্কিল নষ্ট জীবনের অবসান ঘটিয়ে মানুষ কল্যাণময় নতুন জীবনের সন্ধান লাভ করতে পারে তাওবার মাধ্যমে।

তাওবা পাপ মোচন করে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যে সব সময়ের জন্য তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। তাওবার মাধ্যমে একজন ঘোর পাপী ব্যাক্তিও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ ক্ষমাশীল। কোন বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী হয় এবং তাঁর কাছ ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি খুশী হন এবং তার গুণাহখাতা মাফ করে দেন, চাই তা যত বড় গুণাহ-ই হোক না কেন। তখন তার জন্য কল্যাণের দরজা খুলে যায়। এটা মানুষের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় আর তাওবা-ই হলো সে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তবে তওবা গৃহীত না হলে বান্দার অকল্যাণ এবং পরকালীন শাস্তি অনিবার্য হয়ে যায়। তাই তাওবা হতে হবে খাঁটি তাওবা।

তাওবা বিপথগামী মানুষের পথের দিশা এবং সমুহ বিপদ থেকে নিজেকে উদ্ধার করে কল্যাণ লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ। তাওবার সুযোগ না থাকলে সকল মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ত। কারণ মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, আর পাপ করাটাও মানুষের সহজাত অভ্যাস। তাই কারো দ্বারা যে কোন সময়েই গুণাহের কাজ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। একটি বড় পাপও যখন মানুষের জন্য বয়ে আনতে পারে চরম অকল্যাণ আর আখিরাতের চিরস্থায়ী শাস্তি, তখন পাপাচারীর শেষ পরিণতি সম্পর্কে অতি সহজেই অনুমেয়। ভুলের কারণে মানুষকে বয়ে বেড়াতে হত চরম লাঞ্ছনা, আর ভোগ করতে হত জাহান্নামের চিরস্থায়ী জ্বলন্ত অগ্নির দহন। তবে এই অকল্যাণ আর শাস্তির হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য যে সুব্যবস্থাটি রেখেছেন তার নাম তাওবা। তাওবা দিয়েছে মানুষকে পাপের রাস্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার মহাসুযোগ। তাওবা নেই তো কল্যাণও নেই। একটি কবীরা গুণাহও যখন মানুষকে পরকালে জাহান্নামের মত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করে দিতে পারে, সেক্ষত্রে তাওবা ছাড়াতো মানুষ নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে থাকত এবং সেখান থেকে পরিত্রাণের কোন রাস্তাই পেত না। তাই কেবলমাত্র তাওবাই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে মুক্তি এনে দিতে পারে।

তাওবা অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে এক আলোকবর্তিকা। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে পথহারা পথিককে পথ প্রদর্শনেরে জন্য এক চিলতে আলো যেমন প্রয়োজনীয়, পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির কলুষিত অন্তরকে আলোকিত করে তাকে সরলপথে পরিচালিত করার জন্য তাওবাও তেমনি অপরিহার্য। তাওবা মুমিনের অন্তরকে আলোকিত করে। সে আলোয় পথ চলতে চলতে সে পৌঁছে যেতে পারে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে।

তাওবা কল্যাণের পথে অধিষ্টিত থাকার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে কেউ যখন হাবুডুবু খেতে থাকে, তখন একটুকরো কাষ্ঠ যেমন হতে পারে তার বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন; তেমনি গুণাহের সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির জন্য তাওবা হতে পারে তার সুপথ প্রাপ্তি এবং আখিরাতের মুক্তির একমাত্র অবলম্বন। আর এ কারণেই বান্দার জন্য তাওবা এত গুরুত্বপূর্ণ।

তাওবার দ্বারা পাপ স্খলন হয়। গুণাহ, তা যত বড়ই হোক না কেন, খাঁটি তাওবার মাধ্যমে সে অপরাধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। বস্তুতঃ তাওবা ছাড়া কোন কবীরা গুণাহই মাফ হয় না। খাঁটি তাওবা গুণাহগার বান্দার পাপ মোচন করে কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং তার জন্য আল্লাহর রহমত তথা পরকালীন মুক্তি বয়ে আনে। সুতরাং তাওবার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অপরিসীম।

তাওবা কিভাবে করতে হয়?

গুণাহের কারণে পরকালীন শাস্তি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে তাওবা। আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন এবং বান্দার অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। সুতরাং খাঁটি তাওবার মাধ্যমে গুণাহ মুক্ত হয়ে আখেরাতের আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার আশা করা যায়। বান্দা যখন কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর দিকে রুজু হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাওবা কিভাবে করতে হয় এবং কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, তাওবার জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই এবং এর জন্য কোন লৌকিকতা বা আনুষ্ঠানিকতারও প্রয়োজন নেই। তাওবার সম্পর্ক মনের সাথে, তাই মনের সংকল্পই তাওবার মূল বিষয়বস্তু। সেক্ষেত্রে অজ্ঞতাবশতঃ বা মনের অজান্তে অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে কারো দ্বারা কোন গুণাহের কাজ হয়ে গেলে তাওবার জন্য তার যা করণীয় তা হচ্ছে:

- **গুণাহটির জন্য অনুতপ্ত হয়ে গুণাহের কাজটি অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে।**
- **ভবিষ্যতে ঐ গুণাহটির পূনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।**
- **বান্দার হক থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে বা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।**
- **সৎকর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়তে হবে।**

এরপর কৃত গুণাহের কারনে পরকালীন শাস্তি থেকে রেহাই পেতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং কান্নাকাটি করতে হবে। এর জন্য উত্তম হচ্ছে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। পরিপূর্ণরূপে ওজু করতঃ উত্তমরূপে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ বান্দার পাপ মার্জনা করে দেবেন বলে আশা করা যায়। এ সম্পর্কে একাধিক হাদিস পাওয়া যায়। আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

**"যে ব্যক্তি কোন পাপকার্জ করার পর অজু করতঃ দুই রাকা'আত নামায আদায় করে এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, মহাসম্মানিত আল্লাহ্ তার পাপ মার্জনা করে দেন।"**

-মুসনাদে আহমাদের রেওয়াতে তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭১

অন্য একটি হাদিস বর্ণিত আছে আমিরুল মোমিনুন হযরত ওমর (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

**"তোমাদের যেই ব্যক্তি সর্বাঙ্গীন বা পূর্ণরূপে অজু করে এই দোয়া পাঠ করবে- 'আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লালাহু ওহদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'**

**অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল'- তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। সে যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।"**

হাদিস, সহীহ মুসলিম শরীফ, নং ৪৪৬

নবী রাসূলগণ ছিলেন গুণাহমুক্ত নিষ্পাপ। তথাপিও তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিনের মধ্যে অসংখ্যবার আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতেন। প্রতি ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনি তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতেন। আমরাও তার আদর্শের অনুসরণ করতে পারি এবং আল্লাহর কাছে ছোট-বড় সকল অপরাধের জন্য পানাহ চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। স্মরণ করুন হযরত ইউনূস (আঃ) যে দোয়াটি পড়ে মাছের পেট থেকে মুক্ত হয়েছিলেন; আমরা সে দোয়াটি পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। দোয়াটি হচ্ছে, **'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জ্বলেমিন'**- অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।' এভাবে দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই বান্দার গুণাহ ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়।

আমাদের সমাজে তাওবা করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। অমুক বুজুর্গের কাছে গিয়ে বায়াত করতে হবে অথবা অমুকের পাগড়ী ধরে বা হাত ধরে তাওবা করতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি এখানে প্রচলিত আছে। তবে কোন বুজুর্গের বায়াত গ্রহণ করে তাওবা করতে হবে; এমনটি মনে করার বোধ হয় কোন অবকাশ নেই। কেননা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তাওবার বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্তরের সাথে সম্পর্কিত, সেখানে লৌকিকতার কোন স্থান নেই। তবে কোনো বুজুর্গের কাছে যাওয়া যেতে পারে জ্ঞানার্জন করার জন্য বা তাওবা সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য। কিন্তু তিনি তাওবা পড়িয়ে কাউকে গুণাহ মুক্ত করে দেবেন, একথা সত্য নয়। কেননা কেউ মুখে মুখে তাওবা পড়িয়ে দিলেও ব্যক্তির অন্তরে যদি পাপ কাজটির জন্য অনুশোচনা না আসে বা অন্তর থেকে যদি পাপ কাজটি পরিত্যাগ করা না হয় তাহলে সে তাওবা অর্থহীন হয়ে যায়। তাই তাওবার জন্য লাফালাফি না করে অন্তর দিয়ে পাপ কাজকে ঘৃনা করতে শিখি এবং আল্লাহর ভয়ে সকল পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। এটাই সফলতার চাবিকাঠী। আল্লাহ ক্ষমাশীল। আশা করা যায় এভাবে সঠিক পদ্ধতিতে তাওবার মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণার্জন এবং জান্নাতে দাখিলের পথটি সুগম হবে।

**আমীন!**